পিতামহ

বনফুল

বনফুলের

—অন্যান্য বই—

গল্প-সংকলন

নবমঞ্জরী ২॥০

বাহুল্য ২৲

চিত্রোপন্যাস

মন্ত্র-মুগ্ধ ২৲

কাব্যগ্রন্থ

অঙ্গারপর্ণ ১॥০

আহ্বনীয় ॥৵০

১

। চন্দনচর্চ্চিত নীলাকাশতলে কল্পনার সহিত চার্ব্বাকের সাক্ষাৎ
টিয়াছিল সে চন্দনচর্চ্চিত নীলাকাশ চিরকালের মতো হারাইয়া
গিয়াছে। সেদিন জ্যোৎস্না-মণ্ডিত লঘু মেঘখণ্ডগুলিকে মেঘ বলিয়া
মনে হইতেছিল না, মনে হইতেছিল যেন কোনও অদৃশ্য নিপুণ হস্ত,
আকাশ-প্রাঙ্গণে চন্দনের আল্পনা আঁকিয়া দিয়াছে। যে কুঞ্জে
তাহাদের আলাপ হইয়াছিল তাহাও মনে হইতেছিল যেন
পারিজাতকুঞ্জ। মর্ত্ত্যলোকেই সেদিন সহসা যেন অমর্ত্ত্যলোকের
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। চার্ব্বাক নিজেই বিস্ময় বোধ করিতেছিল।
তাহার বারম্বার মনে হইতেছিল যে রূপসী তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া
আনিয়াছে সে মানবী তো নিশ্চয়ই—স্বপ্ন মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছে
—এ জাতীয় কবিত্বের প্রশ্রয় আর যেই দিক চার্ব্বাক দিবে না—কিন্তু
আজ সমস্ত প্রকৃতিই এমন অপ্রকৃতিস্থ কেন, অতি সাধারণ ঝুমকো
লতাকেই পারিজাত বলিয়া মনে হইবার কারণ কি। সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে
চিন্তা করিতে করিতেই চার্ব্বাক নির্জ্জন প্রান্তরে ইতস্তত পরিভ্রমণ
করিয়া বেড়াইতেছিল। ভাবিতেছিল সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু
ও সংহারকর্ত্তা মহেশ্বরকে লইয়া কত অদ্ভুত জল্পনা যে কত লোককে
বিভ্রান্ত করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। প্রত্যেক কার্য্যেরই
সঙ্গত বৈজ্ঞানিক কারণ আবিষ্কার করিবার জন্য কেহই সচেষ্ট নহে,
সম্পূর্ণ অযৌক্তিক আজগুবি একটা জল্পনার উপর চক্ষু বুজিয়া নির্ভর
করিবার জন্যই সকলে উন্মুখ…তাহার চিন্তাধারাকে ব্যাহত করিয়া
সহসা এই তন্বী রূপসী কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, তাহাকে ইঙ্গিতে
আহ্বানও করিল। তাহার পর হইতেই যাবতীয় পার্থিব বস্তু
অপার্থিব মনে হইতেছে ইহা বড়ই বিস্ময়কর।

"আপনি কি আমাকে ডাকছিলেন ?"

বিস্মিত চার্ব্বাক প্রশ্ন করিয়া কল্পনার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমি ? কই না"

কল্পনার অধরের আকম্পনে যাহা সূচিত হইল তাহা ব্যঙ্গ না আমন্ত্রণ তাহা চার্ব্বাক ঠিক বুঝতে পারিল না।

"মনে হল আপনি যেন ডাকলেন আমাকে"

"ও তাই না কি। তাহলে আসুন একটু আলাপ করা যাক"

"আলাপ ? ও, আচ্ছা, বেশ তো"

চার্ব্বাকের মুখে ঈষৎ ইতস্ততভাব দেখিয়া কল্পনার অধরপ্রান্তে অতি মধুর একটি হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

"আপনার যদি অবসর না থাকে তাহলে—"

"না, না অবসর আছে। আমি কেবল একটা বিশেষ বিষয়ে চিন্তা করবার জন্যে নির্জ্জনে এসেছিলাম। তা সে পরে হলেও ক্ষতি নেই"

"যদি আপনার আপত্তি না থাকে আমিও আপনার চিন্তার অংশ নিতে পারি। নিঃশব্দ চিন্তার চেয়ে সশব্দ চিন্তা অনেক সময় বেশী ফলপ্রদ হয়। দুজনে মিলে যদি চিন্তার জট ছাড়াতে থাকি তাহলে—"

কল্পনার ইন্দিবর নয়নের দিকে চাহিয়া চার্ব্বাক বলিল, "সুবিধা হয়, যদি দুজনেরই চিন্তার পদ্ধতি একরকম হয়। আমি সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে চিন্তা করছিলাম। আমাদের ধারণা পিতামহই সৃষ্টিকর্ত্তা—"

কল্পনার অধরে আবার হাসি ফুটিল।

আমার ধারণা তা নয়। আমার ধারণা পিতামহকে খতম করতে না পারলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না। পিতামহ আছেন, কিন্তু তাঁকে হত্যা করতে হবে"

"আছেন ?"

"নিশ্চয়ই"

"কোথায়"

"আপনার মনে, আমার মনে। তাছাড়া সশরীরেও আছেন চতুর্ম্মুখ। আমার জীবনের একটা লক্ষ্য চতুর্ম্মুখকে সম্পূর্ণ নির্ম্মুখ করা, তাঁকে ধ্বংস করতে না পারলে জগতের মঙ্গল নেই"

চার্ব্বাক রোমাঞ্চিত হইল। এই রূপসীর সহিত এমন মনের মিল হইয়া যাইবে তাহা সে প্রত্যাশা করে নাই। "নারীদের সহিত প্রায়শই মতের মিল হয় না, প্রয়োজনের খাতিরে ভাণ করিতে হয় যে মতের মিল হইয়াছে" ইহাই চার্ব্বাকের ধারণা, এক্ষেত্রে বিপরীত ঘটনা ঘটাতে, বিশেষত নারীটি রূপসী হওয়াতে, চার্ব্বাকের স্বভাব-সুলভ অবিশ্বাস পুলক-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। চার্ব্বাক স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইল তাহা প্রকৃতই চার্ব্বাকীয়। জ্যোৎস্না মনোহারিণী হইয়া উঠিয়াছে, ঝুমকো লতাকে পারিজাত বলিয়া ভ্রম হইতেছে, মর্ত্ত্যলোকে অমর্ত্ত্যলোকের সুষমা ফুটিয়া উঠিয়াছে, রূপসী তরুণীটিও অপরূপা, এই লক্ষণ-পরম্পরা প্রণিধান করা সত্ত্বেও চার্ব্বাকের মনে হইল সহসা আত্মসমর্পণ করা অনুচিত হইবে। অবিশ্বাস-নিকষে যাচাই না করিলে সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। রমণীর সহিত কৌশলে আলাপ করিতে হইবে, একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িলে চলিবে না।

"আপনার চিন্তাধারার স্বাতন্ত্র্যে চমকিত হয়েছি। আপনার এই বিদ্রোহ-বলিষ্ঠ ধারণার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য কিন্তু গ্রহণ করতে পারছি না। পিতামহের শারীরিক অস্তিত্বও আপনি কল্পনা করেন ?"

"কল্পনা করি না, বিশ্বাস করি, জানি"

প্রান্তরে শয়ন করিতে চার্ব্বাকের আপত্তি ছিল না কিন্তু তাহার যুক্তি-বাদী মন প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিল। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল—"এরকম করবার অর্থ কি?"

"অর্থ খুবই প্রাঞ্জল। সত্যকে সহজে পাওয়া যায় না। নানাবিধ প্রক্রিয়ার জটিল পথে ভ্রমণ করে' তবে সত্যের সমীপবর্ত্তী হ'তে হয়। কেউ যোগাসনে বসে' প্রাণায়াম করেন, কেউ বিজ্ঞানাগারে ব'সে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চক্ষু লগ্ন করে' বসে থাকেন, রসায়ন শাস্ত্রের গভীর অরণ্যে দিশাহারা হয়ে পড়েন কেউ বা। সত্যের সন্ধানে বহু জ্ঞানী বহু প্রক্রিয়ার শরণাপন্ন হয়েছেন। আপনাকেও হতে হবে। আমি যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম তা কঠিনও নয়—"

"কঠিন তো নয়ই, বরং কোমল। হয় তো অতি কোমল, সেই জন্য আশঙ্কা হচ্ছে হয় তো অভিভূত হয়ে পড়ব"

"তাতে ক্ষতি কি"

"অভিভূত চেতনা দিয়ে কি সত্যকে ঠিক মতো দেখতে পাব?"

"অভিভূত না হলে সত্যকে দেখাই যায় না। একটা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েই তো লোকে সত্যের সন্ধান করে এবং সেই ভাবের আলোকেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করে। যাঁরা সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে সত্যকে দেখতে চান তাঁরাও 'আমি সর্ব্ব সংস্কারমুক্ত' এই সংস্কারের অধীনতা স্বীকার করেন, যদিও সব সময়ে সেটা বুঝতে পারেন না। সুতরাং অভিভূত হতে ভয় পাবেন না, বরং কামনা করুন যাতে অভিভূত হ'তে পারেন—"

চার্ব্বাক তখন অনুভব করিল যে তরুণীর ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিবার পূর্ব্বেই সে অভিভূত হইয়াছে। ইহাও সে বুঝতে পারিল যে এই মায়াবিনী তরুণীর সহিত বিতণ্ডায় লিপ্ত হইয়া কোন লাভ

নাই। ইহার ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে পিতামহের সাক্ষাৎ মিলবে এ বিশ্বাস চার্ব্বাকের ছিল না, কিন্তু ক্রোড়ে মস্তক ন্যস্ত করিলে যে ক্রোড়েই মস্তক ন্যস্ত হইবে এ বিশ্বাস তাহার ছিল। চার্ব্বাকীয় নীতি অনুসারে সুতরাং সে আর অসম্মতি প্রকাশ করিল না।

"বেশ, তবে তাই হোক। আপনি বসুন"

"একটি প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে"

"কি বলুন—"

"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মত দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে' দেয়—"

"কিন্তু আমি জানি অবিশ্বাসটাই আলো। অবিশ্বাসের আলো দিয়েই সত্যের সত্যতা দেখা যায়—"

"ওটা আপনার ভুল ধারণা। আলো দিয়ে সব জিনিস দেখাই যায় না—"

"যেমন?"

"অন্ধকার"

কল্পনার বিম্বাধর হাস্যরঞ্জিত হইল। চার্ব্বাকের দিকে চাহিয়া গ্রীবাভঙ্গী করত সে প্রশ্ন করিল—"আমাকেও কি আপনি অবিশ্বাস করছেন?"

"মোটেই না"

"তবে যা বলছি তা করুন। পিতামহকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করবেন এই আকাঙ্ক্ষা আপনার সর্ব্ববিধ অবিশ্বাসকে দূর করুক। আপনি বিশ্বাস করুন যে পিতামহ আছেন, তাঁকে আপনি দেখতে পারেন। চোখ খুলে না রাখলে দেখতে পাবেন কি করে? বিশ্বাসই আমাদের চক্ষু। বাইরের চক্ষু বন্ধ করে' সেই চক্ষু খুলে রাখুন—"

কল্পনার দিকে চাহিয়া চার্ব্বাকের সর্ব্বাঙ্গ আবার রোমাঞ্চিত হইল,

সে যেন অঙ্কুর করিল যে ফল যাহাই হউক আপাতত এই মনো-রমার নিকট আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল।

"বেশ তাই হবে। আমি মনে কোনও অবিশ্বাস রাখব না। কিন্তু একটা কথা, সত্যই পিতামহ যদি থাকেন তাঁকে ধ্বংস করার সার্থকতা কি—আর কি করেই বা তা সম্ভব হতে পারে?"

"খুবই সঙ্গত প্রশ্ন করেছেন আপনি এবার। পিতামহকে ধ্বংস করা প্রয়োজন, কারণ তাঁকে ধ্বংস না করলে তাঁর নবতম সৃষ্টি আমাদেরই ধ্বংস করে' ফেলবে। তিনি এবার সৃষ্টি করছেন মারণ-অস্ত্র। সে অস্ত্র এমনই মারাত্মক যে তার সামান্যতম প্রহারে নিখিল বিশ্ব লোপ পেয়ে যাবে"

"তাই না কি"

"আর সবচেয়ে ভয়ানক কথা—সে অস্ত্র সশরীরে কোথাও বর্ত্তমান নেই, অর্থাৎ তা বস্তু নয়। পিতামহের পুঞ্জীভূত ক্রোধ ক্ষুদ্রতম ভাব-রূপে ধীরে ধীরে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করছে তাঁর অবচেতন লোকে, এখনও তা অমূর্ত্ত, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তা মূর্ত্ত হবে সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের মৃত্যু। সেই জন্যই পিতামহকে যত শীঘ্র সম্ভব ধ্বংস করা প্রয়োজন"

চার্ব্বাক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার বিস্ময় শুধু যে সীমা অতিক্রম করিয়াছিল তাহা নয়, তাহা আর বিস্ময় ছিল না, তাহা অবিশ্বাস আতঙ্ক প্রভৃতি অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে অপরূপ একটা উপলব্ধিতে আত্মহারা হইয়া পড়িয়া-ছিল। তাহার অন্তরতম সত্তা এই পরম উপলব্ধিকে প্রশ্ন দ্বারা বিক্ষত করিতে চাহিতেছিল না, কিন্তু চার্ব্বাকের চার্ব্বাকীয় বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় নাই। সুতরাং পুনরায় সে প্রশ্ন করিল—"এই অদ্ভুত খবর আপনি পেলেন কি করে?"

"তা যদি বলতে পারতাম, অর্থাৎ তা যদি বর্ণনীয় হত তাহলে এত ভণিতা করতাম না, বলে ফেলতাম। এই অদ্ভুত খবর আমি যে উপায়ে পেয়েছি আপনাকেও ঠিক সেই উপায়েই পেতে হবে। আমার কোলে মাথা রেখে শুতে হবে—"

"আপনি কার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলেন জানতে পারি কি?"

"জানাতে আমার আপত্তি নেই। তিনি একজন পুরুষ, পরম পুরুষ—"

"কি করে' তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন?"

"আপনি যেভাবে আমার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। সেদিনও জ্যোৎস্না এমনই মনহারিণী ছিল, সেদিনও আকাশ-পটে ঠিক এমনই সমারোহ ছিল শুভ্র মেঘমালার। আমিও সেদিন ঠিক আপনারই মতো প্রশ্নাকুল চিত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম এমনই এক নির্জ্জন প্রান্তরে—"

"এমন সময় হঠাৎ তিনি আবির্ভূত হলেন?"

"মনে হল যেন আমার ভিতর থেকেই বেরিয়ে এলেন। আমার সম্বন্ধে আপনার ঠিক এরকম মনে হয়েছে কি না জানি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার কিন্তু হয়েছিল"

ক্ষণকাল হতবাক থাকিয়া চার্ব্বাক বলিল—"পিতামহকে দেখেছেন আপনি?"

"দেখেছি। আপনিও দেখবেন। তাঁকে ধ্বংস করবার ভারও নিতে হবে আপনাকে। আপনাকে সেই মহৎ কর্ম্মে নিযুক্ত করবার জন্যেই আমি এখানে এসেছি। আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা আমি আগে থাকতেই জানতাম। পরম পুরুষের নির্দ্দেশ মতোই আমি এখানে অপেক্ষা করছি আপনার জন্য"

"তিনি নিজে এলেও তো পারতেন"—চার্ব্বাক সপ্রতিভ হইবার চেষ্টা করিল।

"সম্ভব হলে আসতেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি আপনার নাগাল পাবেন না, আপনার বোধ-শক্তির সীমায় আসবার মতো স্থূলতা তাঁর নেই, তাই তিনি আমার সাহায্য নিয়েছেন। আমাকে প্ররোচিত করেছেন তিনি, আমি করছি আপনাকে। তাঁকে কে প্ররোচিত করেছিল জানি না। তবে এইটুকু শুধু জানি পিতামহকে হত্যা করবার জন্যে অনাদিকাল থেকে যে ষড়যন্ত্র-খড়্গ প্রস্তুত হচ্ছে আমি তার একটি অংশ; আর তার সঙ্গে আপনাকে সংযুক্ত করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য"

চার্ব্বাকের সহসা মনে হইল বৈকালে দুই পাত্র মাধ্বী সুরা পান করিয়াছিলাম এই সকল অলীক ঘটনা পরম্পরা তাহারই ফল নয় তো! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই কল্পনার কলহাস্য তাহাকে আশ্বস্ত করিল।

"মাত্র দু পাত্র মাধ্বী সুরা চার্ব্বাককে বিচলিত করতে পারে নি। আপনি যা প্রত্যক্ষ করছেন তা অলীক নয়, সত্য"

চার্ব্বাক বিস্মিত হইল। যাদুকরী না কি?

বিস্ফারিত চক্ষে চার্ব্বাক কল্পনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল নর্ত্তকী সুরঙ্গমাকে। সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতেও এমনি মোহিনী শক্তি ছিল। সুরঙ্গমা এখন কোথায়? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে সে বহুকাল পূর্ব্বে মৃগয়ায় গিয়াছিল, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে সে এখনও হয়তো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। চিন্তাধারাকে সংযত করিয়া চার্ব্বাক পুনরায় প্রশ্ন করিল।

"পিতামহকে খড়্গাঘাতে হত্যা করতে হবে? কোথায় পাব সে খড়্গ?"

"আপনাকেই আবিষ্কার করতে হবে সেটা। আগে পিতামহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোন, আসুন—"

চার্ব্বাক এ আমন্ত্রণ আর অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, সেই সুরভিত নিকুঞ্জ মধ্যে শ্যাম তৃণাস্তরণের উপর কল্পনা উপবেশন করিতেই তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নয়নদ্বয় নিমীলিত করিল। পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া বসিল সে। কল্পনার মুখের দিকে উদ্ভাসিত নয়নে চাহিয়া বলিল—"খড়্গের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি"

"ও করেছেন না কি? কি রকম সেটা?"

"সত্য। সত্যকে লাভ করিলেই সৃষ্টিতত্ত্ব জানা যাবে এবং তা জানা গেলে পিতামহ সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যাবেন। তাঁকে চাক্ষুষ করবার তো প্রয়োজন নেই—"

কল্পনার নয়নযুগল হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

"সত্যকে লাভ করবার কি উপায় আপনি অবলম্বন করবেন?"

"বৈজ্ঞানিক—"

"সত্যের সন্ধানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি বারম্বার পথ পরিবর্ত্তন করে কিন্তু"

"আমিও করব। নিজের বুদ্ধিকে অনুসরণ করা ছাড়া আর তো কিছু করতে শিখিনি"

"বেশ, তাহলে আমি চললাম"

না, আপনি যাবেন না। ভাগ্যবশে আজ আপনার দর্শন পেয়েছি, ঘটনাচক্রে আকাশে বাতাসে আজ মাদকতা সঞ্চারিত হয়েছে, আপনার কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনায় আমার সমস্ত চেতনা আজ সম্মোহিত, আপনি যাবেন না!"

"বেশ, বসছি তাহলে—"

চার্ব্বাক মুগ্ধনয়নে কল্পনার দিকে চাহিয়া রহিল।

"আর বেশীক্ষণ কিন্তু আমাকে দেখতে পাবেন না, ওই দেখুন—"

চার্ব্বাক দেখিল, বিরাট একটা কৃষ্ণমেঘ দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সেই মেঘ আকাশ ছাইয়া ফেলিল, চন্দ্রমা অন্তর্হিত হইল, কল্পনাকে আর দেখা গেল না। ক্ষণকাল পরে চার্ব্বাকের আকুল কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

"ভদ্রে, আপনার পরিচয় দিন, বলুন আপনি কে"

"আমি আপনার প্রেরণা"

২

অন্ধকারে ঝটিকা-বেগে বিভ্রান্ত হইয়া চার্ব্বাক কোথায় যে নীত হইয়াছিল তাহা সে ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কেবল একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল যেন কোনও অদৃশ্য শক্তি তাহাকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। সে শক্তির অমিত প্রাবল্যকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। খরস্রোতে তৃণখণ্ডের মতো সে ঘটনা স্রোতে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সেই তন্বী রূপসীর কথা কিন্তু সে নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই। তাহার শেষ কথাগুলি দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় তাহার চিত্তলোকে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

"চার্ব্বাক, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ অন্ধকারের মধ্যেই তোমার যাত্রা শুরু হল। আমার কোলে ক্ষণিকের জন্যও তুমি মাথা রেখেছিলে, সত্যের পথ তাই আজ উন্মুক্ত হয়েছে। এর ভয়ঙ্কর ঝটিকাক্ষুব্ধ মূর্ত্তি দেখে তুমি ভয় পেও না। অগ্রসর হও—"

চার্ব্বাক অগ্রসর হইতেছিল না, বাহিত হইতেছিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতেছিল বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছাশক্তি বা যুক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে সে অজ্ঞান হইয়া গেল। নিজের গতির উপর যতটুকু নিয়ন্ত্রণশক্তি তাহার ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইল। অবলুপ্ত হইবামাত্র কিন্তু আশ্বস্ত হইল সে। তাহার চতুর্দ্দিক আর ভয়ঙ্কর রহিল না, সে যেন নূতন পরিবেশে নীত হইল। শুধু তাহাই নয়—তাহার দৃষ্টিগোচর হইল সে আর একক নহে, অদূরে একব্যক্তি তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া রহিয়াছে। অজ্ঞান অবস্থায় নব-পরিবেশে চার্ব্বাক নূতন জীবন লাভ করিল, সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

…অদূরে যে ব্যক্তিটি বসিয়াছিল তাহার দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া চার্ব্বাক উপলব্ধি করিল ব্যক্তিটি অদূরে নাই, বহুদূরে আছে। বহুক্ষণ হাঁটিবার পর চার্ব্বাক তাহার সমীপবর্ত্তী হইল। হাঁটিতে হাঁটিতে চার্ব্বাক লক্ষ্য করিল চতুর্দ্দিকে শ্যামলতার কোনও চিহ্ন নাই, আকাশে সূর্য্যও নাই, চন্দ্রও নাই, অন্ধকারও নাই। অদ্ভুত একটা স্বচ্ছ আলোকে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। আকাশ নির্ম্মেঘ, আকাশের বর্ণ নীল নহে, রক্তাভ। নিজেরই প্রচ্ছন্ন চৈতন্যলোকে চার্ব্বাক এই নূতন দেশ আবিষ্কার করিয়া বিস্ময়বোধ করিতেছিল। সে বাহ্যত অজ্ঞান হইয়া গেলেও অন্তরের অন্তরতম সত্তায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, তাহার অনুসন্ধিৎসু মন সন্ধান করিতেছিল এই রক্তাভ আলোকের উৎস কোথায়, সূর্য্যচন্দ্রহীন এই দেশের নামই বা কি। উপবিষ্ট ব্যক্তিটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চার্ব্বাক আরও বিস্ময় বোধ করিল। ইহা সজীব মনুষ্য না প্রস্তরমূর্ত্তি? এই অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য প্রস্থ কি কোনও জীবন্ত মনুষ্যের হইতে পারে?

কিন্তু কেশ চর্ম্ম দেখিলে জীবন্ত বলিয়াই তো ভ্রম হয়। চার্ব্বাকের ভ্রান্তি অপনোদন করিয়া উপবিষ্ট ব্যক্তিটি সহসা কথা কহিয়া উঠিল—"চার্ব্বাক, তোমারই অপেক্ষায় আমি বসে আছি এখানে। আমাকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে ?"

চার্ব্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল লোকটির নয়নযুগল হইতে অদ্ভুত একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে।

"আপনি কে, আপনার পরিচয় দিন"

"আমার নাম কৌতূহল। তোমারই কৌতূহল আমি, তোমারই প্রেরণায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তোমার অপেক্ষায় বসে আছি"

"ও"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্ব্বাক নিজেকে একটু প্রকৃতিস্থ করিল। তাহার নিজের প্রেরণা কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিয়াছিল, তাহার নিজের কৌতূহল এখন আবার মূর্ত্তিমান হইয়া কথা কহিতেছে। চার্ব্বাকের আধিভৌতিক বুদ্ধির পক্ষে ব্যাপারটা একটু জটিল। কিন্তু জটিলতা দেখিয়া ভীত হইবার চরিত্র চার্ব্বাকের নয়। বরং জটিলতাকে সরল করিবার প্রবৃত্তিই তাহাকে চিরকাল প্রবুদ্ধ করিয়াছে। সুতরাং সে সপ্রতিভভাবেই বলিল—"ও, বুঝেছি। কিন্তু এ কোন দেশে আমরা এসেছি বল তো। এখানে সূর্য্যচন্দ্র নেই কিন্তু আলো আছে। আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ—"

"এর নাম সন্ধানলোক। তোমারই জন্য এ লোক তুমি নিজেই সৃষ্টি করেছ। এর কোনও ভৌগোলিক অস্তিত্ব নেই। তুমি যে আলোকে সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে চাইছ তা চিরপ্রচলিত সূর্য্যচন্দ্রের আলোক নয়, তা তোমারই প্রতিভার আলো। তুমি বিভিন্ন, তুমি স্বতন্ত্র, তাই তোমার আকাশের রং নীল নয়, রক্তাভ। তা পীতাভ, শ্যামল বা বেগুনিও হতে পারে, কিন্তু নীল কখনও হবে

না। এই সন্ধানলোকে তোমারই জন্য আমি সংবাদ সংগ্রহ করে, অপেক্ষা করছি"

"কি সংবাদ"

"মৃতদেহটি নদীর পরপারে আছে এবং তারই মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টিতত্ত্ব। পিতামহ ব্রহ্মার কিছু খবর ওইখানেই পাওয়া যাবে। শুনেছি তাঁর সৃষ্টির কারখানাও ওই শবদেহের ভিতর আছে। তিনি নিজেও হয় তো আছেন"

চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল—"নদীটি কত দূরে—"

"নদীটিই সমস্যা। ভাল করে' চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবে বিরাটকায় শবদেহটি দূর প্রান্তরে শায়িত রয়েছে। দূরদিগন্তে ওটি পর্ব্বত নয় ওটি শবের মুণ্ড। কিন্তু ওই শবদেহের সমীপবর্ত্তী হতে চেষ্টা করলেই—এক দুকূল-প্লাবিনী নদী কোথা হতে আবির্ভূত হচ্ছে সহসা। তুমি চেষ্টা করে' দেখতে পার"

চার্ব্বাক অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই যাহা আপাত-দৃষ্টিতে কঠিন প্রান্তরভূমি ছিল তাহা তরল তরঙ্গিণীতে রূপান্তরিত হইল। ক্রমশ তাহার তরঙ্গমালা আলোড়িত হইতে লাগিল। মনে হইল যেন কোনও অদৃশ্য ঝটিকা-বেগে এই সহসা-আবির্ভূতা স্রোতোস্বিনী বিক্ষুব্ধ হইতেছে। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোনও ব্যক্তি এই মায়াবিনী নদীতে অবতরণ করিতে ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু চার্ব্বাক অসাধারণ প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তি, সে বিনা দ্বিধায় নদীতে নামিয়া পড়িল। সে ভাবিল ইহা যদি তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় স্পর্শশক্তি সে ভ্রম অপনোদন করিবে, আর ইহা যদি সত্যই নদী হয় তাহা হইলে সন্তরণ করিয়া নদীপারে যাওয়া অসম্ভব হইবে না। সন্তরণ করিয়া বহুবার বহু দুস্তর নদী সে অতিক্রম করিয়াছে। নদীতে নামিবামাত্রই কিন্তু এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। নদীর তরঙ্গমালা যেন রমণীর বহুপাশের মতো

তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, নদীর কলধ্বনি আকুল প্রণয় নিবেদন করিল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল নদী মানবীর মতো কথা বলিতেছে।

"চার্ব্বাক আমি নদী নই। তুমি অবগাহন করবে বলে' আমি নদীরূপ ধারণ করেছি। তোমারই সৃষ্ট এই ঊষর সন্ধানলোকে অপেক্ষা করে আছি তুমি আসবে বলে'। আমি জানতাম তুমি আসবেই"

"তুমি কে"

"তুমিই তো আমার নামকরণ করেছ যুগে যুগে! আমি কে তা তুমিই জান, আমি জানি না। আমার বাপমায়ের-দেওয়া একটা নাম ছিল বটে, কিন্তু সে নাম কখনও মর্য্যাদা পায় নি তোমার কাছে। তপস্বী কচের নিকট তুচ্ছ হ'য়ে গিয়েছিল প্রণয়াতুরা দেবযানী। দেবযানী তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু দেবযানীর মধ্যে যে চিরন্তনী নারী ছিল সে তুচ্ছ হয় নি। তাকে তুমি কামনা করেছ বহুরূপে বহু নামে। অশরীরী আমাকে কেন্দ্র করে' তোমার কামনা যুগে যুগে অনেক রঙীন ফুল ফুটিয়েছে, কিন্তু যেই আমি শরীর ধারণ করে' ধরা দিয়েছি অমনি তোমার বিচক্ষণ বিশ্লেষণ আমাকে ম্লান করে দিয়েছে, পড়া পুঁথির মতো তুচ্ছ হয়ে গেছি আমি দেখতে দেখতে। তাই আমি অশরীরী হয়েই অনুসরণ করছি তোমাকে। সুরঙ্গমার মধ্যে কিছুদিন আমি ভর করেছিলাম, কিন্তু আমাকে তুমি দেখেও দেখলে না। আমাকে দেখে তুমি মুগ্ধ হয়েছিলে, কিন্তু সুন্দরানন্দ যখন সুরঙ্গমাকে নিয়ে চলে গেল তখন তো তুমি বাধা দিলে না। তোমার অধ্যয়ন-স্পৃহা সুরঙ্গমার চেয়ে বড় হল তোমার কাছে। সুরঙ্গমার চোখের ভিতর দিয়ে আমি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম তোমার দিকে। কিন্তু তুমি তখন সামান্য একটা পতঙ্গের গতিবিধি নিয়ে এমন তন্ময় হয়েছিলে যে আমার দিকে ফিরেও তাকালে না একবার!"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ চার্ব্বাককে ঘিরিয়া উদ্দাম হইয়া উঠিল।

বিপন্ন হইলে চার্ব্বাকের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তীক্ষ্ণতর হইয়া ওঠে, চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল—"তোমার কথাই যদি সত্য হয়, আমি সত্যই যদি তোমাকে চিরকাল অবহেলা করে' থাকি, তাহলে আবার তুমি আমার কাছে এসেছ কেন ?"

"তোমাকে বা তোমার কৌতূহলকে ওই শবের কাছে আমি কিছুতেই যেতে দেব না"

"কেন"

নদী কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহার কলধ্বনিতে অভিমান-আবদার অনুরোধ-অনুনয়ের সুর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। চার্ব্বাকের মনে হইল একটা অস্ফুট রোদন-ধ্বনিও যেন শুনা যাইতেছে। সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বিরাট কৌতূহল বিরাটতর হইয়াছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র কহিল—"তপস্যা আরম্ভ কর। একনিষ্ঠ তপস্যা ভিন্ন এই কুহকিনীর মায়াজল ছিন্ন করা যাবে না—"

"তপস্যা ? এ অবস্থায় তপস্যা করা কি সম্ভব ? অনুকূল পরিবেশ না হলে আমি একাগ্র হতে পারি না"

"তা আমি জানি। কিন্তু এখন যদি তুমি অনুকূল পরিবেশের প্রত্যাশায় তপস্যা স্থগিত রাখ, নদীর স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ওই শোন—"

নদীর কলধ্বনি আবার মানবীয় ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছিল।

"চার্ব্বাক, যুক্তিমার্গের কঙ্করে কণ্টকে জন্মজন্মান্তর ক্ষতবিক্ষত হয়েছ তুমি। তোমার বুদ্ধি তোমার কৌতূহল সত্য অনুসন্ধানের ছুতোয় তোমাকে ক্রমাগত বিপথে নিয়ে গেছে। অমৃতের সন্ধানে তুমি যাত্রা করেছ বিষবৃক্ষের অভিমুখে। শিথিলাঙ্গ হয়ে আমার তরঙ্গলীলায় আত্মসমর্পণ কর, তোমাকে আমি অমৃত-সাগরে নিয়ে

যাব। তোমার মনে পড়ে কি বিশ্বামিত্ররূপে তুমি যখন পুষ্করতীর্থে কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলে, মেনকারূপে আমিই তোমাকে সে কঠোরতা থেকে রক্ষা করেছিলাম? আমার সঙ্গে যে দশ বর্ষ তুমি যাপন করেছিলে তাতে কি অমৃতের আভাস পাও নি? শকুন্তলাকে আমি কেন ত্যাগ করেছিলাম জান? তুমি আমাকে ত্যাগ করেছিলে বলে'। একটা কথা কিন্তু তুমি জান না, শকুন্তলাকে আমি ত্যাগ করি নি, ত্যাগ করবার ভাণ করেছিলাম। যে শকুন্ত তাকে লালন করেছিল সে অন্য কেউ নয়, রূপান্তরিত মেনকাই। আমাকে তুমি অনেক কষ্ট দিয়েছ, নিজেও অনেক কষ্ট পেয়েছ। আর বিপথে যেও না। তুমি কোথায় যেতে চাও বল, আমি সেইখানেই তোমাকে নিয়ে যাব—"

"আমি পিতামহকে চাক্ষুষ করতে চাই"

"তার জন্য তো কোথাও যেতে হবে না। তিনি তো সর্ব্বত্র বিরাজমান, ভাল করে' চেয়ে দেখলেই তাঁকে দেখতে পাবে"

"আমি দেখতে পাচ্ছি না"

"হঠাৎ পিতামহকে দেখবার বাসনা হল কেন তোমার। পিতামহকে তুমি তো কোনদিন কামনা কর নি, কামনা করেছ আমাকে। আমাকে লাভ করবার জন্যই জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তুমি তপস্যা করেছ, যুদ্ধ করেছ। গাধিনন্দন তুমি বিশ্বামিত্র হয়েছিলে আমার জন্য, পিতামহের জন্য নয়। আমিই কামধেনু শবলা, আমাকেই তুমি চেয়েছ চিরকাল, আজ হঠাৎ পিতামহকে কামনা করছ কেন, এ প্রচেষ্টা তো স্বাভাবিক নয় তোমার পক্ষে"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্ব্বাক কহিল—"মায়াবিনি, জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য উদ্ঘাটন করে' তুমি আমাকে যা বলতে চাইছ তা

আমার সহজ বুদ্ধির কাছে প্রলাপ বলে মনে হচ্ছে। তোমার এই বিস্ময়কর আবির্ভাবও মনে হচ্ছে স্বপ্নবৎ। আমি স্বপ্ন দেখছি, না জেগে আছি তা-ও বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে —আমার মস্তিষ্ক হয়তো সুস্থ নয়, বিকারের ঘোরে হয়তো আমি অলীক বস্তু প্রত্যক্ষ করছি। একটি বিষয়ে কিন্তু আমি স্থির-প্রতিজ্ঞ; সৃষ্টিতত্ত্ব আমাকে উদ্ঘাটন করতেই হবে, পিতামহ নামক পৌরাণিক উপকথাকে আমি সত্যের আলোকে ছিন্নভিন্ন করে' দেখতে চাই। তুমি যেই হও, তোমাকে অনুরোধ করছি আমার এ প্রেরণাকে মর্য্যাদা দাও, আমার অনুসন্ধানের পথে বাধাসৃষ্টি কোরো না"

নদীর অসংখ্য তরঙ্গ কলহাস্যমুখরিত হইয়া উঠিল।

"আমি জানি তোমার নবতম প্রেরণাটি সুন্দরী। সে সুন্দরী বলেই তার নির্দ্দেশ তোমার কাছে সত্য বলে' মনে হয়েছে। তুমি ভুলে গেছ যে সৃষ্টিতত্ত্ব উদ্ঘাটনের অজুহাতে তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নি চার্ব্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণ-জালে জড়িত হচ্ছ। আমি চিনি তোমাকে, আমাকে তুমি ঠকাতে পারবে না। এখনও আমার কথা শোন, ওই শবদেহের সমীপবর্ত্তী হবার চেষ্টা কোরো না—ওতে আনন্দ নেই, আমার তরঙ্গ-দোলায় অঙ্গ বিস্তার করে' দেখ কি আনন্দ"

চার্ব্বাক ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলের দিকে চাহিল।

কৌতূহল বলিল—"আর বিলম্ব কোরো না, তপস্যা শুরু কর"

চার্ব্বাক তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল।

চার্ব্বাকের ধ্যান যতই গভীর হইতে লাগিল, কৌতূহলের দেহ আয়তন ততই কমিতে লাগিল। কমিতে কমিতে ক্রমশ তাহা বিলীন হইয়া গেল। তরঙ্গিনীও মরীচিকাবৎ অদৃশ্য হইল।

৩

চার্ব্বাকের তপস্যা কতদিন স্থায়ী হইয়াছিল তাহা কেহ জানে না। হয় তো তাহা কয়েকঘণ্টা মাত্র, হয় তো তাহা বহু শতাব্দীব্যাপী, কিন্তু সে 'তপস্যার একনিষ্ঠতায় স্বয়ং পিতামহ বিচলিত হইলেন। চার্ব্বাক যদি এ সময়ে পিতামহকে চাক্ষুষ করিতে পারিত তাহা হইলে তাঁহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিত সন্দেহ নাই। এই কমনীয়কান্তি তরুণ যুবককে সে সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ বলিয়া চিনতেই পারিত না। পিতামহ নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হইয়া ছিলেন। তাঁহার কল্পনায় 'স্বৈরচর' নামক একপ্রকার অদ্ভুত জীব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি চেষ্টা করিতেছিলেন বাস্তবে তাহাকে মূর্ত্তিদান করা সম্ভব কিনা। সহসা তাহার মনে হইয়াছিল বৃক্ষলতা পশুপক্ষী বা জড়কে এক একটি দেহ-পিঞ্জরে দীর্ঘকালের জন্য আবদ্ধ রাখা নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। আর কিছুর জন্য না হোক, বৈচিত্র্যের জন্যও অন্তত এমন একপ্রকার জীব সৃষ্টি করা উচিত যাহারা ইচ্ছামত দেহ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে। মনুষ্য ইচ্ছা করিলে পক্ষী বা ব্যাঘ্র বা অন্য কিছু হইতে পারিবে। ভেক সর্প, অথবা সর্প ময়ূরে রূপান্তরিত হইবে। কেবল ইচ্ছা করিলেই গাছের এক ঝাঁক ফুল, এক ঝাঁক প্রজাপতি হইয়া উড়িয়া যাইবে, পর্ব্বতস্তূপ মেঘস্তূপ হইয়া আকাশে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। এই অপূর্ব্ব কল্পনায় তিনি মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। অর্দ্ধ-সৃষ্ট এই জাতীয় কয়েকটি জীব তাহার আশে-পাশে পড়িয়াছিল। একটি গোক্ষুর সর্পের কিছু অংশ মানবীতে রূপান্তরিত হইয়া তরুণকান্তি পিতামহের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে-ছিল, প্রকাণ্ড একটি হীরকখণ্ড ধীরে ধীরে আঙুরগুচ্ছে রূপান্তরিত হইতেছিল, একটি পুষ্পের একটি পাপড়ি পতঙ্গের ডানার আকার ধারণ

করিয়া দ্রুত স্পন্দনে নিকটস্থ বায়ুমণ্ডলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। পিতামহের কল্পনা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইতে পারিতেছিল না বিশ্বকর্ম্মার জন্য। সৃষ্টিব্যাপারে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাই পিতামহের প্রধান সহায়। পিতামহ কল্পনা করেন, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেন বিশ্বকর্ম্মা। সৃষ্টির প্রাথমিক পর্ব্বে পিতামহ নিজেই নিজের কল্পনাকে রূপ দিতেন, কিন্তু ক্রমশ এত অসংখ্য সৃষ্টি-কল্পনা তাঁহার চিত্তলোকে ভীড় করিয়া আসিল যে, তিনি একজন সহায়কের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সৃষ্টি করিলেন বিশ্বকর্ম্মাকে। অর্থাৎ বিশ্বকর্ম্মার পিতা প্রভাস এবং মাতা যোগসিদ্ধাকে সম্ভব করিলেন। পিতামহই আদিতম স্রষ্টা, কিন্তু তাহার সৃষ্টিতে তাহার নিজের স্বাক্ষর কোথাও নাই। নিজেকে রহস্যের অন্তরালে গোপন রাখিয়া পিতামাতাকেই সৃষ্টির কারণরূপে পাদপ্রদীপের সম্মুখে প্রকট করিয়া তিনি আনন্দ পান। প্রভাস যোগসিদ্ধার মাধ্যমে তাই তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি ব্যাপারে এই বিশ্বকর্ম্মাই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। কিছুদিন হইতে তাঁহার কিন্তু একটা সন্দেহ হইয়াছে। মনে হইতেছে বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার সমস্ত কল্পনাকে যেন ঠিকমতো রূপ দিতেছেন না। পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর দ্বারা প্ররোচিত হইয়া বিশ্বকর্ম্মা যেন তাঁহার সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। নতুবা এই সকল অযথা বিলম্বের কারণ কি? কেন ওই গোক্ষুর সর্প এখনও সম্পূর্ণরূপে মানবীতে রূপান্তরিত হয় নাই? ওই আঙুরগুচ্ছে এখনও কেন হীরকের কুচি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে? তাঁহার ইহাও মনে হইতেছিল এ বিশ্বকর্ম্মা যদি তাঁহার কল্পনাকে রূপ দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি নূতন বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টি করিবেন। অর্দ্ধপতঙ্গ পুষ্পটির দিকে চাহিয়া তাঁহার অন্তর করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। আহা, বেচারার উড়িবার কি আগ্রহ! এতদিন ধরিয়া কত সহস্র সহস্র পুষ্প

মৌন-আগ্রহে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ঝরিয়া গিয়াছে এই কথা ভাবিয়া ক্ষণিকের জন্য তিনি অন্যমনস্কও হইয়া পড়িলেন।

"বিশু—"

"আজ্ঞে যাই"

বিশ্বকর্ম্মা আবির্ভূত হইলেন।

"এদের তুমি এমনভাবে অসম্পূর্ণ করে' রেখেছ কেন বল তো? এদের সম্পূর্ণ কর। আরও অনেক কিছু করতে হবে যে—"

"আমি অবিলম্বে এদের সম্পূর্ণ করে' দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা আমার মনে উদিত হওয়াতে আমি ইতস্তত করছি—"

"কি কথা"

"আপনার সৃষ্টিতে এতকাল যে শৃঙ্খলা বর্তমান আছে এই অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্ট হলে সে শৃঙ্খলা আর থাকবে না। এই স্বৈরচর নামক প্রাণী যখন যা খুশী হ'য়ে আপনার সৃষ্টিকে বিশৃঙ্খল করে দেবে। ফুল যদি কখনও প্রজাপতি, কখনও পাখী, কখনও ভেক, কখনও বা অপর কিছুতে রূপান্তরিত হ'তে পারে তাহলে সমস্ত প্রাণী সমাজে আলোড়ন উপস্থিত হবে, সকলেই অস্থির হয়ে উঠবে—"

"উঠুক না, তোমার তাতে কি। তোমার বুদ্ধি মোটা বলে' একটা কথা তুমি বুঝতে পার নি। সকলেই স্বৈরচর হতে চায়, হ'তে পারে না বলেই যত গোল। যত গোলমালের মূলই ওইখানে। সবাই সব হ'তে চায়। তোমার নিজের ব্যাপারেই দেখ না। তোমাকে সৃষ্টি করলাম মিস্ত্রী করে', তুমি নিজের কাজ ছেড়ে আমার কাজ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরছ। সৃষ্টিতে শৃঙ্খলা থাকবে কি থাকবে না, তা নিয়ে তোমার মাথা ব্যথার দরকার কি? তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাব, বড় জোর বিষ্ণু ঘামাতে পারে। কিন্তু তুমি ঘামাচ্ছ মানে

—তুমিও ব্রহ্মা কিম্বা বিষ্ণু হতে চাও। আসলে তুমিও মনে মনে একটি স্বৈরচর। তোমারও অনেক কিছু হবার ইচ্ছেটি ষোল আনা আছে কিন্তু হবার সামর্থ্য নেই। দুনিয়া জুড়ে এই কাণ্ড চলেছে। সেই জন্যেই এত অশান্তি। তাই ঠিক করেছি সত্যি সত্যি এবার স্বৈরচর সৃষ্টি করব। তারা সব কিছু হয়ে দেখুক মজাটা কি। তুমি যদি চাও তোমাকেও ব্রহ্ম বানিয়ে দেব দিন কয়েকের জন্য। এখন এই কাজগুলো শেষ করে' দাও—ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না”

মাথা চুলকাইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—“আজ্ঞে না আমি মাথা ঘামাই নি। বিষ্ণুই এ নিয়ে চিন্তা করছিলেন এবং বলছিলেন যে এ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন”

“ও, বলছিল বুঝি। আমি আগেই বুঝেছি তা। সৃষ্টি-ব্যাপারে মাথা ঘামাবার কথা বিষ্ণুরও নয়। কিন্তু ওর স্বভাবই হচ্ছে সব বিষয়ে ফোড়ন কাটা। আচ্ছা, সে আমি বিষ্ণুর সঙ্গে বোঝাপড়া করব এখন, তুমি কাজ শুরু করে' দাও—”

বিশ্বকর্ম্মা ইতস্তত করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু একটি গৈরিক-ধারিণী রূপসীর আকস্মিক অভ্যাগমে তিনি থামিয়া গেলেন।

পিতামহ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন—“তুমি কে”

“আমি সাধনা”

“এখানে কি চাই”

“সিদ্ধি”

“তাহলে গণেশের কাছে যাও। সিদ্ধি বিতরণ করবার জন্যে ওকেই ঠিক করে' রেখেছি আমরা”

“আমি আপনারই উদ্দেশে প্রেরিত হয়েছি, অন্য কোথাও যাবার আমার শক্তি নেই”

"মুশকিলে ফেললে দেখছি! তুমি কার সাধনা"

"তাতো জানি নে। আমি তাঁর চিত্তলোকে জন্মগ্রহণ করে' আলোক বাহিত হয়ে আপনার উদ্দেশে আসছি। আমি কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত একটি কম্পমান আলোক-তরঙ্গ মাত্র ছিলাম, আপনার দ্বারে এসে সহসা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছি, আমি এতক্ষণ ছিলাম মৌন আকুতি, আপনার কাছে এসে ভাষা পেয়েছি। কিন্তু যাঁর চিত্তলোকে আমার জন্ম তাঁর কোনও পরিচয় আমি জানি না"

পিতামহের নয়নযুগলে কৌতুক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল বহুকাল পূর্ব্বে যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন তাহাই যেন মূর্ত্তিমতী হইয়াছে।

"বেশ তাহলে তুমি আবার আলোক-তরঙ্গ হয়ে তাঁর চিত্তলোকে ফিরে যাও, আমি দেখি কোথা থেকে তুমি এসেছ"

গৈরিক-ধারিণী তরুণী সঙ্গে সঙ্গে একটি জ্যোতির্ম্ময় আলোক-রেখায় রূপান্তরিত হইয়া অন্ধকার মহাশূন্যপথে মর্ত্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। পিতামহ এবং বিশ্বকর্ম্মা উভয়েই একটু ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিলেন।

"ও, সেই ছোকরা—"

পিতামহের মুখ আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"কে বলুন তো"

"আরে তুমিই ত তৈরি করেছ ওকে আমার কল্পনা অনুসারে। যুগে যুগে নূতন নূতন নামে নানা কীর্ত্তি করেছে ও। আরও করবে—"

"ঠিক ধরতে পারছি না—"

"বিশ্বামিত্রকে মনে নেই? রাবণকে মনে নেই? আমার মানসপুত্র পুলস্ত্যের কীর্ত্তি শোন নি?"

"আজ্ঞে না, পুলস্ত্য? তিনি বোধহয় অনেক আগে জন্মেছেন, তাঁর কথা আমি জানি না"

"পুলস্ত্য তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমের কাছে গিয়ে তপস্যা করছিল। কিন্তু মুনিকন্যারা আর অপ্সরারা এমন বিরক্ত করতে লাগল তাকে—যে শেষ পর্য্যন্ত সে রেগে-মেগে অভিশাপ দিলে, যে মেয়ে তার দৃষ্টির সম্মুখে আসবে সে তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হবে। কিছুদিন পরে পড়বি তো পড় তৃণবিন্দুর মেয়ে হবির্ভূই পড়ে গেল তাঁর চোখের সামনে। বাস্ সঙ্গে সঙ্গে অভিশাপ ফলে গেল। তৃণবিন্দুর মাথায় হল বজ্রাঘাত। গর্ভবতী কুমারী মেয়ে নিয়ে সে যুগেও সমাজে বাস করা শক্ত ছিল। তৃণবিন্দু তখন ধরে বসল পুলস্ত্যকে—হবির্ভূকে বিয়ে করতে হবে। অন্যান্য মুনিঋষিরাও এসে ধরল। পুলস্ত্য একটু কাটখোট্টা রাগী গোছের লোক হলেও, লোক ছিল ভাল। হবির্ভূকে বিয়ে করলে সে। হবির্ভূ গর্ভবতী ছিলই, সে প্রসব করলে বিশ্বশ্রবাকে এই বিশ্বশ্রবাই রাবণগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ, কুবেরও এর ছেলে। এরা সকলেই তপস্বী কিন্তু সকলেই ঘোর বস্তুতান্ত্রিক। এই ধরণের একদল লোক সৃষ্টি করেছিলাম আমি। এদের হটকারিতায়, এদের নাস্তিকতায়, এদের শৌর্য্যে বীর্য্যে আমার সৃষ্টিকাব্য বিচিত্র। হিরণ্যকশিপু, বিশ্বামিত্র এরা সব ওই দলের। চিরকাল এরা বিদ্রোহ করে' এসেছে। আমার কিন্তু ভারী ভালো লাগে এদের, বুঝলে। এই চার্ব্বাককে নিয়ে একটু রগড় করতে হবে। কয়েকদিন থেকে ওর ঝোঁক হয়েছে আমাকে ও উড়িয়ে দেবে। আমি নেই এই প্রমাণ করবার জন্যে ও অহরহ আমার কথাই ভাবছে। ওর চিন্তার ধাক্কায় বিচলিত হয়ে সেদিন—না, থাক এখন, সব কথা ভাঙব না তোমার কাছে। তুমি যা মুখ-আলগা লোক, এক্ষুণি গিয়ে বিষ্ণুকে সব কথা বলে' দেবে, আর সে এসে এই নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর শুরু করবে। তুমি ওকে এখন

ওই মায়ানদী পার হবার ব্যবস্থা করে' দাও। ও বুঝুক যেন ওর তপস্যার জোরেই এটা হ'ল—"

"স্বৈরচর এখন থাক তাহলে—"

"একটা সাঁকো করতে আর কতক্ষণ লাগবে। তারপর স্বৈরচরে হাত দিও। স্বৈরচর করতেই হবে—"

বিশ্বকর্ম্মা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"ওই মায়ানদীটি কে—"

"ও হচ্ছে ওই চার্ব্বাকেরই অবচেতন লোকের কামনা"

"এর ওপারে কি রকম ধরণের সাঁকো আপনি তৈরী করতে বলছেন"

"মায়ানদীর উপর মায়াসাঁকো বানাও"

"কি রকম হবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না"

তরুণকান্তি পিতামহ বিশ্বকর্ম্মার নাসিকাগ্রে একটি টোকা দিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তোমার নাকের ডগাটি তো খুব সূক্ষ্ম। বুদ্ধি এত মোটা কেন!"

বিশ্বকর্ম্মা অপ্রস্তুতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

পিতামহ বলিলেন—"আচ্ছা এক কাজ কর। উপনিষদের এক ঋষির শ্লোককেই মূর্ত্ত করে দাও। ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া—মনে পড়েছে?"

"পড়েছে"

"যাও তবে। বেশী দেরী কোরো না কিন্তু। স্বৈরচরদের তাড়াতাড়ি শেষ করে' ফেলতে হবে"

"আচ্ছা"

বিশ্বকর্ম্মা অপসৃত হইলেন।

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলে পিতামহ কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

ক্রমশ তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। বহুবর্ণের বিদ্যুৎকণা তাহার দেহ হইতে নির্গত হইয়া সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলকে বিচিত্র ও বঙ্কিমময় করিয়া তুলিল। মনে হইতে লাগিল, তরুণকান্তি পিতামহের দেহের আয়তন ক্রমশ উজ্জ্বলতর কিন্তু ক্ষীণতর হইতেছে। তাঁহার দেহই যেন ধীরে ধীরে অসংখ্য বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে। পিতামহ নূতন-তর সৃষ্টি-স্বপ্নের কল্পনা-লীলায় আবিষ্ট হইয়াছিলেন। নূতনতর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন সম্পূর্ণ আলোকময় জীবের সৃষ্টি সম্ভব কি না—যাহার দৈহিক স্থূলতা থাকিবে না—কিন্তু বুদ্ধি থাকিবে, প্রতিভা থাকিবে, গতি থাকিবে। অর্দ্ধ-সমাপ্ত গোক্ষুরমানবী পিতামহের ভাবান্তর দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"পিতামহ, আমাদের এ ভাবে ফেলে রেখে আপনি কোথায় অন্তর্হিত হচ্ছেন ?"

পিতামহ উত্তর দিলেন—"ভবিষ্যৎ লোকে। ভয় পেও না, সেখানে তোমরাও থাকবে। কথা বলে' আমাকে এখন বিরক্ত কোরো না"

পিতামহের সর্ব্বাঙ্গ হইতে আরও বিদ্যুৎকণা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

৪

মৃত্তিকা-বিদারণের শব্দে চার্ব্বাকের তপস্যা ভঙ্গ হইল। চার্ব্বাক চাহিয়া দেখিল মায়ানদী তখনও কলকলনাদে বহিয়া চলিয়াছে, তাহার প্রতি তরঙ্গ তখনও যেন তরলিত অশ্লেষের ভঙ্গীতে তাহার দিকে উন্মুখ হইয়া আছে, সুরঙ্গমার চোখের চঞ্চল দৃষ্টিই তাহাতে যেন আভাসিত হইতেছে। পুনরায় মৃত্তিকা বিদারণের শব্দ হইল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, তাহার সম্মুখ ভাগের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া একটি তীক্ষ্ণাগ্র শাণিত ছুরিকা ভূতল হইতে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছে। চার্ব্বাক রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই উদীয়মান ছুরিকাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল—কার্য্যের সহিত যখন কারণ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, এই বিস্ময়কর ঘটনারও নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। এই বৃহৎ ছুরিকা এ স্থানে কোথা হইতে আসিল? নিশ্চয় কেহ প্রোথিত করিয়া গিয়াছে। কেন? প্রোথিত ছুরিকাটি বা কোন্ শক্তিবলে এই কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে? চার্ব্বাকের যুক্তিবাদী মন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই অদ্ভুত আবির্ভাবের হেতু নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইল। তাহার মনে হইল তপস্যা দ্বারা আত্মস্থ হইতে চাহিয়া তো কোনই ফল হয় নাই। অলৌকিক মায়ানদী তো তেমনই প্রবাহিত হইতেছে, উপরন্তু বৃহদাকার অদ্ভুত এই ছুরিকাটি কোথা হইতে আসিল? ইহা কি তাহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ? ক্ষীণভাবে মনে পড়িল—গত রাত্রে পিতামহ-বিষয়ক চিন্তা করিবার পর হইতেই এমন সব অলৌকিক ঘটনাবলী তাহার জীবনে ঘটিতেছে যুক্তির দ্বারা যাহাদের কারণ নির্ণয় করা শক্ত, প্রায় অসম্ভব। যে রূপসীটি নিজেকে তাহার প্রেরণা বলিয়া পরিচিত করিয়াছিল এ সব কি তাহারই কীর্ত্তি?

মেয়েটি কি সত্যই যাদুকরী? সত্যই কি যাদুশক্তি বলিয়া কোনরূপ অঘটন-ঘটন-পটিয়সী শক্তি আছে? সম্ভবত নাই। কিন্তু জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও বোধশক্তি লইয়া অসীম সম্ভাবনার পরিমাপ করা কঠিন। হয়তো পরলোক, ব্রহ্মলোক, দেবলোক, স্বর্গ, নরক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলেরই অস্তিত্ব বর্ত্তমান। কিন্তু "হয়তো"র উপর নির্ভর করিয়া কি চার্ব্বাক তাহার জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবে? অসীম অনিশ্চয়তা অপেক্ষা সীমাবদ্ধ নিশ্চয়তা কি বেশী স্বস্তিকর নহে? যাহা প্রত্যক্ষ সত্য তাহাই কাম্য, সে সত্য যদি সীমাবদ্ধ হয়, পরবর্ত্তী নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় যদি সে সত্যের রূপান্তরও ঘটে তথাপি তাহাই কাম্য। নানাবিধ চিন্তা চার্ব্বাকের মস্তিষ্কে ভীড় করিতে লাগিল।

ছুরিকাটি কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও শ্লথগতি হয় নাই। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল ছুরিকাটি কিছুদূর ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া ক্রমশ নদীর দিকে হেলিয়া পড়িতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা নদী অতিক্রম করিয়া গেল এবং পরপারে পুনরায় ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। যাহা অলৌকিক ও অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল তাহাও আর পরমুহূর্ত্তে অলৌকিক বা অসম্ভব রহিল না, দিব্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়া চার্ব্বাককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনি কে, এখানে কি জন্য এসেছেন"

চার্ব্বাক ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল—"আমিও আপনাকে ঠিক ওই প্রশ্ন করব ভাবছিলাম। আপনি কে"

"আমি পাতাল-নিবাসী রাজপুত্র কালকূট। এখানে এসেছি ওই শবদেহে প্রবেশ করব বলে'। কিছুদিন পূর্ব্বেও এসেছিলাম, কিন্তু এই ছলনাময়ী মায়ানদী আমাকে পার হ'তে দেয় নি। তাই আমি ফিরে গিয়েছিলাম আবার পাতালে। আমার প্রেয়সী নাগ-

কন্যা বর্ণমালিনী বললেন—তুমি আবার ফিরে যাও, আমি আমার জিহ্বা দিয়ে মায়ানদীর উপর সাঁকো তৈরী করে' দেব, তুমি তার উপর দিয়ে মায়ানদী পার হয়ে যাও। ওটা ছুরিকা নয়, নাগকন্যা বর্ণমালিনীর জিহ্বা—"

"কিছু যদি না মনে করেন, তাহলে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে"

"করুন"

"আপনি ওই শবদেহে কেন প্রবেশ করতে চাইছেন"

"শুনেছি পিতামহ ব্রহ্মার এইটি শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। উনি নিজের ওই কীর্ত্তি-মন্দিরে বাসও করেন এও শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব, তাই ওই শবদেহে প্রবেশ করতে চাই"

তাঁর কাছে আপনার কি প্রয়োজন জানতে পারি কি"

"তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চাই"

"কিসের বোঝাপড়া"

"সে অনেক কথা। আমরা তাঁর পৌত্র কশ্যপের বংশধর। আমি জানতে চাই একই পিতার বংশধর কেউ দেব, কেউ দানব, কেউ নাগ হল কেন। একজনের স্থান স্বর্গে আর একজনের পাতালে কেন, ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী বিশ্ববরেণ্যা অথচ আমার পত্নী বর্ণমালিনীকে কেউ চেনে না কেন বর্ণমালিনী রূপে গুণে শচীদেবীর চেয়ে কম নন। তিনিও অনন্যা। তবে এ অবিচার কেন ?"

চার্ব্বাক লক্ষ্য করিল কালকূটের চক্ষু দুইটিতে নিষ্ঠুর ভুজঙ্গ-ভাব প্রকটিত হইয়াছে। তাহার আশঙ্কা হইতে লাগিল ওই অনিন্দ্যসুন্দর মুখও হয়তো এখনই ফণায় রূপান্তরিত হইবে।

চার্ব্বাক বলিল—"আমিও পিতামহের দর্শনপ্রার্থী। আমিও

শুনেছি যে পিতামহ ওই শবদেহে আছেন, এই মায়ানদী আমাকেও বাধা দিয়েছে ক্রমাগত। কিন্তু—”

চার্ব্বাক থামিয়া গেল। যে কথাটা মনে জাগিয়াছিল তাহা কালকূটের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কোচ হইল।

“কিন্তু কি, বলুন থেমে গেলেন কেন”

“আমি পিতামহকে দেখতে চাই সত্যভাবে, একটা ভোজবাজির চমৎকৃতির ভিতর দিয়ে নয়। আমার মনে হচ্ছে কি করে জানিনা আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়েছি। যা আমি প্রত্যক্ষ করছি তা মনে হচ্ছে অসম্ভব। কিন্তু এ অনুভূতিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতেও পারছি না, প্রত্যক্ষকে অস্বীকার করব কি করে’ ?”

“আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় হয়তো অভাবিত উপায়ে নূতন শক্তি অর্জ্জন করেছে। সেই শক্তিবলে আপনি অভিনব জগৎ প্রত্যক্ষ করছেন, পুরাতন যুক্তি দিয়ে বিচার করছেন বলেই অসম্ভব মনে হচ্ছে। নূতন যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে”

“পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের শক্তি কি অভাবিত উপায়ে এ ভাবে বদলে যেতে পারে ? এই মায়ানদী, বর্ণমালিনীর এই বিস্ময়কর জিহ্বা, ওই বিরাট শবদেহ, এ সমস্তই কি সত্য ? পিতামহ কি সত্যই আছেন ?”

“আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আগে আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি। আপনার শৈশবে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বাইরের জগৎকে যে ভাবে প্রত্যক্ষ করত এখনও কি ঠিক সেই ভাবেই করে ? এখনও কি অন্ধকার রাত্রে গাছকে ভূত বলে’ মনে করেন ? মনোহরকান্তি সর্পের দিকে কি এখনও নির্ভয়ে হাত বাড়াতে পারেন ?”

“বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক ভ্রান্তি অপনোদিত হয়েছে মানছি। কিন্তু বৃক্ষের বৃক্ষত্ব বা সর্পের সর্পত্ব তখনও আমার

কাছে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। আপনাকে আমি সর্প-বংশজাত বলে' মানতে প্রস্তুত নই। আমার মনে হচ্চে আমি মোহগ্রস্ত হয়েছি"

"মোহগ্রস্তই হয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই, আপনার যুক্তির অহঙ্কারই আপনার মোহ। আমাকে সর্পকুলজাত বলে' মানতে প্রস্তুত নন আপনি? কেন? আমার আকৃতি মানুষের মতো বলে? দেখুন, প্রত্যক্ষ করুন—"

দেখিতে দেখিতে কালকূট এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণসর্পে রূপান্তরিত হইলেন এবং তর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"কিছুদিন পরে আপনার দেহ *যে ভস্মে ও বায়বীয় আকারে পরিণত হবে সে তখন যা প্রত্যক্ষ করবে* তা এখন কল্পনা করাও আপনার পক্ষে অসম্ভব। আপনার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্ছে আপনি যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক, কিন্তু একটা কথা আপনাকে মনে রাখতে অনুরোধ করছি। যুক্তির শৃঙ্খলে কখনও নিজেকে বন্দী করবেন না, আপনার যুক্তি হবে আপনার সত্য নির্দ্ধারণের উপায় স্বরূপ। তা যদি আপনার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে তাহলে আপনি প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সত্য উদ্ধার করতে পারবেন না। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই আপনাদের মতো বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সম্বল, যদি কোনও কারণে, তা সে কারণ যত বড় যুক্তিযুক্তই হোক, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে আপনার সন্দেহ জন্মায় তাহলেই আপনি দিশাহারা হয়ে পড়বেন। যা প্রত্যক্ষ করছেন তা আপনাকে মানতেই হবে"

কালকূট পুনরায় মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"প্রত্যক্ষ সত্যকে স্বীকার না করে' উপায় নেই, অন্ধকার রাত্রে ক্ষুদ্র প্রদীপশিখার উপর নির্ভর না করে যেমন উপায় নেই। কিন্তু এ কথাও বলছি ওটা খুব নির্ভরযোগ্য

ব্যাপার নয়। আপনি পিতামহের দর্শনপ্রার্থী কেন তা জানতে পারি কি ?"

চার্ব্বাক ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল—"কৌতূহল মাত্র। আমার ধারণা তিনি নেই, অনুসন্ধান করে' দেখছি আমার এ ধারণা ঠিক না ভুল"

"বেশ, তাহলে আসুন, বর্ণমালিনীর জিহ্বার উপর দিয়ে মায়া-নদী পার হওয়া যাক"

"আপনার পত্নীর জিহ্বার উপর পদার্পণ করবার অধিকার আপনার হয়তো আছে কিন্তু আমার তো নেই"

"সে অধিকার আপনাকে আমি দিচ্ছি। আপনার সাহস আছে কিনা সেইটে আপনি ভেবে দেখুন। বর্ণমালিনীর ওই জিহ্বা শুধু স্পর্শদ্বারা বিবর্ণকুলকে ধ্বংস করেছে—"

"আমি চার্ব্বাক। সত্য নির্দ্ধারণের জন্য যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হতে আমি প্রস্তুত। আমার কিন্তু একটা খটকা লাগছে—সর্পের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত শুনেছি"

"ঠিকই শুনেছেন। অধিকাংশ সর্পের জিহ্বাই দ্বিখণ্ডিত, কারণ তারা সমুদ্র-মন্থনের পর অমৃতের লোভে কুশলেহন করেছিল। বর্ণমালিনীর পূর্ব্বপুরুষ শৃঙ্গনাসা এ হীনতা স্বীকার করেন নি, তাই তাঁর এবং তাঁর বংশধরদের জিহ্বা অখণ্ডিত আছে"

চার্ব্বাক নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"কি ভাবছেন"

"ভাবছি ওই শবদেহের মধ্যে যে সম্ভাব্য সত্য আছে তার মূল্য আমার জীবনের মূল্যের চেয়ে বেশী কিনা। বর্ণমালিনীর জিহ্বার বিষাক্ত স্পর্শে হয়তো আমার মৃত্যু হতে পারে, ভাবছি এই বিপদ বরণ করা যুক্তিযুক্ত কিনা"

"আপনি যদি বর্ণবিরোধী হন তাহলে আপনার মৃত্যু সুনিশ্চিত। বিবর্ণবাদীদের ধ্বংস করবার জন্যেই বর্ণমালিনী তপস্যা করে' ওই বিশেষ রাসায়নিক শক্তি লাভ করেছিলেন—"

"আমি বর্ণবিরোধী নই"

"তাহলে আপনি নির্ভয়ে আসতে পারেন। আসুন"

কালকূট সেই ধনুকাকৃতি সাঁকোর উপর আরোহণ করিয়া অনতিবিলম্বে পরপারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। চার্ব্বাকও অনুসরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সহসা তাহার নজরে পড়িল মায়ানদী অদৃশ্য হইয়াছে, নদীর খাতে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে একদল আলেয়া! চার্ব্বাক আর বৃথা সময়ক্ষেপ না করিয়া সাঁকোর উপর আরোহণ করিল। কিছুদূর উঠিয়াও সে কিন্তু কালকূটকে আর দেখিতে পাইল না। চার্ব্বাকের মনে হইল মায়ানদীর মতো কালকূটও কি তাহা হইলে মায়া? আর একটা কথাও চার্ব্বাকের মনে হইতে লাগিল। বর্ণমালিনীর জিহ্বায় কোন কোমলত্ব নাই কেন? ক্ষুরধার লৌহকঠিন এই বস্তুটি কি কোনও জীবন্ত প্রাণীর জিহ্বা হইতে পারে? জিহ্বা যদি না হয় তাহা হইলে ইহা কি? চিন্তা করিতে করিতে চার্ব্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুরধার পথে অন্যমনস্ক হইয়া চলা কঠিন, চার্ব্বাক স্খলিতচরণ হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল কিন্তু শূন্যপথে এক দ্যুতিমান বৃহদাকৃতি পতঙ্গ আবির্ভূত হইয়া কহিল—"চার্ব্বাক, অন্যমনস্ক হোয়ো না। আমার উপর ভর দাও, আমি তোমাকে নির্ব্বিঘ্নে পার করে দেব"

"তুমি কে"

"আমি তোমার মনীষা"

চার্ব্বাক পতঙ্গের উপর ভর দিয়া সেই ক্ষুরধার পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

৫

বিশ্বকর্ম্মা পিতামহের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন যে সকল অর্দ্ধসমাপ্ত স্বৈরচর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল তাহারাও কেহ নাই। ইহাতে কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার বিস্ময় হইল না। কৌতুকী পিতামহের বহুবিধ কৌতুক-পরায়ণতার পরিচয় তিনি ইতিপূর্ব্বে বহুবার পাইয়াছিলেন। পিতামহ নিজেকে নানারূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া বহুবার তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিয়াছেন। এই তো সেদিনের কথা, যখন তিনি হিমালয় নির্ম্মাণে ব্যস্ত ছিলেন তখন একদা গভীর নিশীথে ভয়ঙ্কর শব্দসহকারে গিরিগাত্র বিদীর্ণ হইয়া নিদারুণ অগ্নি উদ্গত হইল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী দগ্ধ হইতে লাগিল, হিমালয়ের কিছু অংশ ভস্মীভূত হইয়া গেল, ধরিত্রীর অন্তঃস্থল হইতে গলিত স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তাম্র উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশপটে অভিনব জ্যোতির্ম্ময় উৎসব করিতে লাগিল. কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় বিশ্বকর্ম্মা সৃষ্টিকার্য্য স্থগিত রাখিয়া আত্মরক্ষামানসে পলায়নপর হইয়াছিলেন এমন সময় গর্জ্জমান অগ্নিশিখার প্রচণ্ড গর্জ্জন প্রচণ্ড হাস্যে রূপান্তরিত হইল। অগ্নিশিখার ভিতর হইতে হাসিতে হাসিতে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন—"ভয় পেলে না কি বিশু, ভয় পেও না, তোমার সৃষ্টি একটু বদলে দিলাম"

বিশ্বকর্ম্মা একটু রুষ্ট হইয়াছিলেন।

"বদলে দিলেন মানে?"

"তোমার মাপজোক বড় নিখুঁত হচ্ছিল। সৃষ্টি ব্যাপারে অত জ্যামিতি পরিমিতি মেনে চললে কি চলে? কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, কোথাও ঠাণ্ডা, কোথাও গরম, কোথাও উষর, কোথাও ধূসর, কোথাও শ্যামল, কোথাও রঙীন—খেয়াল খুশীর বৈচিত্র্য থাকা চাই;

তুমি যা করছিলে তাতো একটা ঢিবি। এইবার দেখতো কেমন হল—"

আর একবার, বিশ্বকর্ম্মা যখন গভীর সমুদ্রের তলদেশে মুক্তি সজ্জিত করিতেছিলেন বিশালকায় এক জীব আসিয়া তাঁহার সম্মুখে মুখ ব্যাদন করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মস্তকের উভয় দিক হইতে তীব্র আলোকচ্ছটা নির্গত হইয়া সহসা সমুদ্রের অন্ধকারকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিতেছিল, মনে হইতেছিল সমুদ্রের জলে বুঝি সহসা আগুন লাগিয়া গেল। সেবারও বিশ্বকর্ম্মা ভয় পাইয়াছিলেন, সেবারও সেই ভীষণ জলজন্তু পিতামহের কমনীয় কান্তিতে রূপান্তরিত হইয়া মৃদুহাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। আমি ভাবছিলাম তোমার এই চমৎকার মুক্তোগুলো পাহারা দেবার জন্য ভয়ঙ্কর একটা জানোয়ার সৃষ্টি করলে কেমন হয়? সুন্দরের ঠিক পাশেই ভয়ঙ্কর না থাকলে সুন্দর আর সুন্দর থাকবে না, খেলো হয়ে যাবে? কি বল—" পিতামহের নির্দ্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্ম্মাকে বহুবিধ সামুদ্রিক জীবও সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বকর্ম্মার মনে হইল পিতামহ সম্ভবত অনুরূপ কোন কৌতুকে মত্ত হইয়া নূতন ক্রীড়ায় লিপ্ত হইয়াছেন। তখন সেই শূন্য কক্ষেই পিতামহ অবস্থান করিতেছেন ইহা ধরিয়া লইয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"পিতামহ আমি আপনার নির্দ্দেশ অনুসারে চার্ব্বাককে মায়ানদী পার করে' দিয়েছি, কিন্তু আমি নিজের বুদ্ধিতে আর একটা কাজও করেছি, জানি না আপনি তা সমর্থন করবেন কিনা"

শূন্য কক্ষের বায়ুস্তর কয়েকটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের স্ফুরণে ক্ষণিকের জন্য চমকিত হইয়া উঠিল এবং পরমুহূর্ত্তেই পিতামহের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"তুমি যা করেছ তা আমি জানি। তুমি নিজের বুদ্ধিতে যা

করেছ তাও আমার অজানা নয়, কারণ সে বুদ্ধি আমিই তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করেছি। মুখরা বর্ণমালিনীর জিভটাকে তাক মাফিক খুব কাজে লাগানো গেছে। কালকূটের সঙ্গে চার্ব্বাকের দেখা হওয়াতেও খুব ভাল হয়েছে। দুই গোঁয়ারে জুটে কি ভীষণ কাণ্ড করে দেখ না—"

"ভীষণ কাণ্ড করবে না কি"

"নিশ্চয়। সুন্দ-উপসুন্দের কথা মনে নেই, যার জন্য তোমাকে তিলোত্তমা বানাতে হ'ল, যে তিলোত্তমাকে দেখতে গিয়ে আমি চতুর্ম্মুখ হয়ে গেলাম এরাও সেই সুন্দ-উপসুন্দের জাত। তুলকালাম করে' তবে থামবে—"

বিশ্বকর্ম্মা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"তাই না কি, কি করবে বলুন তো—"

"তা এখনও আমি ঠিক করি নি"

কথাটা বিশ্বকর্ম্মা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন না।

পিতামহ বলিলেন—"ও নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না। সেদিন যে নূতন দ্বীপটি সৃষ্টি করেছ তার জন্যে কয়েক অক্ষৌহিনী ক্যাঙারু তৈরী করগে যাও। বেশ বড় বড় ক্যাঙারু চাই—"

বিশ্বকর্ম্মা ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"স্বৈরচর তৈরী তাহলে এখন স্থগিত রইল?"

"না, তাদের ভার আমি স্বয়ং নিয়েছি। তাদের নিয়ে আমি এখন বাস করছি ভবিষ্যৎলোকে"

"ভবিষ্যৎলোকের সৃষ্টি আবার কবে হল?"

"হয় নি, হবে। তাই নিয়েই ব্যস্ত আছি আমি"

"কোথায় আছেন আপনি?"

"ভবিষ্যৎলোকে"

"ঠিক মাথায় ঢুকছে না আমার। যে লোক নেই সেখানে আপনি আছেন কি করে।"

"তাই যদি বুঝতে পারবে তাহলে তুমি বিশ্বকর্ম্মা না হয়ে ব্রহ্মা হতে। তোমার যেটুকু বুদ্ধি আছে তা অতিশয় কুচুটে বুদ্ধি, নিজের কাজ না করে' তাই তুমি বিষ্টুর সঙ্গে জুটে গোপনে আমার নামে যা তা আলোচনা কর—"

"আজ্ঞে না, যা তা আলোচনা তো কখনও করি নি। বিষ্ণুই বলছিলেন যে আপনি যদি সত্যিই স্বৈরচর সৃষ্টি করেন তাহলে সৃষ্টি আর থাকবে না—"

"এমনিতেই সৃষ্টি আছে না কি। বিষ্ণুকে বলে' দিও যে আমি একদিন আমার সমস্ত সৃষ্টির হিসাব তার কাছে দাবী করব। সে হিসাব তিনি যদি নিখুঁতভাবে না দিতে পারেন তাহলে এমন এক স্বৈরচর তৈরী করব যে তাঁর বিষ্ণুত্বই লোপ করে দেবে সে। বিষ্ণুকে বলে' দিও এ কথা—"

শূন্যকক্ষের বায়ুস্তরকে চিরিয়া সশব্দে বিদ্যুৎ চমকিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা মুখব্যাদন করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না। সশব্দে আর একটি বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ সর্পাকারে প্রলম্বিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ফণা বিস্তার করিয়া ঘুরিতে লাগিল। পিতামহের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। "বিশু, ভয় পেলে না কি, ভয় পেও না। যা বললাম তা কর গিয়ে। তোমার যেমন ভাবে খুশী তেমনি ভাবে কর, তোমাকে আমি আর বাধা দেব না, কারণ আমার বাধা দেবার সময় নেই। ভবিষ্যৎলোক নিয়ে আমি মহাব্যস্ত আছি। ঠিক করেছি ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করব নানা মাপের বিদ্যুৎ তরঙ্গ দিয়ে, ওই তরঙ্গগুলোই হবে সেই লোকের নিয়ামক। সৃষ্টি ঠিক এমনিই

থাকবে, কিন্তু তা নিয়ন্ত্রিত হবে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রভাবে। নানারকম বিদ্যুৎতরঙ্গের সম্ভাবনা আমি সৃষ্টি করছি মহাকাশে। তোমার সাহায্যের দরকার নেই এতে, কারণ কল্পনাই এ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। তুমি ক্যাঙারু তৈরী কর গে যাও। আর বিষ্ণুকে বোলো আমার সৃষ্টির হিসাবটা যেন ঠিক করে' রাখে, হঠাৎ একদিন গিয়ে হাজির হব আমি। পালনকর্তা নিজের কর্তব্যটা কেমন ভাবে করেছেন দেখতে চাই। তুমি যাও—"

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—"পিতামহ, যদি অভয় দেন, তাহলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ভবিষ্যৎলোক সৃষ্টি করবার এ-অদ্ভুত প্রেরণা আপনি পেলেন কি করে?"

"প্রেরণা জোগাচ্ছে ওই চার্ব্বাকের দল। ওদেরই জিজ্ঞাসায় বিচলিত হয়ে আমি নানারূপে বিবর্ত্তিত হয়ে আত্মআবিষ্কার করছি। ওরা আমাকে ধরতে চাইছে, আর আমি নানা ছদ্মবেশে এড়িয়ে যাচ্ছি ওদের। এই লুকোচুরি খেলা চলছে, এই খেলাই আমার প্রেরণা—"

বিশ্বকর্ম্মা নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন।

পিতামহ ব্যঙ্গ করিয়া উঠিলেন।

"অমন হাঁ করে আছ কেন। এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা অস্থির হচ্ছ কেন। এ সব তোমার মাথায় ঢুকবে না। যে যাতে আনন্দ পায়, তাই তার মাথায় ঢোকে। জোঁক তাই রক্ত বোঝে, ভ্রমর বোঝে মধু আর বিশ্বকর্ম্মা বোঝে মিস্ত্রিগিরি। এ নিয়ে মাথা ঘামিও না তুমি—ক্যাঙারু তৈরী শেষ হলে' তিমি বানিয়ে দিও কিছু। কিছুক্ষণ আগে উত্তর মেরুতে গিয়েছিলাম দেখলাম তিমি খুব কমে গেছে। সেখানে এমন একদল মানুষ জুটেছে যে বড় বড় তিমিগুলোকে ধরে' ধরে' সাবাড় করে' দিচ্ছে। এই মানুষগুলোকে

নিয়ে অস্থির হয়ে পড়া গেছে, তছনছ করে' ফেললে সব। ওই যে সরো এসে গেছে, ওর জন্যই অপেক্ষা করছি, তুমি যাও এবার”

একটা অপরূপ সুর দ্বারপথে প্রবেশ করিল। বিশ্বকর্ম্মা বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু প্রস্থান করিলেন না, তিনি দূর হইতে দাঁড়াইয়া দেবী বীণাপাণির অভিনব আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। সুর ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল, মনে হইতে লাগিল অসংখ্য ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। সহসা সুর থামিয়া গেল, আলোক বিকশিত হইল। বিশ্বকর্ম্মা সবিস্ময়ে দেখিলেন—সহস্রবর্ণ এক শতদল শূন্যে বিকশিত হইয়াছে, ক্রমশ দেবী বীণাপাণি তাহার উপর মূর্ত্ত হইলেন।

পিতামহ পুলকিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুখে তিনি বলিলেন—

“সরো, বড্ড বেশী ভড়ং করছ তুমি আজকাল। চার্ব্বাককে ভোলাবার জন্যে এসব দরকার হতে পারে কিন্তু আমার কাছে অতটা না-ই করলে। আচ্ছা সরো, ভবিষ্যৎ যুগেও চার্ব্বাক থাকবে না কি”

সরস্বতীর অধরে একটি মৃদু হাস্য কম্পিত হইতেছিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—“অনন্ত জিজ্ঞাসাই তো যুগে যুগে চার্ব্বাকের রূপে মূর্ত্ত হয়েছে পিতামহ। আপনারই প্রেরণা তো সৃষ্টি করেছে তাদের। ভবিষ্যৎ যুগেই বা ... থাকবে না কেন। জিজ্ঞাসার তো অন্ত নেই”

পিতামহ হাসিয়া বলিলেন—“জিজ্ঞাসার অন্ত থাকলেও বা থাকতে পারে, কিন্তু তোমার কোনও অন্ত নেই। তুমিই তো নাচাচ্ছ আমাকে। শুধু আমাকে কেন বিষ্টুকেও। মহাদেবকেও। যিনি সরস্বতী, তিনিই লক্ষ্মী, তিনিই দুর্গা। তুমি কম না কি !”

পিতামহ আবেগভরে অগ্রসর হইয়া বীণাপাণিকে চুম্বন করিলেন।

"কি যে বলেন পিতামহ, লক্ষ্মীর সঙ্গে তো আমার ঝগড়া—"

"ওসব বাইরের মৌখিক ঝগড়া। আসলে তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা তিনজনেই এক। ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ্বরের জন্যে এককে ভেঙে তিন করতে হয়েছে। একটাকে নিয়ে তিন জনে তো আর কাড়াকাড়ি করা যায় না। ওঃ এককালে কি মারপিটই করা গেছে—"

"কি হয়েছিল বলুন না"

"সে অনেক কথা, অত কথা বলবার এখন সময় নেই"

"একটু বলুন না—"

"কি হবে সে সব শুনে। অতীতের চেয়ে ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক এস। ভাবীকালের চার্ব্বাক কেমন হবে, তার পরিণতি কি হবে, তারই একটা আঁচ দাও বরং তুমি"

"তা দেব। কিন্তু আপনি আগে ওই গল্পটা বলুন"

"কি মুশকিল। ছাড়বে না যখন শোন তবে। ডিম ফেটে আমি যখন বেরুলাম তখন দেখি কোথাও কেউ নেই। চতুর্দ্দিক খাঁ খাঁ করছে। ভাব্‌লাম ভালই হয়েছে, আমাকে যখন সৃষ্টি করতে হবে তখন চারিদিকে ফাঁকা থাকাই ভাল। নিজের সৃষ্টি দিয়ে চারিদিক পরিপূর্ণ করে' তুলব। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম চারিদিকে। ভাবতে লাগলাম প্রথমে কি সৃষ্টি করা যায়। অনেকক্ষণ ভেবে স্থির করলাম সৃষ্টির প্রাণ হচ্ছে রস। সুতরাং প্রথমে রস-সৃষ্টি করতে হবে। যেমনি কথাটি মনে হওয়া আর অমনি চারিদিক জলে থৈ থৈ করতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই জলে ভাসতে ভাসতে বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। বিষ্ণুকে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কে হে। বিষ্ণু উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি বললাম—কি রকম, সৃষ্টিকর্ত্তা তো আমি। আমার কথা শুনে বিষ্ণু এত চটে' গেলেন যে চড়াৎ করে' তাঁর কপালটা ফেটে গেল, আর সেই ফাটল থেকে

বেরিয়ে এলেন রুদ্র। ইনিই পরে মহাদেব হয়েছেন। এঁকেও জিগ্যেস করলাম—বাবাজি, তুমি কে। বাবাজী উত্তর দিলেন—আমি সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি তো অবাক। তুজনকে দেখেই তখন অবাক হয়েছিলাম। তেত্রিশ কোটি তখনও জোটে নি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় মহাশূন্য অতি মধুর কলহাস্যে শিউরে উঠল যেন! ঘাড় তুলে দেখি অপরূপ এক জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আমাদের তিনজনের দিকে চেয়ে বললেন—"আমি মহাশক্তি। আমাকে যিনি লাভ করতে পারবেন তিনিই হবেন সৃষ্টিকর্ত্তা, কারণ আমার সহায়তা ভিন্ন কোনও সৃষ্টিই হতে পারে না।" তিনজনই তখন উদ্বাহু হয়ে ছুটলাম তাঁর পিছু পিছু। তিনিও ছোটেন, আমরাও ছুটি। কিছুদূর ছোটবার পর বিষ্ণু জাপটে ধরে' ফেললে তাকে। তারপর আমি এসে তুজনকেই জাপটে ধরলুম। ময়শা মোটা মানুষ, অনেক পিছিয়ে পড়েছিল, কিন্তু সেও শেষকালে এসে আমাদের তিনজনকেই জাপটে ধরলে। চরম জাপটা-জাপটি চলছে জলের ভিতর, হঠাৎ আমার মনে হল এই ধস্তাধস্তিতে অমন সুন্দর মেয়েটি বোধ হয় মারা গেল। আহা, ওকে যদি কোনরকমে সরানো যায়! আমার একটা ক্ষমতা আছে, তোমরা বোধহয় জান না, আমি যক্ষুণি যা মনে করব তক্ষুণি তাই হয়ে যাবে। আমি মনে করবামাত্র মহাশক্তি অন্তর্দ্ধান করলেন, কোথায় ও কি ভাবে তা আমি এখনও জানি না। তিনজনে মিলে বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে' যখন আমরা গলদঘর্ম্ম এবং পরিশ্রান্ত তখন বিষ্ণু সকাতরে মহাদেবকে বললেন—আপনি আমার পিঠের উপর থেকে নামুন, আমার মনে হচ্চে মেয়েটি সরে' পড়েছে। মহাদেব আমাকে বললেন, আমার কোমরটা ছাড়ুন তাহ'লে। তিনজনেই উঠে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দেখি সত্যিই মহাশক্তি নেই। বিষ্ণু আর কথাবার্ত্তা না বলে' চিৎ সাঁতার কাটতে কাটতে

সরে' পড়লেন। মহাদেব আমার দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর বললেন—আপনি কে বলুন দেখি। বললাম—আমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা। মহাদেব হেসে বললেন—তাই না কি। আপনিও সৃষ্টিকর্ত্তা? আচ্ছা, আমার জন্যে বেশ নধর একটি ষাঁড় তৈরী করুন দেখি। আমি বললাম—কেন ষাঁড় নিয়ে কি হবে? মহাদেব বললেন—এই জলে ছপ ছপ করে কাঁহাতক হেঁটে বেড়ানো যায়। একটা ষাঁড় পেলে তার পিঠে চড়ে বেড়াতাম। আমি বললাম—তুমি তো নিজেই সৃষ্টিকর্ত্তা বাবাজি, নিজেই নিজের ষাঁড় সৃষ্টি করে নাও না। ময়শা কি বললে জান? বললে—আমি নিজের জন্যে কখনও কিছু সৃষ্টি করব না। যা কিছু করব পরের জন্যে। কি ধূর্ত্ত দেখ। আসলে ও দেখতে চাচ্ছিল যে আমি সত্যি কিছু সৃষ্টি করতে পারি কি না। দিলাম একটা ষাঁড় সৃষ্টি করে'। বিরাট এক ষাঁড়। ময়শা টপ করে চড়ে বসল তাতে। আমার দিকে ফিরে বললে—আমি চললুম। আবার দেখা হবে। পারেন তো আমার জন্যে একটা ভালো পাহাড় তৈরী করে' দেবেন। আমিও কম ধূর্ত্ত নই, সঙ্গে সঙ্গে বললাম—তোমার জন্যে তো ষাঁড় তৈরী করে' দিলুম, তুমি আমার জন্যে কিছু একটা করে' দিয়ে যাও। নিজের জন্যে কিছু করাটা সত্যিই ভাল দেখায় না। ময়শা বললে—বেশ আপনি কি চান বলুন। আমি বললাম—আমার জন্যে একটি হাঁস করে' দাও বাপু। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র চলবে। ময়শার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে গেলুম। আকাশের দিকে চেয়ে তিনটি তুড়ি মারলে কেবল, আর পাখা ঝটপট করতে করতে বিশাল এক রাজহংস নেবে এল আকাশ থেকে। ময়শা ষাঁড়ে চড়ে চলে গেল। আমিও চড়ে বসলাম হাঁসের পিঠে। হাঁস উড়ে চলল মহাশূন্যে, অন্ধকার মহাশূন্যে, তখনও সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হয় নি,

বাতাসও সৃষ্টি হয় নি। সেই নিবাত নিষ্কম্প অন্ধকারে হাঁসের পিঠে চড়ে আমি উড়ে চললুম। কতকাল যে চলেছিলুম তা জানি না। যে সৃষ্টি তখনও হয় নি সেই সৃষ্টির স্বপ্নে মশগুল হয়ে চলেছিলুম। হঠাৎ দেখলাম—খানিকটা অন্ধকার কাঁপছে, থর থর ক'রে কাঁপছে। আর একটু কাছে যেতেই কথা শুনতে পেলাম। অন্ধকার মহাশূন্য বাণীর আবেগে কাঁপছিল। শুনতে পেলাম—কোথায় তুমি, আমাকে প্রকাশ কর, আমাকে সফল কর, সৃষ্টির উল্লাসে আমাকে বিকশিত কর, অন্ধকারের অন্তরালে আমাকে সংহরণ করে' রেখেছ কেন সৃষ্টিকর্ত্তা। নব নব সৃষ্টির বৈচিত্র্যে মুক্তি দাও আমাকে। আমার হাঁস মহাশূন্যে পক্ষ বিস্তার করে' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল—এরই উদ্দেশ্যে সে যেন উড়ে আসছিল। আমি প্রশ্ন করলাম—কে তুমি? কাকে ডাকছ? উত্তর পেলাম—আমি মহাশক্তি। তোমাকেই ডাকছি। তোমারই কল্পনার নির্দ্দেশে আমি এই অন্ধপুরীতে অজ্ঞাতবাস করছি। আমাকে মুক্ত কর, তুমি বললেই আমি মুক্তি পাব। তোমাদের তিনজনের কলহ-নিবারণের উপায়ও আমি ভেবে রেখেছি। আমাকে মুক্তি দাও, সব বলছি। অপরূপ এক কল্পনায় আমার চিত্ত উদ্বেলিত হয়েছে, আমাকে মুক্তি দাও, আমাকে প্রকাশ কর। আমি বললাম—মুক্ত হও। অন্ধকারের আবরণ সরে' যাক। তোমার সম্পূর্ণ মহিমায় তুমি প্রকাশিত হও। সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি প্রকাশিত হলেন। মহাশূন্যের প্রগাঢ় অন্ধকার উদ্ভাসিত করে' আবার আবির্ভূত হলেন সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি। আমি বললাম—কলহ নিবারণের কি উপায় ভেবেছ এইবার বল। মহাশক্তি বললেন—বিষ্ণু এবং মহেশ্বরও সৃষ্টিকর্ত্তা, ওঁদেরও বঞ্চিত করলে চলবে না, ওঁদের বঞ্চিত করলে তোমারই সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত

হবে। সুতরাং ঠিক করেছি আমি ত্রিধাবিভক্ত হব। আমার এক একটি ভাগ এক একজনের কাছে থাকবে। আর একটি ব্যবস্থাও করতে হবে। তোমাদের তিনজনের কাজ ভাগাভাগি করে' নিতে হবে। তোমার অফুরন্ত সৃষ্টির কাজ যদি অনাদিকাল অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও তাহলে তোমার এই বিশাল সৃষ্টির দেখাশোনা করবার ভার আর একজনকে নিতে হবে। তুমি নিজে যদি সে ভার নিতে যাও তাহলে তুমি বৈষয়িক হয়ে পড়বে আর স্রষ্টা থাকবে না। আমার মতে বিষ্ণুকে তুমি পালনকর্ত্তা করে দাও। আর মহাদেবকে কর সংহারকর্ত্তা। কারণ সৃষ্টিকে চিরনবীন রাখতে হ'লে পুরাতনকে অপসারিত করতে হবে। মহেশ্বর সেই কাজ করুন। সৃষ্টি ব্যাপারকে অনাবিল অব্যাহত রাখতে হলে এই তিনটি জিনিসই দরকার। তোমরা তিনজন সৃষ্টিকর্ত্তা এই তিনটি বিষয়ের ভার নাও, তাহলে তোমাদের ঝগড়াও থাকবে না সৃষ্টিও নব নব বৈচিত্র্যে ভরে' উঠবে। আমি বললাম—কল্পনাটি করেছ মন্দ নয়, কিন্তু এসব হবে কি করে'। মহাশক্তি বললেন—তুমি ইচ্ছা করবামাত্রই হবে। তুমি বললেই আমি ত্রিমূর্ত্তি হয়ে যাব। বলেই দেখ না। আমি বললাম—মহাশক্তি তুমি তিনরূপে আবির্ভূত হও। বলবার সঙ্গে সঙ্গে মহাশক্তি অন্তর্হিত হলো। একটু পরেই দেখি তুমি, লক্ষ্মী আর দুর্গা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছ—"

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"কি যা তা বলছেন বানিয়ে বানিয়ে"

"এসব তোমার বেদে পুরাণে নেই। দু'একজন ঋষি তপোবলে খানিকটা খানিকটা জেনেছিলেন তাই বাড়িয়ে কমিয়ে খাদ মিশিয়ে সাতকাহন করে' লিখেছেন। কিন্তু আমি যেটা বলছি সেইটেই হচ্ছে আসল কথা।"

"বেশ, তারপর কি হল বলুন"

"তারপর আমি তোমার মুখের দিকে চাইলুম, আর সঙ্গে সঙ্গে তুমি চোখ নীচু করলে। বুঝলাম আমাকেই পছন্দ হয়েছে তোমার। আমি আর কালবিলম্ব না করে' বললাম—হৃদয়েশ্বরি আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ কর। আমাত্রই কিন্তু তুমি যা করলে তা আমি প্রত্যাশা করিনি। আমি কথাটা বলেছিলুম রূপক ছলে, কিন্তু তুমি সত্যি সত্যি এসে আমার হৃদয় জুড়ে বসে' পড়লে। অর্থাৎ বাইরে তোমার আর কিছু রইল না। বহুকাল পরে নদীরূপে তোমাকে যখন ব্রহ্মাবর্তের সীমারেখা করে' সৃষ্টি করেছিলাম তখন যেমন তুমি বালির মধ্যে ঢুকে অন্তঃসলিলা হয়ে প্রবাহিত হয়েছিলে—আমার কাছে প্রথম যখন এলে তখনও তুমি এ[illegible]রে আমার অন্তর্লীনা হয়ে গেলে। আমার কল্পনায় ওত-প্রোত হয়ে বিরাজ করতে লাগলে—"

"তারপর?"

"তারপর যা ঘটেছে তাতো তোমার অজানা নয়। তারপর থেকে আমি যা করেছি তোমারই প্রেরণাতে করেছি। লক্ষ্মী আর দুর্গার দিকে আমি নির্নিমেষে চেয়েছিলাম তাই [illegible]মেই সমুদ্র আর হিমালয় সৃষ্টি করতে হল।"

"কেন—"

"তুমি মনের ভিতর বসে' খোঁচা দিতে লাগলে, আর কেন। ক্রমাগত বলতে লাগলে—ওদের সরাও চোখের সামনে থেকে। সমুদ্র সৃষ্টি করে' লক্ষ্মীকে রেখে এস তার তলায়, আর হিমালয় সৃষ্টি করে' দুর্গাকে পাঠিয়ে দাও সেখানে—"

সরস্বতীর নয়নযুগলে হাস্য টলমল করিতেছিল। তিনি আরও

ক্ষণকাল পিতামহের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—আমার কিন্তু কিছুই মনে পড়ছে না”

“তোমার তো মনে থাকবার কথা নয়। তুমি আমার কল্পনায় ভর করে' যা কিছু কর তা আমার মনে থাকে। তোমার থাকবে কি করে'? তোমার কি তখন এই কুন্দেন্দুকান্তি দেহ থাকে, না মন থাকে? কখনও আলোর মতো—কখনও শিখার মতো—কখনও দেহ-হীন প্রেরণার মতো এসে আমার কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ কর তুমি। তখন তোমার ভাবগতিক একেবারে অন্য রকম থাকে যে”

“বিষ্ণু আর মহেশ্বরের সঙ্গে আবার দেখা হল কবে”

“মনে মনে তাঁদের আহ্বান করলুম। তাঁরা আমার মানসলোকে এসে হাজির হলেন। ময়শাই ষাঁড়ে চেপে প্রথমে এল। আমার সব কথা শুনে বললে—বেশ আমার কিছুতেই আপত্তি নেই, বিষ্ণুকে ডেকে একটা পরামর্শ করুন। কিন্তু তার আগে খানিকটা দাঁড়াবার জায়গা দরকার যে। জলে ছপছপ করে' কাঁহাতক ঘুরে বেড়ানো যায়। আমাকে যে কাজ দেবেন তাতেই আমি রাজী আছি। একটি বেশ উঁচু দেখে পাহাড় করে' দিন আমাকে, আর আমি কিছু চাই না। এই বলে' মহেশ্বর তো অন্তর্দ্ধান করলেন। আমি তখন সেই বিরাট সমুদ্রের মাঝখানে তেকোণা একটি স্থলভাগ সৃষ্টি করলুম, আর তার একদিকে করলাম একটা পাহাড়। তোমার ভারতবর্ষ আর হিমালয় গো। সেই তেকোণা জায়গায় বিষ্ণু একদিন ঠেকলেন এসে ভাসতে ভাসতে। মহাদেবও এলেন। সেই ত্রিভুজাকৃতি স্থানের উপর দাঁড়িয়েই আমাদের তিনজনের চুক্তি—আমি হব সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু হবেন পালনকর্ত্তা এবং শিব হবেন সংহারকর্ত্তা। তবে বিষ্ণুর সঙ্গে আমার কথা রইল যে আমি যখন খুশী আমার সৃষ্টির হিসাব তার কাছে একদিন দাবী করতে পারব। বিষ্ণুও রাজি হল তাতে।

এইবার বিষ্ণুর কাছে হিসাবটা একদিন দাবী করব ভাবছি। আগে ভবিষ্যৎলোকটা সৃষ্টি ক'রে ফেলি, তারপর সেই ভবিষ্যৎলোকেই বিষ্ণুকে টেনে আনা যাবে একদিন"

বিশ্বকর্ম্মা এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন।

সরস্বতী মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যৎলোকে কিন্তু আর একটি জিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি"

'কি বল তো"

"দেবসেনা এবং দৈত্যসেনা বলে' আপনার দুটি মুখরা পত্নী জুটবে"

"তাতো জানিই। আসলে ও দু'টি স্বৈরচর। ওরা নানারকম হবে। অপ্সরী হয়ে দেবতাদের ভোলাবে, মাছ হয়ে সমুদ্রে নদীতে সাঁতরে বেড়াবে, খেঁকি কুকুর হয়ে পথে ঘাটে ঝগড়া করবে। শেষকালে কিছুদিনের জন্যে ওদের সখ হবে স্বয়ং ব্রহ্মার পত্নী হয়ে ব্রহ্মার উপর প্রভুত্ব করতে! তাই হবে"

"তারপর ওদের পরিণতি কি হবে"

"সে তো ঠিক করবে তুমি। চার্ব্বাকের কাছে যে ইচ্ছেটি প্রকাশ করেছ তাতো সাংঘাতিক। তাই যদি তোমার প্রাণের বাসনা হয় তাহলে তাও পূর্ণ করতে আমি ইতস্তত করব না। তোমার বা তোমার চার্ব্বাকদের ছুরির তলাতেই গলা বাড়িয়ে দেব"

ভ্রূযুগল উত্তোলিত করিয়া দেবী বীণাপাণি বলিলেন—"আমি চার্ব্বাকের কাছে কোনও ইচ্ছে তো প্রকাশ করি নি"

"বাঃ, তাকে বল নি যে পিতামহকে হত্যা না করলে সৃষ্টি রক্ষা পাবে না?"

"বলেছি। বলা প্রয়োজন মনে করেছি বলে' বলেছি। কিন্তু আপনি কি করে' মনে করলেন যে ওটা আমারই প্রাণের ইচ্ছে? যান আপনার কোন ব্যাপারে আর আমি থাকব না"

পিতামহের মুখমণ্ডল হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বীণাপাণির কটিদেশ বেষ্টন করত পুনরায় তাহাকে চুম্বন করিয়া তিনি বলিলেন—"একটু রাগলে তোমাকে ভারী সুন্দর দেখায় তাই একটু রাগিয়ে দিলুম। আমি কি তোমার মনের কথা জানি না? তোমারও কি আমাকে চিনতে বাকী আছে সখি? তোমার বীণার সুরই যে আমি, আর আমার বীণারও সুর যে তুমি। আমরা পরস্পরকে বাজাচ্ছি চিরকাল বাজাব। ভাবী যুগের চার্ব্বাকের ছবি কি রকম এঁকেছ একবার একটু দেখাও"

বীণাপাণি হাসিয়া ফেলিলেন।

বলিলেন—"মাঝে মাঝে একটু রাগের ভাণ না করলে আপনাকে কাছে পাওয়া যায় না। ভাবী যুগের চার্ব্বাকের ছবি আঁকবে ভাবী যুগের কবি। সেই কবির কাছেই নিয়ে যাব আপনাকে"

"কোথায় আছেন তিনি—"

"ভবিষ্যৎ লোকে। সেখানে তিনি যে গল্পটা লিখবেন সেইটেই আপনি দেখে আসবেন মাঝে মাঝে গিয়ে"

"বেশ"

"তুমি যে ভবিষ্যৎ লোকের কথা ভেবেছ কত দূরে সেটা"

"বেশী দূরে নয়"

"অর্থাৎ স্বৈরচরদের তখনও প্রাধান্য হয় নি?"

"না, কিন্তু অনেক কিছু হয়েছে"

"কি রকম"

"সে দেখবেন তখন"

পিতামহ হাস্যপ্রদীপ্ত দৃষ্টিতে বীণাপাণির মুখের দিকে নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার দেহ হইতে একটা স্বচ্ছ সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। সেই আলো দেখিতে দেখিতে

বীণাপাণির সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল পিতামহের অন্তরোৎসারিত প্রেম যেন সবুজ আলোর রূপ ধরিয়া বীণাপাণিকে আলিঙ্গন করিতেছে। ক্রমশঃ দেবী বীণাপাণিও যেন সম্মোহিত হইয়া চিত্রার্পিতবৎ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর পিতামহ বলিলেন—"সরো, একটা সত্যি কথা আমাকে বলবে ?"

"কি বলুন"

"তোমার কি বিশ্বাস সত্যি আমি আছি ?"

"হঠাৎ এ কথা মনে হওয়ার মানে ?"

"চার্ব্বাকদের যুক্তি-টুক্তি শুনে মাঝে মাঝে আমার নিজেরই সন্দেহ হয় যে আমি বোধ হয় নেই। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হয় যে ওই চার্ব্বাকদের বুদ্ধি যখন তুমিই জোগাচ্ছ, তখন তোমারও ধারণা বোধ হয় যে আমি নেই। আমরা পরস্পরকে বোধ হয় ঠকিয়ে চলেছি, আমরা কেউ বোধ হয় নেই—কিন্তু মনে করছি যে আছি"।

বীণাপাণির মুখমণ্ডল এক অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন—"ওই মনে করাটাই যে থাকা। অস্তিত্বের আর কি প্রমাণ আছে বলুন—"

"তবে ওরা যে বলছে—"

"ওরা বলছে না, ওদের আমরা বলাচ্ছি, ওদের যুক্তির নিকষে আত্মপ্রকাশ করছি আমরা"

পিতামহ পুনরায় আবেগভরে বীণাপাণিকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"তোমাকে ঠকাবার জো নেই। একটু আগে ঠিক এই কথাই আমি নিজে বিশুকে বলছিলাম। তোমার সঙ্গে আমার মতের মিল আছে দেখে খুশী হলাম। যাক আমরা আছি তাহলে! আচ্ছা

শ্রীমান চার্ব্বাককে মড়ার কাছে হাজির করেছ কেন বল দেখি ? অমন বিরাট দেহ মড়া পেলেই বা কোথা থেকে তুমি”

“আমি তো ওকে মড়ার কাছে নিয়ে যাই নি। ওর অবচেতন লোকের কৌতূহলই ওকে মড়ার কাছে নিয়ে গেছে। তার মনে হয়েছে মানুষই যখন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তখন সৃষ্টিকর্ত্তার কিছু খবর ওর মধ্যেই পাওয়া যাবে। এ খবর পাওয়া মাত্রই আমি ওদের অবচেতন লোকে শবদেহ শুইয়ে দিয়েছি একটা। কালকূটের অবচেতন লোকেও ঠিক ওই একই ঘটনা ঘটেছে কি না, সে-ও আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চে—”

“অতবড় মড়া তুমি পেলে কোথায়—”

বীণাপাণি হাসিয়া বলিলেন—“ওটি আমার প্রণয়ী দানব ক্ষিপ্রজজ্ঘ, আমার অনুরোধে মড়া সেজে শুয়ে আছে—”

“বল কি ! প্রণয়ী জোটালে কবে আবার”

বীণাপাণি মুচকি হাসিয়া বলিলেন—“রোজই জুটছে। অর্থাৎ আপনিই নানারূপে এসে জুটছেন আমার কাছে !”

“বাজে কথা। আমি দানব ক্ষিপ্রজজ্ঘ হতে যাব কোন দুঃখে”

বলিয়াই পিতামহ হাসিয়া ফেলিলেন এবং বীণাপাণির থুতনি ধরিয়া বলিলেন—“কত রঙ্গই যে জান ! আচ্ছা কালকূটের ব্যাপারটা কি বল তো। ও হঠাৎ ক্ষেপল কেন”

“ও প্রমাণ করতে চায় যে বর্ণমালিনী কারো চেয়ে খাটো নয়, অন্তত মেঘমালতীর চেয়ে নয়”

পিতামহ বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন—“মেঘমালতী আবার কে”

“কিছুদিন আগে আপনিই তো মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে ওই অপ্সরীটিকে সৃষ্টি করেছেন !”

পিতামহ অধিকতর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, মনে

পড়েছে বটে। কিন্তু সৃষ্টি করবামাত্রই তো ইন্দির তাকে শচী দেবীর সখি করে' নিয়েছে, মানে গ্রাস করে' বসে আছে ; সে পাতালে গেল কি করে"

"আপনারই চক্রান্তে"

"আমার ?"

"ভ্রমর সেজে আপনি যান নি তার কাছে ?"

পিতামহের মুখমণ্ডল পুনরায় হাস্যোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"তুমি কি করে' টের পেলে বল দিকি ?"

"কি মুশকিল, সেই ভ্রমরের কণ্ঠে যে গান ছিল তাতে আমিই তো সুর দিয়েছি। একটা কথা কিন্তু বুঝিনি মেঘমালতীকে পাতালে পাঠালেন কেন। আপনার মনের ভাবকে আমি সুরে গেঁথে তাকে জানালাম বটে যে ওগো মেঘমালতী পাতালপুরীতে প্রবালশাখায় সোনার চাঁপা ফুটে আছে তোমারি অপেক্ষায়, তুমি যাও সেখানে, তাকে তুলে এনে তোমার কবরী অলঙ্কৃত কর—কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না কেন তাকে পাতালে যেতে বলছেন—"

"কালকূটকে তাতাবার জন্যে—"

"তাতে লাভ"

"কাব্য জমবে। মেঘমালতী শুদ্ধ ভাষায় কিন্তু বেশ ধাতানি দিয়েছিল ছোঁড়াকে। মনে আছে তোমার কথাগু—"

"আছে বই কি। কথাগুলো যে আমারই তৈরী। মেঘমালতী বলেছিল—'আমি সেই শচীদেবীর সহচরী যিনি ইন্দ্রাণী, যিনি অনন্যা, আমি স্বর্গের অপ্সরী, আমি দেবভোগ্যা। তোমার স্পর্শ পর্য্যন্ত আমি সহ্য করতে পারব না। নাগকন্যা বর্ণমালিনীকে নিয়েই তুমি সন্তুষ্ট থাক'। আপনার মনের ভাবকেই আমি ভাষা দিয়েছিলাম, কিন্তু বুঝতে পারিনি কেন আপনার মনে এ ভাব জাগছে"

"সত্যি পারনি ?"

"না"

"আমি প্রত্যেকের হৃদয়ে ধাক্কা মেরে বেড়াচ্ছি কোথাও সাড়া মেলে কি না। অধিকাংশই নিঃসাড়। কালকূট, চার্ব্বাক দুজনেই কিন্তু সাড়া দিয়েছে, এইবার ওরা কি করে' দেখা যাক। তুমি বলছ চার্ব্বাক আর কালকূট দুজনের অবচেতনলোকেই কামনা-মায়ানদী আছে, শবদেহও আছে ?"

"আহা, নিজে যেন কিছু জানেন না"

"তোমার মুখ থেকে শুনলে বেশ নতুন নতুন ঠেকে। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ তো এখন মড়া সেজে শুয়ে আছে, তারপর ওরা যখন গিয়ে খোঁচা-খুঁচি শুরু করবে তখন ও কি করবে"

"দেখতেই পাবেন"

"দানবটিকে পাকড়ালে কোথায়"

"আপনারই খেলা-ঘরে, আপনারই প্রেরণায় সৃষ্টি করেছি ওই স্বৈরচরকে। প্রথমে ছিল ও একটি মশা, আমার কানের কাছে এসে গুনগুন করত আর মনে মনে ভাবত—আহা আমি যদি দৈত্য হতাম একে বাহুপাশে বাঁধতে পারতাম। আপনারই মন্ত্রে দিলাম ওকে দৈত্য করে এবং নিজে হয়ে গেলাম মশা। ও তখন আমাকে ধরবার জন্যে ছুটোছুটি করতে লাগল, আর আমি ওকে এড়িয়ে এড়িয়ে উড়ে বেড়াতে লাগলাম। এই সময়ে আপনি আমাকে স্মরণ করলেন চার্ব্বাক আর কালকূটের জন্য। ওদের অবচেতনলোকে আমি গিয়ে আবিষ্কার করলাম শবদেহ। তখন মশকরূপে ক্ষিপ্রজঙ্ঘের কানে কানে বললাম—তুমি ওদের অবচেতনলোকে গিয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাক, তাহলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে"

"ও বাবা, এতকাণ্ড করেছ তুমি, কিচ্ছু তো জানি না"

পিতামহ বেশীক্ষণ কিন্তু ভাণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, হাসিয়া বলিলেন—"আমিই যে মশা সেজে তোমার কানের কাছে গুনগুন করছিলাম তা তুমি টের পেয়েছিলে ?"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া বীণাপাণি সহাস্যে উত্তর দিলেন—"না, তা কি আর পেয়েছিলাম !"

"নিজে পট করে' মশা হয়ে গিয়ে কিন্তু ভারী মুশকিলে ফেলেছিলে আমাকে। তোমাকে এঁটে ওঠা শক্ত"

সহসা এক সুমিষ্ট মাদকগন্ধে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পিতামহ বলিলেন—"ডাক এসেছে। এবার যেতে হবে"

"কার ডাক"

"পারিজাতের। নন্দনকাননে কাল এক পারিজাত কুঁড়িকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলাম যে তুমি ফুটলেই আমি আসব। আমাকে খবর দিও। খবর এসে গেছে, দুজনেই যাই চল"

"পারিজাতকুঞ্জে কখন গিয়েছিলেন ?"

"গভীর রাত্রে, শিশিরের রূপ ধরে'। তুমি তখন তারায় তারায় আলোর গান গাইছিলে। চল, যাই"

"চলুন। চার্ব্বাক আর কালকূট কিন্তু শবের কাছাকাছি এসে পড়েছে"

"আসুক না, আমাদের আর কতক্ষণ লাগবে। প্রজাপতির রূপ ধরে যাই চল"

"চলুন".

দুইটি রঙীন প্রজাপতি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

চার্ব্বাক এবং কালকূট উভয়েই বিরাট শবদেহটিকে নীরবে প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বিস্ময়ে কাহারও মুখ দিয়া একটি কথা সরিতেছিল না। কিছুক্ষণ পরে কালকূট চার্ব্বাকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আমার মনে হচ্ছে এমনভাবে পরিক্রমা করলে কোনও লাভ হবে না। এর মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। শবদেহের বহিরঙ্গে তো ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ দেখতে পাচ্ছি না। আপনি পাচ্ছেন কি?"

"না, আমিও পাচ্ছি না। আমার এ-ও মনে হচ্ছে যে শবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করেও যদি আমরা অনুসন্ধান করি তাহলেও ব্রহ্মার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাব না। আমার কৌতূহল আমাকে ভুল পথে চালিত করেছে। ব্রহ্মা কোথাও যদি থাকেন জীবন্ত পরিবেশের মধ্যেই থাকবেন, মৃতদেহের মধ্যে তাঁকে সম্ভবত পাওয়া যাবে না। যা মৃত তার মধ্যে কেবল মৃত্যুই থাকা সম্ভব, জীবনের সন্ধান তার মধ্যে মিলবে কি?"

"মৃত্যুর মধ্যেই কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা একদিন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। পরীক্ষিতের সর্পবজ্ররূপ মৃত্যু যখন তাঁদের কবলিত করেছিল, তখন সেই মৃত্যুর মধ্যেই তাঁরা বাঁচবার মন্ত্রলাভ করেছিলেন। সুতরাং এ মৃতদেহ মৃত বলেই তাকে তুচ্ছ করতে পারি না। হয় তো সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এর মধ্যেই আত্মগোপন করে' আছেন। এ শবদেহকে ছিন্নভিন্ন করেই দেখতে হবে"

"বেশ দেখুন। কিন্তু ছিন্নভিন্ন করবেন কি করে'? আপনার কাছে কি কোনও অস্ত্র আছে?"

"আছে"

কালকূট কটিদেশ হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিলেন।

চার্ব্বাক বলিলেন—"আচ্ছা, আপনি কার প্ররোচনায় এই শবদেহ লক্ষ্য করে' এসেছেন? আমি তো এসেছিলাম আমার কৌতূহলের নির্দ্দেশে। আপনি?"

"আমার নির্দ্দেশ আমার অন্তরের মধ্যেই ছিল। বাল্যকালে আমি একবার সর্পদেহ ধারণ করে' পৃথিবী পরিভ্রমণ করছিলাম। সেই সময় একদিন এক চণ্ডাল আমার পিঠে পা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে দংশন করি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হয়। চণ্ডালের যে মৃত্যু হবে তা আমি প্রত্যাশা করিনি? সুতরাং আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। অভিভূত হয়ে পাশের এক ঝোপে বসে' লক্ষ্য করতে লাগলাম চণ্ডালের গতি কি হয়। কিছুক্ষণ পরে চণ্ডাল-পত্নী হাহাকার করতে করতে এসে হাজির হল, চণ্ডালের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরাও এল। চণ্ডালকে তুলে নিয়ে গেল তারা। আমিও কৌতূহলবশত তাদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা চণ্ডালকে নিয়ে গিয়ে এক নদীতে নিক্ষেপ করলে। শুনলাম, সর্পাহত ব্যক্তিকে না কি দগ্ধ করতে নেই। সে না কি সম্পূর্ণ মরে না, হয় তো আবার বেঁচেও উঠতে পারে এই জন্য তাকে দগ্ধ করা নিয়ম নয়। চণ্ডালকে নদীতে নিক্ষেপ করে' সবাই চলে গেল—আমি কিন্তু যেতে পারলাম না, নদীতীরের এক ঝোপের মধ্যে বসে' আমি সেই ভাসমান শবের দিকে চেয়ে রইলাম। গ্রন্থকার যেভাবে তার প্রথম গ্রন্থের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে আমিও তেমনি মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইলাম আমার প্রথম কীর্ত্তির দিকে। নদীতীরেই যে শ্মশান ছিল তা আমি জানতাম না। কিছুক্ষণ পরেই লেলিহান অগ্নিশিখায় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। জ্বলন্ত চিতা পূর্ব্বে আর

কখনও দেখিনি। ভীত হয়ে আরও দূরে সরে' গেলাম। কিছুক্ষণ পরে চিতার আগুন নিবে গেল। শ্মশান কিন্তু অন্ধকার হল না। দেখলাম মশাল হস্তে এক দীর্ঘকাল বলিষ্ঠ ব্যক্তি চতুর্দ্দিকে কি যেন অন্বেষণ করে' বেড়াচ্ছে। তার প্রদীপ্ত চক্ষু, বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র, কপালে সিন্দূর তিলক, এক হস্তে মশাল, আর এক হস্তে ত্রিশূল। আমি আরও ভীত হয়ে আরও দূরে সরে' গেলাম। আমার কৌতূহল কিন্তু নিবৃত্ত হল না। একটি বৃক্ষে আরোহণ করে' আমি সেই মশালধারী ব্যক্তির গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে যা দেখলাম তা' সত্যিই অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই দীর্ঘাকৃতি মনুষ্যমূর্ত্তি নদী থেকে সেই চণ্ডালের শবকে টেনে তুলছে, টেনে তুলে কাঁধে করে' নিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছে। শ্মশানের মধ্যস্থলে বিরাট একটি বটবৃক্ষ ছিল, সবিস্ময়ে দেখলাম কাপালিক শবদেহকে নিয়ে সেই বটবৃক্ষের তলদেশে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি আর থাকতে পারলাম না, গাছ থেকে নেমে পড়লাম। বটবৃক্ষের সমীপস্থ হয়ে যা দেখলাম তা আরও অপ্রত্যাশিত। দেখলাম সেই ভীমদর্শন কাপালিক চণ্ডাল-শবের উপর ধ্যানস্থ হয়ে বসে' আছেন। শবের মাথার দিকে মশাল জ্বলছে, আর পায়ের দিকে পোঁতা আছে সেই ত্রিশূলটা। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বটবৃক্ষের অন্ধকারাচ্ছন্ন শাখাপল্লবকে প্রকম্পিত করে' মধ্যে মধ্যে একটা কর্কশকণ্ঠ পেচক চীৎকার করছে শুধু। আর কোনও শব্দ নেই। আমিও মন্ত্রমুগ্ধবৎ সেই বটবৃক্ষের অন্ধকারে প্রবেশ করলাম এবং অন্ধকারে আত্মগোপন করে' বসে রইলাম। কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না, সহসা কলহাস্যে সচকিত হয়ে দেখলাম চণ্ডালের শবদেহ থেকে অসংখ্য রূপসী নির্গত হচ্ছে, পচা মাংস-পিণ্ড থেকে যেমন কীট নির্গত হয়, তেমনি সেই শবদেহ থেকে

রূপসী নির্গত হচ্ছে। দেখতে দেখতে রূপসীর হাট বসে গেল সেই কাপালিককে ঘিরে। তারা কেউ হাসছে, কেউ গান গাইছে, কেউ নৃত্য করছে, কেউ নানা দেহভঙ্গী করে' কাপালিকের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে। সে রকম রূপসী আমি জীবনে কখনও দেখিনি, বিভিন্ন বর্ণের আলোক-শিখা যেন কোন মায়ামন্ত্রবলে মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছিল সেদিন। আমি স্বচক্ষে দেখলাম তারা সেই শবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বহির্গত হচ্ছে আবার সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মনে হোল ওই শবদেহ যেন অনন্ত রূপের আকর, অনন্ত সম্ভাবনার লীলাক্ষেত্র। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে' সেই রূপসীরা যখন কাপালিকের তপোভঙ্গ করতে পারলে না, তখন মরীচিকাবৎ তারা অন্তর্দ্ধান করলে সহসা। যে অন্ধকার তাদের কলহাস্যে ছন্দিত হচ্ছিল সে অন্ধকার হঠাৎ আবার নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকও নিঃশব্দ হয়ে রইল কিছুক্ষণের জন্য। আমিও অভিভূত হয়ে বসে' রইলাম। আমার মনে হতে লাগল যে আমার বিষই হয় তো ওই চণ্ডালকে অনন্ত সম্ভাবনাময় করে' তুলেছে। অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদে আমার চিত্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।...

সেই কর্কশকণ্ঠ পেচকটা চীৎকার করে' উঠল আবার। তারপর দেখতে পেলাম একটা রক্তাভ আলোয় অন্ধকার প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে, আর সে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই শবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। তার নির্নিমেষ চক্ষু দুটি যেন জলন্ত অঙ্গার-খণ্ডের মতো জ্বলছে। ক্রমশঃ দেখলাম তার দেহ থেকে দেহহীন মুণ্ড, মুণ্ডহীন কবন্ধ, বিকটদশনা প্রেতিনী, সিংহবদন কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, একচক্ষু পিশাচ, বহুবাহু দানব প্রভৃতি ভয়াবহ প্রাণী সকল নির্গত হতে লাগল। তাদের অট্টহাস্যে, অসংযত নৃত্যে, উদ্দাম কলরবে অন্ধকার শিউরে উঠতে লাগল বারম্বার। কর্কশকণ্ঠ পেচকটা উন্মাদের মতো চীৎকার

করতে লাগল তাদের ছন্দ-তাল-হীন অনৈক্য তানের সঙ্গে সঙ্গে। কাপালিক কিন্তু নির্ব্বিকার। ধীর স্থির ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলেন তিনি। মনে হল তিনি যেন অন্ধ এবং বধির, কিম্বা যেন একটা শবাসীন শব। এই ভীষণ দৃশ্যও অবলুপ্ত হয়ে গেল খানিকক্ষণ পরে। আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল, পেচকটা নীরব হয়ে গেল। আমি বসে রইলাম চুপ করে। নূতন ঘটনা ঘটল আবার একটু পরে। প্রচণ্ড একটা গর্জ্জন হল, আবার রক্তাভ আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল অন্ধকার। দেখলাম বিরাট একটা সিংহ কাপালিকের দিকে চেয়ে আছে! ক্রমশঃ সেই সিংহের চতুর্দ্দিকে জুটল—ব্যাঘ্র, বক, শিবা, সারমেয়, তরক্ষুর দল। সবাই চীৎকার করতে লাগল। সেই চণ্ডালের শবদেহ থেকে আরও যে কত প্রাণী বার হতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। লক্ষ লক্ষ কীট, ভীষণদর্শন পতঙ্গ, রোমশ গুটিপোকা, আরও কত কি কীট পতঙ্গের দল কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে' বেড়াতে লাগল, আর শ্বাপদকুল চীৎকার করতে লাগল তাঁর চতুর্দ্দিকে। কাপালিক কিন্তু বিচলিত হলেন না একটুও। নিস্পন্দ নীরব হয়ে বসে রইলেন। আবার সব মিলিয়ে গেল, আবার অন্ধকার ঘনিয়ে এল চারিদিকে। আমি আচ্ছন্নের মতো সেই বটবৃক্ষের একটি কোটরে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছিলাম। মনে হল কে যেন আমার কানে কানে বলতে লাগল —এইবার তুমি যাও, ওই কাপালিকের সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে ধর, ওকে বিচলিত কর, তা না হলে দ্বার খুলে দিতে হবে ওকে, যে দ্বার আমি প্রাণপণে বন্ধ করে' রেখেছি, যে দ্বার আমি কিছুতে খুলব না, সেই দ্বারে ও করাঘাত করছে, ওকে অন্যমনস্ক করতে না পারলে দ্বার খুলে দিতেই হবে। তুমি ওকে অন্যমনস্ক করবার চেষ্টা কর, ওকে বেষ্টন কর, ওর মুখের কাছে ফণা বিস্তার করে' তর্জ্জন কর। প্রশ্ন করলাম—কে তুমি। উত্তর পেলাম—আমি

প্রকৃতি। মানুষ আমার রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনচ ক'রে দিতে চায়। সহজে আমি সেখানে ঢুকতে দিই না কাউকে। কিন্তু একাগ্রচিত্তে কেউ যদি ক্রমাগত আমার দ্বারে আঘাত করে তাহলে আমাকে দ্বার খুলতেই হয়, নিরুপায় হয়ে খুলতে হয়। একমাত্র উপায় হচ্ছে ওদের অন্যমনস্ক করে' দেওয়া। এই লোকটা যে মুহূর্তে ঘোর অমাবস্যা রাত্রে শ্মশানে এসে চণ্ডালের শবদেহের উপর সমাসীন হয়ে ধ্যানমগ্ন হতে পেরেছে, সেই মুহূর্তেই ও অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। সেই মুহূর্ত থেকে ওর করাঘাতে আমার রুদ্ধদ্বার ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হচ্ছে। তোমারই কীর্তি ওই শবদেহ। ওই শবদেহ না পেলে এ শক্তির পরিচয় ও দিতে পারত না; তুমিই আমাকে এই বিপদে ফেলেছ, তুমিই এখন আমাকে উদ্ধার কর। 'আমি বললাম—বলেন তো ওকেও গিয়ে দংশন করি। দংশন করবামাত্র ওর মৃত্যু হবে, আপনিও নিরাপদ হবেন। প্রকৃতি আকুলকণ্ঠে বলে' উঠলেন—না, না, ওর মৃত্যু আমি চাই না, ওকে অন্যমনস্ক করতে চাই। ওকে এরকম হীনভাবে হত্যা করে' ফেলা আমার লক্ষ্য নয়, আমি ওকে বাজিয়ে দেখতে চাই ওর দৌড়টা কতদূর, তুমি ওকে দংশন কোরো না, কেবল ভয় দেখাও। গভীর অন্ধকারে আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম তিনি কে, কোথায় আছেন, তাঁর আকৃতি কি রকম—কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যে তিনি যদিও ওই কাপালিককে বিচলিত করবার বহুবিধ আয়োজন করছেন কিন্তু মনে মনে যেন উনি কাপালিককে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন, কাপালিক ওঁর রহস্যলোকে ঢুকে সব তছনচ করুক এতে যেন ওঁর আপত্তি নেই, উনি যেন কেবল সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন কাপালিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন কিনা

এবং কতক্ষণে হবেন। আমি কোটর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তারপর প্রকৃতির নির্দ্দেশ অনুসারে কাপালিকের দেহে সঞ্চরণ করে' বেড়ালাম কিছুক্ষণ। মনে হল যেন প্রস্তরের উপর সঞ্চরণ করে' বেড়াচ্ছি। কিন্তু একটু তফাত ছিল। প্রস্তর সাধারণত শীতল থাকে, কিন্তু কাপালিকের প্রস্তরবৎ দেহ ছিল উত্তপ্ত। আমি খানিকক্ষণ তাঁকে বেষ্টন করে' বার কয়েক তর্জ্জন করলাম। কিন্তু কোনই ফল হল না। কাপালিক নির্ব্বিকার হয়ে বসে রইলেন। আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না, কাপালিকের উত্তপ্ত দেহ ক্রমশঃ এত উত্তপ্ত হয়ে উঠল যে আমাকে নেবে পড়তে হল! তারপর আবার ঘনিয়ে এল নিবিড় অন্ধকার। আমি আবার ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলাম আমার কোটরের মধ্যে। কতক্ষণ যে বসেছিলাম তা জানি না, হঠাৎ একটা তীব্র আলোকে সচকিত হয়ে দেখলাম যে সেই শবের মুণ্ডটা জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠেছে। তার মস্তকের প্রত্যেক লোমকূপ থেকে যেন আলোর ফোয়ারা উঠছে। তারপর সবিস্ময়ে দেখলাম সে যেন হাসছে, তার চোখ দুটো যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ঠোঁট দুটো যেন নড়ছে। মনে হল কাপালিককে সম্বোধন করে কি যেন বলছে সে। কি বলছে তা শুনতে পেলাম না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখলাম এক বিরাট পেচকে আরোহণ করে' এক অপরূপ রূপসী আবির্ভূত হলেন। তিনি কাপালিককে সম্বোধন করে' যা বললেন তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম আমি। তিনি বললেন—তপস্বী, তোমার তপস্যায় আমি সন্তুষ্ট হয়েছি, এইবার বর গ্রহণ কর, কঠোর তপস্যা থেকে নিরত হও। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনরত্ন এখনই তোমার কাছে এসে স্তূপীকৃত হবে. তোমার তপস্যার পুরস্কার স্বরূপ তুমি সেগুলি গ্রহণ কর। আর তপস্যা কোরো না। আমি লক্ষ্মী, আমি তোমাকে বরদান করছি,

আর তোমার তপস্যা করবার প্রয়োজন নেই। এই বলে' লক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান করলেন। শবমুণ্ডের জ্যোতিও অন্তর্হিত হল। কিন্তু পরক্ষণেই আর এক রকমের অদ্ভুত আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক। সেই আলোকে দেখলাম কাপালিকের চতুর্দ্দিক মণি-মাণিক্য হীরা-মুক্তা স্বর্ণ-রৌপ্য স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে, আর প্রত্যেক স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক একটি রূপসী। তারাও যেন প্রত্যেকেই এক একটি রত্ন। তারা প্রত্যেকেই কাপালিককে অনুনয় করতে লাগল, হে তপস্বি, এবার তুমি তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হও, আমাদের গ্রহণ কর। কাপালিক কিন্তু নির্ব্বিকার, অচঞ্চল। মনে হল এসব কিছুই যেন তাঁকে স্পর্শ করছে না। অনেকক্ষণ অনুনয়-বিনয় করে, রূপসীরা যখন দেখলেন যে কোন ফল হচ্চে না, তখন তাঁরা একে একে অন্তর্দ্ধান করলেন ওই শবদেহের মধ্যে। ওই সব মণি-মুক্তা হীরা-মাণিক্য স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপও বিলীন হয়ে গেল ওই শবদেহেই। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। সেই দিন থেকেই আমি জানি যে শব মৃত নয়, তা অনন্ত সম্ভাবনার আকর!"

চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল—"আপনার কাহিনী খুবই মনোজ্ঞ। শব এবং কাপালিকের পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত কি হল?"

"শেষ পর্য্যন্ত কি হল, তা আমি দেখতে পারি নি। কারণ একটু পরেই দেখলাম গরুড়ে চড়ে' স্বয়ং বিষ্ণু এসে হাজির হলেন। গরুড় আমাদের চিরশত্রু, তাই আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। অন্ধকারে আত্মগোপন করে' সে স্থান ত্যাগ করতে হল আমাকে। কিন্তু সেই দিনই আমি বুঝেছিলাম যে মৃতদেহ অনন্ত সম্ভাবনাময়। এই শবটি খুবই অসাধারণ মনে হচ্ছে, আসুন আমরা দেখি এর মধ্যে কি আছে। আমি যদি কাপালিকের মতো তপস্বী হতাম তাহলে

শবারূঢ় হয়ে তপস্যা করতাম এবং খুব সম্ভবত আমার তপস্যা প্রভাবে পিতামহকে টেনেও আনতে পারতাম। কিন্তু সে শক্তি আমার নেই, আমি বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমি শবকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেখতে চাই পিতামহের কোনও সন্ধান এতে পাওয়া যায় কিনা”

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ স্মিতমুখে কালকূটের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—“আমার মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। যদি অনুমতি দেন সেটি ব্যক্ত করি”

“অবশ্য ব্যক্ত করুন। এর জন্য অনুমতির প্রয়োজন কি”

“প্রয়োজন এই জন্য যে প্রশ্নটি হয়তো আপনার কোনও গোপন অহঙ্কার বা বেদনাকে ক্ষুব্ধ করে' তুলতে পারে। আমিও বস্তুতান্ত্রিক লোক, আমিও একটা বিশেষ কারণে পিতামহ ব্রহ্মার সন্ধানে বেরিয়েছি এবং সর্ব্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ব্যাপার হচ্ছে যে উক্ত কারণটি আমার কাছেই স্পষ্ট ছিল না এতক্ষণ, এখনই একটু আগে স্পষ্ট হয়েছে তা। সেই জন্যে মনে হচ্চে যে আপনিও হয়তো অনুরূপ কোনও কারণবশত এই দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন—”

“আপনার কি মনে হয়েছে বলুন”

“আচ্ছা, আপনার এই অভিযান কি কোনও নারীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট?”

কালকূটের মুখমণ্ডলে বিস্ময় পরিস্ফুট হইল।

“এ কথা আপনার কেন মনে হচ্চে বলুন তো”

“মনে হচ্চে, কারণ আমি নিজে একটি নারী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ ব্যাপারে অগ্রসর হয়েছি”

“তাই না কি! যদি আপত্তি না থাকে আপনার কাহিনীটি আর একটু বিশদ করুন”

“আসুন, তাহলে উপবেশন করা যাক”

বিরাটকায় ক্ষিপ্রজজ্ঞের শবদেহের পার্শ্বে তাঁহারা উপবিষ্ট হইলেন। চার্ব্বাক বলিল—"সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্ত্তকীর রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হয়ে আমি কিছুকাল থেকে তার হৃদয় জয় করবার প্রয়াস পাচ্ছিলাম। হৃদয় জয় কথাটি কবিদের অনুকরণে আমি ব্যবহার করলাম বটে, কিন্তু আমার ধারণা 'হৃদয়-জয়' না বলে' 'হৃদয়-ক্রয়' বা 'হৃদয়-অর্জ্জন' বললে ব্যাপারটি আরও সত্যভাবে ব্যক্ত হয়। কারণ উপযুক্ত মূল্য না দিলে কোন পুরুষ বা রমণীর হৃদয় অধিকার করা যায় না। সাধারণত অর্থমূল্যেই নর বা নারীর হৃদয় বিক্রীত বা বিজিত হয়ে থাকে, কিন্তু সুরঙ্গমার ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলাম; সুরঙ্গমা রাজ-নর্ত্তকী, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা রক্ষিতা, অর্থের তার কোনও অভাব নেই। কুমার সুন্দরানন্দ তাকে বসনে-ভূষণে মণি-মাণিক্যে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছেন যে ও সবে তার আর রুচি নেই। রুচি থাকলেও কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে পাল্লা দিতে আমি পারতাম না। সুতরাং আমি যে মূল্য দিয়ে তার হৃদয় ক্রয় করবার প্রয়াস পেতে লাগলাম তা যদিও উজ্জ্বল বসন-ভূষণ মণি-মাণিক্যের চেয়ে অধিকতর মহার্ঘ, কিন্তু তা বসন-ভূষণ মণি-মাণিক্যের মতো স্থূল বস্তু নয়, তা সূক্ষ্ম চিন্তার বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধির প্রাখর্য্যে দ্যুতিমান। অর্থাৎ আমি আবেদন জানিয়েছিলাম তার বুদ্ধির কাছে। তাকে বলেছিলাম—'সুন্দরানন্দ ভালবাসছে তোমার দেহটাকে তোমাকে নয়, তোমার বুদ্ধি-দীপ্ত প্রতিভা সম্বন্ধে সে উদাসীন, তাই তোমাকে সে যে সব উপহার দিয়েছে তা দেহ-সজ্জারই উপকরণ, তোমার প্রদীপ্ত বুদ্ধিকে প্রদীপ্ততর করতে পারে এমন কিছুই সে দেয় নি। আমি তোমাকে তাই দিতে চাই। তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবন সম্বন্ধে আমি কম সচেতন নই, কিন্তু তোমার নবোদ্ভিন্ন যৌবনই যে তুমি নও তা-ও আমি জানি। আমি এ-ও জানি যে তোমার যৌবন চিরস্থায়ী নয়, ওর

গতি অধোমুখী, কিন্তু তোমার বুদ্ধি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হবে যদি সম্যক উপায়ে তাকে লালন কর। তোমার যৌবন যখন থাকবে না তখন তোমার ওই উজ্জ্বল বুদ্ধিই শ্রীমণ্ডিত করবে তোমার দেহকে নবরূপে, তখন যে আভরণে সে মহিমান্বিত হবে তা কোনও স্বর্ণকারের বিপণিজাত অলঙ্কার নয়, কোনও সুন্দরানন্দের মূল্যের অপেক্ষায় তা পরহস্তগত হয়ে থাকবে না, তা তোমার অন্তরোৎসারিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রভা, তা কোনও দিন মলিন হবে না। আমি তোমার সেই অন্তরতম সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই, তারই কাছে আনতে চাই আমার অর্ঘ্যভার। আমি চাই আমার দর্শনে তুমি যেমন অপরূপ হয়েছ, তোমার দর্শনেও আমি যেন তোমার কাছে তেমনি অপরূপ হয়ে উঠি। শুধু আমি কেন, তোমার মানবী প্রকৃতি প্রত্যেক সমর্থ মানবকেই নূতন মহিমায় প্রত্যক্ষ করুক, নির্ব্বাচন করুক, আহ্বান করুক। সুন্দরা-নন্দের কারাগারে তুমি বন্দিনী হয়ে থাকবে কেন?' আমার বা এই বক্তৃতায় সুরঙ্গমার নয়নে বিদ্যুৎবহ্নি বিচ্ছুরিত হল। গ্রীবাভঙ্গী করে' সে বললে—'মহর্ষি চার্ব্বাক, প্রথমেই আপনার একটা ভ্রম অপনোদন করে' দিতে চাই। সুন্দরানন্দের ঐশ্বর্য্য দেখে আমি মুগ্ধ হই নি, আমি মুগ্ধ হয়েছি তার শৌর্য্যে। ভল্লের এক আঘাতে তাকে বিশাল ব্যাঘ্রের বক্ষ বিদীর্ণ করতে দেখেছি, তার সুনিক্ষিপ্ত খড়্গে ভীষণ খড়্গীকে নিপতিত হতে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি তার উদারতা, নারীর প্রতি তার সৌজন্য। সে শক্তিমান সভ্য পুরুষ, ধনবান পশুমাত্র নয়।' তার এ কথা শুনে তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম—'আমার ভ্রম অপনোদিত হল। শুধু তাই নয় আমি শুনে আনন্দিত হলাম যে কুমার সুন্দরানন্দের যে শক্তি তোমাকে আকৃষ্ট করেছে তা কেবলমাত্র দৈহিক শক্তি নয়, তা মানসিক উৎকর্ষ।

কিন্তু সুন্দরানন্দ কি তোমার মানসিক উৎকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন? তোমার লীলায়িত নৃত্যছন্দের নেপথ্যে যে শিল্পী নব নব সৃষ্টি-স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে আত্মহারা হচ্ছে তাকে কি সুন্দরানন্দ পূজা করে? না, সে তোমার দেহটা নিয়েই বিভোর কেবল? হয়তো সে শিল্পী-সুরঙ্গমার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সুরঙ্গমার মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তা কি সে জানে? সে সব সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করবার চেষ্টা করেছে সে কি কখনও? সে নর্ত্তকী সুরঙ্গমার দেহ-ছন্দকে উপভোগ করতেই অভ্যস্ত, তার মধ্যে দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিককে দেখতে সে কি প্রস্তুত আছে? আমি তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, প্রথমে অবশ্য তোমার দেহ দেখেই। কিন্তু আমি তোমার সমগ্রতাকেও সম্পূর্ণভাবে দেখতে চাই, জাগিয়ে দিতে চাই সেই সুরঙ্গমাকে যাকে কেউ কখনও দেখে নি'। আমার কথা শুনে সুরঙ্গমা বক্রদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে লীলাভরে হেসে বললে—'আমি কিন্তু জাগতে চাই না মহর্ষি। কুমার সুন্দরানন্দের নিকট যখন আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম তখন আমাকে তাঁর কুলদেবতা চতুরাননের সম্মুখে শপথ করতে হয়েছিল যে সুন্দরানন্দ ছাড়া আর কোনও পুরুষের দিকে আমি চাইব না। সে শপথ যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে আর জেগে লাভ কি বলুন'। সুরঙ্গমার মুখে যদিও এই ভাষা ফুটল কিন্তু তার অপাঙ্গদৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটল তা অন্যরকম। আমি বললাম—'দেখ সুরঙ্গমা, সুন্দরানন্দের পূর্ব্বপুরুষরা প্রস্তরনির্ম্মিত চতুরানন মূর্ত্তির মধ্যে নিজেদের অন্ধ কুসংস্কারকেই মূর্ত্ত করে' রেখে গেছেন। তার সম্মুখে যদি কোনও শপথ করেই থাক—তাহলে সে শপথ রক্ষা করবার যে বিশেষ একটা যুক্তিযুক্ত দায়িত্ব আছে তোমার তা আমি মনে করি না। প্রস্তরনির্মিত চতুরাননের সম্মুখে শপথ করার কি বিশেষ মূল্য থাকতে পারে? তবে শপথটাকেই যদি তুমি মূল্যবান মনে করে' তার মর্য্যাদা দিতে

চাও সে স্বতন্ত্র কথা। চতুরানন, পঞ্চানন বা ষড়াননের সঙ্গে শপথকে জড়িত করছ কেন। তোমার শপথ তোমারই শপথ, তা রক্ষা করা না করা তোমারই ইচ্ছা। তুমি স্বাধীন মানুষ একথা তো কোন সময়ই ভুলে যাওয়া উচিত নয় সুরঙ্গমা'। সুরঙ্গমা বললে —'আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, আমি কিন্তু করি। আমি বিশ্বাস করি তিনি সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁর সম্মুখে যে শপথ আমি করেছি তা ভঙ্গ করলে অপরাধ হবে আমার এবং সে অপরাধের জন্য আমাকে শাস্তিভোগও করতে হবে, ইহজন্মে বা পরজন্মে'। আমি বললাম—'তুমি যদি সাধারণ কোনও নারী হ'তে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে ভাসতে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে তা মনে হচ্ছে নারী সুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন-বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই ; কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যিসত্যি বিশ্বাস কর এই ধারণাটা। সুতরাং ও ধারণাকে আমি প্রশ্রয় দিতে চাই না।' সুরঙ্গমা সুমধুর হেসে বললে—'আমি কিন্তু সত্যই চতুরাননের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আপনি কি প্রমাণ করে' দিতে পারেন যে চতুরানন নেই ?' আমাকে তখন বলতে হল, 'নিশ্চয় পারি। কিন্তু সে প্রমাণ যদি তুমি সংগ্রহ করতে চাও তাহলে আমার কুটিরে তোমাকে আসতে হবে। তা কি তুমি পারবে ? সুন্দরানন্দের বিলাসকক্ষের বাইরে যাবার স্বাধীনতা কি তোমার আছে ? যদি থাকে এস, আমি তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করবার চেষ্টা করব।' তারপর থেকে সুরঙ্গমা প্রায়ই আমার কাছে আসত, তার সঙ্গে অনেক শাস্ত্র অনেক বিজ্ঞান আলোচনা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে আমি বিশ্বাস করাতে

পারিনি যে চতুরানন নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের সঙ্গে মৃগয়া-অভিযানে চলে গেল মধ্যপ্রদেশের এক অরণ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আমিও প্রবেশ করলাম চিন্তার অরণ্যে। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম যে ব্রহ্মার অনস্তিত্ব আমি প্রমাণ করবই। তারপর থেকে কিন্তু যা যা ঘটেছে তা অভূতপূর্ব্ব।'

কালকূট বলিলেন—"সুরঙ্গমা আপনার কুটীরে বারম্বার আসত তবু আপনি তার হৃদয় হরণ করতে পারলেন না?"

"হৃত বস্তুকে বেশী দিন আয়ত্ত অধিকার করে' রাখা শক্ত। অর্জ্জিত বস্তুকেই স্বচ্ছন্দে ভোগ করা যায়। আমি সুরঙ্গমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করি নি, আমি তা অর্জ্জন করতে চেয়েছিলাম। তাই আমি মনের দিকেই বেশী মন দিয়েছিলাম দেহের দিকে নয়। আমি জানতাম তার মনকে যদি বৈজ্ঞানিক চিন্তায় প্রভাবিত করতে পারি তাহলে তার দেহ আপনিই এসে ধরা দেবে আমার কাছে। তাই আমি তাকে সৃষ্টি তত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম। ফুল ফল পক্ষী পতঙ্গদের জীবন লীলার সত্য রূপ তার কাছে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলাম। তাকে এ-ও বোঝাতে চেয়েছিলাম যে প্রকৃতির এই সত্য রূপকে আচ্ছন্ন করে' কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক রহস্যের ধূম সৃষ্টি করেছে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। এই ধূমের নাম শাস্ত্র, অন্ধ লোকাচার। জীবনের আলোকে মরণের কুহেলী দিয়ে আচ্ছন্ন করে' অদ্ভুত সব প্রহেলিকা সৃষ্টি করেছে তারা। সুরঙ্গমাকে এই প্রহেলিকা থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিলাম আমি, এমন সময় হঠাৎ সুরঙ্গমা একদিন এসে বললে—'কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমাকে মধ্যপ্রদেশে মৃগয়ায় যেতে হবে। কুমারকে আমি বলেছিলাম যে, আমি মহর্ষি চার্ব্বাকের কাছে এখন বিজ্ঞানের পাঠ নিচ্ছি। মৃগয়ায় গেলে সে পাঠ বিঘ্নিত হবে।' কুমার

বললেন—'মহর্ষি চার্ব্বাক পালাবেন না, কিন্তু যে কস্তুরী মৃগদলের সন্ধান পেয়েছি তারা হয়তো পালিয়ে যাবে। আর সদ্য ধৃত বন্য কস্তুরী মৃগ যদি তোমাকে অবিলম্বে উপহার দিতে না পারি তাহলে এই মৃগয়া অভিযানের সার্থকতাই বা কি। এখন আপনিই বলুন আমার কি করা উচিত, আমি যাব, না থাকব?' আমি উত্তর দিলাম—'ভদ্রে, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না।' সুরঙ্গমা চলে গেল। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমার মনে হল চতুরাননের কাছে ও যে শপথ করেছিল সেই শপথই ওকে টেনে নিয়ে গেল। আমি ওর বিশ্বাস টলাতে পারি নি। আমার সর্ব্ববিধ বৈজ্ঞানিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে ওর কাছে। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল আমি সত্যিই তো ওকে বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ দিতে পারি নি। আমি যে সব যুক্তির অবতারণা করেছি সে সব যুক্তি সম্ভবত খণ্ডন করেছেন সুন্দরানন্দের কুলপুরোহিত আচার্য্য পর্ব্বত-শিখর। আচার্য্য পর্ব্বত-শিখর ঘোর আস্তিক, তিনি সব কিছুতেই বিশ্বাস করেন, তাঁর ধারণা আমাদের অবিশ্বাসের মূলে আছে আমাদের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার মূলে যে বিশ্বাস-প্রবণতা তা তিনি মানতে চান না। সুরঙ্গমা চলে যাবার পর আমি পর্ব্বত-শিখরের আশ্রমে গেলাম একদিন। ভাবলাম তাঁকে যদি আমি প্রভাবিত করতে পারি তাহলে সুরঙ্গমাও একদিন না একদিন প্রভাবিত হবেই। কিন্তু গিয়ে দেখলাম পর্ব্বত-শিখরে আরোহণ করা কঠিন। আত্মা, পরমাত্মা, জীবাত্মা, ব্যক্ত আত্মা, অব্যক্ত আত্মা প্রভৃতি অদৃশ্য কিন্তু দুরারোহ প্রস্তর নিচয় তাঁকে এমনভাবে ঘিরে রয়েছে যে তাঁর যুক্তির নাগাল পাওয়া শক্ত। সেখানে গিয়ে কিন্তু আর একজনের নাগাল পেলাম, তাঁর কন্যা ধারামতীর। আমি নাগাল পাবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি

নি, আমাদের আলোচনা শুনে সেই আকৃষ্ট হল আমার প্রতি। জ্যোৎস্নাকুল গভীর নিশীথে একদা আমি কিছু মাধ্বী সুরা এবং বন্য কুক্কুটের মাংস সহযোগে যখন উপলব্ধি করছিলাম যে আনন্দময় জীবনযাপন করার চেয়ে মহত্তর আর কি থাকতে পারে, থাকলেও তার সঙ্গে কৃচ্ছ্র সাধন করবার প্রয়োজনই বা কি তখন সহসা বল্কলবাসা ধারামতী আমার আশ্রমে এসে প্রবেশ করল। দেখলাম তার দুর্ব্বার যৌবন বল্কলবাসের বাঁধন মানতে চাইছে না। যে শক্তি নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করবার জন্যে নিখিল-বিশ্বে সতত উন্মুখ তারই প্রকাশ তার উজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিতে দীপ্যমান। আমার দিকে চেয়ে সলজ্জ হাসি হেসে সে বললে —"ভগবন, আশা করি আমার আগমনে আপনার আনন্দ বিঘ্নিত হল না। কৌতূহল আমাকে এখানে টেনে এনেছে। পিতার সহিত আপনি এ কয়দিন যে সকল আলোচনা করেছেন তার সারবত্তা হয়তো তাঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি কিন্তু তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ যুগে সকলেই যখন অলীক কল্প-লোকের স্বপ্নে আকুল তখন আপনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের ভূমিতে দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে যে সত্য দৃষ্টির পচিয় দিয়েছেন তাতে সত্যই আমি মুগ্ধ হয়েছি।" আমি শুনেছিলাম ধারামতী শবরী কন্যা। শবরী ভল্লুকীর গর্ভে ওর জন্ম। ভল্লুকী ছিল পর্ব্বত-শিখরের পরিচারিকা। পর্ব্বত-শিখরের আশ্রমেই ধারামতীর জন্ম হয়। ধারামতীর পিতা কে তা আমি ঠিক জানি না. অনেকে বলেন পর্ব্বত-শিখরই ওঁর জন্মদাতা ; ওঁর প্রবল আস্তিক্য-বুদ্ধি এবং নীতি-বৈদগ্ধ্য সত্ত্বেও ওঁর একবার না কি পদস্খলন হয়েছিল। সে যাই হোক ধারামতীকে যে উনি কন্যা স্নেহে লালন করেছিলেন তাতে কোনও সংশয় নেই, ওঁর বিদ্যা বুদ্ধি এবং সংস্কার অনুযায়ী যে ওঁকে শিক্ষাও দিয়েছিলেন সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম,

সুতরাং ধারামতীর কথা শুনে প্রথমে আমি বিস্মিত হলাম। সন্দেহ হল হয়তো সে আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছে। বললাম—"ভদ্রে, তুমি আসাতে আমার আনন্দ বিঘ্নিত হয় নি, কিন্তু তুমি আসাতে আমি বিস্মিত হয়েছি। কারণ তুমি যে পরিবেশে লালিত হয়েছ তোমার আচরণ ঠিক সে রকম মনে হচ্ছে না। তবু যখন এসেছ, বস"

আমার কথা শুনে ধারামতী আমার পার্শ্বে উপবেশন করে' হেসে বললে—"পর্ব্বত স্থাণু হতে পারেন কিন্তু তার থেকে' যে ধারা নির্গত হয় তা চঞ্চলা। সুতরাং পর্ব্বতের স্বভাব দেখে ধারার বিচার করবেন না" উপমাটি শুনে আমি খুব খুশী হলাম। বললাম—"তাহলে আপত্তি যদি না থাকে এই কুক্কুট মাংস এবং মাধ্বী সুরার অংশ গ্রহণ কর। সেদিন সেই গভীর নিশীথে ধারামতীর যে পরিচয় পেলাম তা অপূর্ব্ব"

কালকূট ঈষৎ অধীরতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"যদি সম্ভব হয় আপনার কাহিনীটি একটু সংক্ষিপ্ত করুন। শেষ পর্য্যন্ত কি হল বলুন"

"শেষ পর্য্যন্ত যা চিরকাল হয়ে থাকে, যা হওয়া উচিত, তাই হল। ধারামতীর যৌবন ধারায় আমি অবগাহন করতে লাগলাম। কিন্তু সুরঙ্গমাকে ভুলতে পারলাম না আমি কিছুতে। সুরঙ্গমার অন্ধ বিশ্বাসের কাছে আমার যুক্তি যে অবশেষে পরাজিত হয়েছে এই অপমানের ক্ষতটা প্রতিদিন যেন আমার হৃদয়ে গভীরতর হতে লাগল। আমার এ-ও মনে হতে লাগল যে ওর ওই অন্ধ বিশ্বাসটা হয়তো ভাণ, আমার যুক্তির অহঙ্কারকে চূর্ণ করবার ছল মাত্র। আমার মনের এক অদ্ভুত অবস্থা হল। যুক্তির অহঙ্কারকে আমি ত্যাগ করতে পারি না, কারণ ওরই ওপর আমার সমস্ত ব্যক্তিত্ব দাঁড়িয়ে আছে, যে নারী সেই ব্যক্তিত্বকে বিচলিত করতে চায় তার সঙ্গ কাম্য না হওয়াই উচিত, কিন্তু আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি

সুরঙ্গমাকেই কামনা করতে লাগলাম। ধারামতী আমার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়েই আমাকে ভজনা করেছিল। প্রথম প্রথম আমিও তার অর্চ্চনায় তুষ্ট হয়েছিলাম কিছুদিন, প্রতিরাত্রে সে যখন অভিসারে আসত আমি চন্দন-লিপ্ত দেহে পুষ্পমাল্যে শোভিত হয়ে সুরা মাংসের প্রাচুর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার জন্য। কিন্তু কিছুদিন পরে আবিষ্কার করলাম আমি মনে মনে সুরঙ্গমারই প্রতীক্ষা করছি, ধারা-মতীর সঙ্গে সম্পর্কটা নিতান্তই দৈহিক হয়ে উঠছে ক্রমশ''

কালকূট অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। সবিস্ময়ে ভাবিতে-ছিলেন তিনিও বর্ণমালিনীর সহিত প্রণয়ের অভিনয় করিতেছেন। বর্ণমালিনী যে নারী-শ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি ব্রহ্মার অনুসন্ধান করিতেছেন, কারণ তাঁহার আশা আছে যে স্তবে তুষ্ট হইয়া চতুরানন হয়তো তাঁহাকে মেঘমালতীরই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ করিবেন। হয়তো তিনি মেঘমালতীর মনোভাবই পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন। এই দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়াই কি তিনি এই বিশাল শবদেহের সমীপবর্ত্তী হন নাই? তিনি চার্ব্বাকের একটি কথাও শুনিতেছিলেন না। সহসা তাঁহার কর্ণগোচর হইল, চার্ব্বাক বলিতেছে—"হঠাৎ একদিন দুর্ঘটনা ঘটল একটা। সম্ভবত পর্ব্বত-শিখরের নির্দ্দেশ মতোই সুন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্ভ্রক আমাকে খবর পাঠালেন যে ধারামতীর সঙ্গে আমার ধারাবাহিক নৈশ ঘনিষ্ঠতার সংবাদ কারও অগোচর নেই। আমি যদি অবিলম্বে ধারামতীকে পত্নীত্বে বরণ করি তাহলে সব দিক থেকেই ভালো হয়। না করলে ন্যায়ত আমাকে দণ্ডনীয় হতে হবে। আমি জিম্ভ্রককে গিয়ে বললাম যে ধারামতীর ইচ্ছানুসারেই তাকে আমি সম্ভোগ করেছি। সে যদি আপত্তি না করে তাহলে তাকে বিবাহও করব। ধারামতীকে সমস্ত কথা খুলে বললাম। অর্থাৎ তাকে বললাম যে এখনও মনে

মনে আমি সুরঙ্গমাকে আকাঙ্ক্ষা করছি, তাকে মানসলোক থেকে চ্যুত করবার বাসনা আমার নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক ঘটেছে তা-ও কম আনন্দজনক নয়, জিম্‌ভ্রক বলছেন তোমাকে বিবাহ করে' সে আনন্দকে চিরস্থায়ী করতে। মানে, তিনি ভাবছেন যে বিবাহ হলে ইহজন্মে তো বটেই পরজন্মে এবং পরবর্ত্তী বহু জন্মেও তুমি আমার একাধিপত্য সহ্য করবে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই। পতিকে ত্যাগ করে' বহু নরনারী ইহজন্মেই পরপুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন এ রকম দৃষ্টান্ত বিরল নয়, পরজন্ম আছে কি নেই তা-তো অজ্ঞাত। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি। কিন্তু একমত না হলেও তোমাকে বিবাহ করতে আমি অনিচ্ছুক নই। আমার হৃদয় তোমার কাছে উদ্ঘাটিত করছি, সমস্ত জেনে শুনে তুমি যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করতে চাও, কর" ধারামতী কিছুক্ষণ অধোবদনে বসে' রইল, তারপর বলল—"মহর্ষি আমি আপনার হৃদয়েশ্বরী হব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আপনার কাছে এসেছিলাম, সে হৃদয়ে যখন সুরঙ্গমার মতো সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সমাসীনা তখন আমার কোনও আশা নেই। নিরাশ হৃদয়ে আপনার ক্রমশ ক্ষীয়মাণ দেহটাকে মাত্র সম্বল করে আমি আপনার সেবা করতে পারব না। আমাকে বিদায় দিন" রোরুদ্যমানা ধারামতীকে আমি কিছুতেই স্বমতে আনতে পারলাম না। আমি কিছুতেই তাকে বোঝাতে পারলাম না অকপট সত্যকে অবিচলিত চিত্তে স্বীকার করতে না পারলে পদে পদে দুঃখ পেতে হয় এবং সে দুঃখকে ঢাকবার জন্য পদে পদে আশ্রয় নিতে হয় ভণ্ডামির। ধারামতী কিন্তু আমার কথায় কর্ণপাত না করে' কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল। সে গিয়ে মহর্ষি পর্ব্বত-শিখরকে কিছু বলেছিল কি না এবং তা শুনে মহর্ষি পর্ব্বত-শিখর সুন্দরানন্দের মন্ত্রী জিম্‌ভ্রককে

প্ররোচিত করেছিলেন কি না তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু যখন সুন্দরানন্দের সেনাধ্যক্ষ কুলিশপানি আমাকে এসে বললেন—"আপনি যদি অবিলম্বে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ না করেন তাহলে আপনাকে বন্দী করবার আদেশ জিম্‌ভ্রক আমাকে দিয়েছেন" তখন কর্ত্তব্য স্থির করতে আমার বিলম্ব হল না। কুলিশপাণিকে বললাম—"সুন্দরানন্দের রাজ্য বহু বিস্তৃত। অবিলম্বে তা ত্যাগ করা শক্ত। পদব্রজে সে রাজ্য ত্যাগ করতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হবেই। তবু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব" কুলিশপাণি উত্তর দিলেন—"ভগবন, আপনাকে পদব্রজে যেতে হবে না।. জিম্‌ভ্রক আপনার জন্যে একটি দ্রুতগামী অশ্বতর পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি তাতেই আরোহণ করুন" তাই করতে হল। অশ্বতর-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' আমি সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করলাম। দুই দিন দুই রাত্রি সেই অশ্বতর সংসর্গে বাস করে এই কথাই আমার বারম্বার মনে হল যে অধিকাংশ মানবই অশ্বতর-সদৃশ তারা সম্পূর্ণ অশ্বও নয়, নিখুঁত গর্দ্দভও নয়। অর্থাৎ তারা অন্ধ সংস্কার-তাড়িত পশুও নয়, চক্ষুষ্মান বুদ্ধি-চালিত মানবও নয়, উভয়ের সংমিশ্রণে তারা এমন এক অদ্ভুত মনোবৃত্তির অধিকারী হয়ে এমন এক অদ্ভুত সমাজ সৃষ্টি করেছে যে সে সমাজে নির্ব্বোধ পশু বা বুদ্ধিমান মানব কেউ স্বচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে না। তারা গাভীর দুগ্ধ সবলে অপহরণ করে' তাকে করুণাময়ী জননী বলে' পূজা করে, যজ্ঞীয় পশুকে হত্যা করে' কল্পনা করে যে সে অক্ষয় স্বর্গের অধিকারী হল, বুদ্ধিমান বৈজ্ঞানিকের সহজ যুক্তি বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে উপেক্ষা করাই তাদের ধর্ম্মনিষ্ঠার একমাত্র পরিচয়। এই ধরণের চিন্তা পরম্পরা থেকে যৎকিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করতে করতে অবশেষে আমি সুন্দরানন্দের রাজ্যসীমা অতিক্রম করলাম। যে রাজ্যে এসে পদার্পণ করলাম তা ক্ষত্রিয়কুলশিরোমণি বলিষ্ঠ-বীর্য্যের।

আমি যখন সে রাজ্যে এসে প্রবেশ করলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। পল্লীপথে লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়েছে। একটি পথিককেই কেবল দেখতে পেলাম এবং তাকে প্রশ্ন করে জানলাম যে আমি বলিষ্ঠ-বীর্য্যের শাসনাধীন হর্ষ-নীড় নামক গ্রামে উপস্থিত হয়েছি। মাত্র এইটুকু খবর দিয়েই পথিক নিজ গন্তব্যপথে চলে গেল, আমি নিবিড় অন্ধকারে ঝিল্লী-মুখরিত এক বিরাট বৃক্ষের সমীপে সেই অশ্বতর-পৃষ্ঠের উপর বসে চিন্তা করতে লাগলাম কোথায় এখন আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। কোনও গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে যদি উপস্থিত হই তাহলে ভদ্রতাবশত সে হয়তো আমাকে আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু অযাচিতভাবে কারও আশ্রমপীড়া উৎপাদন করতে আমার প্রবৃত্তি হল না। এ-ও মনে হল যে কোনও সহজ-বুদ্ধি-সম্পন্ন গৃহস্থ যদি আশ্রয় দেবার পূর্ব্বে আমার পরিচয় জানতে চান তাহলে হয় সে পরিচয় আমাকে দিতে হবে, নতুবা মিথ্যাচার করতে হবে। এর কোনটা করবারই আমার ইচ্ছা হল না। মনে হল হর্ষ-নীড় গ্রামে যদি কোনও পান্থশালা থাকে কিছু শুল্কের বিনিময়ে সেইখানেই আমি রাত্রিবাস করব। আমার কাছে এক কপর্দ্দকও ছিল না, কারণ জিমূভ্রকের আদেশ অনুসারে একবস্ত্রেই আমাকে সুন্দরানন্দের রাজ্য ত্যাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু আমার আশা ছিল অশ্বতরটি বিক্রয় করে' কিছু অর্থসংগ্রহ করা অসম্ভব হবে না। নিবিড় অন্ধকারে আমি পান্থ-শালার সন্ধানে হর্ষ-নীড় গ্রামের পথে পথে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগলাম। একটি গৃহেরও দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেলাম না। গ্রাম পার হয়ে গ্রামপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলাম অবশেষে। সেখানে দেখলাম একটি কুটির থেকে আলোক নির্গত হচ্ছে এবং দ্বারদেশে একটি নারী দাঁড়িয়ে আছে। নিকটে গিয়ে দেখলাম নারীটি

বিগতযৌবনা কিন্তু সুসজ্জিতা। আমার দিকে কয়েকবার অপাঙ্গ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' সে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। বুঝলাম নারীটি রূপজীবিনী। অশ্বতর থেকে অবতরণ করে' বললাম—"ভদ্রে, তোমার গৃহে রাত্রিবাস করার সৌভাগ্যলাভ করতে পারি কি?" নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহ সম্মতি দান করে' আমাকে আহ্বান করলে এবং স্বীয় চেটিকা কর্পূরীকে আদেশ করলে পাদ্যঅর্ঘ্য আনতে। নীলোৎ-পলার গৃহেই আমি আশ্রয় পেলাম। পরদিন প্রভাতে উঠেই পরিশ্রান্ত অশ্বতরটিকে বিক্রয় করে' যে ক'টি মুদ্রা পেলাম তা নীলোৎপলাকে দিয়ে বললাম—"এই আমার যথাসর্ব্বস্ব। এর বিনিময়ে তুমি কয়েকদিনের জন্য আমার আহার ও শয়নের ব্যবস্থা কর। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি উপার্জ্জনের কোনও পন্থা আবিষ্কার করতে পারব আশা করি।" নীলোৎপলা বললে—"আপনার আহারের কোনও অসুবিধা হবে না। কিন্তু শয়ন সম্বন্ধে আমি কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে অক্ষম। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমার গৃহে জনসমাগম হওয়ার সম্ভাবনা। দিনের বেলাতেও অনেকে আসেন। সুতরাং শয়নের ব্যবস্থা আপনি অন্যত্র করুন। আমার পিছনের দিকে একটি ঘর আছে অবশ্য, তাতে আপনি শয়ন করতে পারেন, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে হয়তো আপনার নিদ্রা বি[illegible]ত হবে" আমি বললাম—"নিরুপায় ব্যক্তির নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া কঠিন। নিদ্রা বিঘ্নিত হলেও আপাততঃ আমি তোমার ওই পিছনের ঘরেই শয়ন করব যতক্ষণ না অন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারি" পরদিনই আমি এক কুম্ভকারের অধীনে একটি কর্ম্ম সংগ্রহ করলাম। কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সেই মাটি দিয়ে কর্দ্দম প্রস্তুত করবার ভার পেলাম। অপরাহ্ণে ছুটি পেলে আমি গ্রামের বাহিরে গিয়ে নদীতে স্নান করে' নীলোৎপলার বাসায় ফিরে আসতাম। নীলোৎপলা

প্রতিদিনই আমাকে কিছু খাদ্য এবং পানীয় দিত। আহারাদি শেষ করে' আমি চলে' যেতাম গ্রামপ্রান্তরের একটি বিরাট প্রান্তরে। সেইখানেই পাদচারণা করতে করতে আমি একাগ্রচিত্তে চিন্তা করতাম কি উপায়ে আমি প্রমাণ করব যে ব্রহ্মা নেই। কারণ সুরঙ্গমাকে আমি ভুলতে পারি নি। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলাম যে তার অন্ধবিশ্বাসের ভিত্তি যুক্তির আঘাতে আমি শিথিল করবই। একদিন সন্ধ্যায় কিছু অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল"

যে সব ঘটনার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে চার্ব্বাক তাহাই কালকূটের নিকট বিশদ করিয়া বলিতে লাগিল।

সমস্ত শুনিয়া কালকূট কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল, কি আশ্চর্য্য, ইনি যদি ব্রহ্মাকে সত্যই দেখিতে পান আনন্দিত হইবেন না, হতাশ হইবেন। কিন্তু আমি যদি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাই আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না, কারণ মেঘমালতীর যে রোষ-বহ্নি আমার জীবন দগ্ধ করিতেছে, পিতামহের প্রসাদ লাভ করিলে তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারিব এ আশা আমার আছে। আমরা উভয়ে বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা লইয়া এই শবদেহের সমীপবর্ত্তী হইয়াছি!

"কি ভাবছেন আপনি"—চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল।

"ভাবছি আর কালবিলম্ব না করে শব-ব্যবচ্ছেদ শুরু করা উচিত"

"বেশ করুন"

"প্রথমে কোন জায়গাটা কাটব?"

"পেটটাই কাটুন"

কালকূট পেটের মধ্যভাগটা টিপিয়া টিপিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর ছুরিকাটি বাহির করিয়া যেই অস্ত্রোপচার করিতে

যাইবেন অমনিই বিরাটকায় ক্ষিপ্রজঙ্ঘ উঠিয়া বসিল এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"আপনারা কে ?"

"আমার নাম কালকূট। এঁর নাম আমি জানি না।"

"আমি চার্ব্বাক"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ একবার কালকূট এবং একবার চার্ব্বাকের মুখের দিকে চাহিয়া সশব্দে বিজৃম্ভন করিল।

"আপনারা আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করলেন কেন"

"আপনি কি ঘুমাচ্ছিলেন ? আমরা ভেবেছিলাম আপনি মৃত"

কালকূটই কথা বলিতেছিলেন, চার্ব্বাক নীরবে বসিয়াছিল।

"মৃত্যুরই অপর নাম যে মহানিদ্রা তা কি আপনাদের জানা নেই ? আমি মহানিদ্রা-ঘোরেই পরম আনন্দ উপভোগ করছিলাম, আপনারা কেন আমাকে সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন বলুন তো"

চার্ব্বাক এইবার কথা কহিল।

"আমাদের ধারণা জীবনই সর্ব্বপ্রকার আনন্দের উৎস। সেই আনন্দ উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই তো আমি মৃত্যু বলে' মনে করি"

"জীবন আনন্দের উৎস সন্দেহ নেই, কিন্তু ঝঞ্ঝাটেরও উৎস। জীবন মুখরা ঈর্ষ্যা-পরায়ণা স্ত্রীর মতো। স্বাধীনচেতা আনন্দকামীরা তার কবল থেকে দূরে পলায়ন করতে সতত উৎসুক থাকেন কিন্তু সব সময়ে পলায়ন করতে পারেন না। জীবনের করাল আলিঙ্গন-পাশ ছিন্ন করে' মুক্ত হওয়া সহজ নয়। আমি অনেক কষ্টে তা ছিন্ন করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের স্পর্শ-প্রভাবে যা ছিন্ন ছিল তা আবার যুক্ত হয়ে গেল, আমি পুনরায় সেই মুখরার বাহুপাশে নিক্ষিপ্ত হলাম। আপনারা এ কাজ করলেন কেন—"

কালকূট উত্তর দিলেন।

"আপনাকে বিব্রত করছি এ ধারণা আমাদের ছিল না। আমার অন্তত ছিল না। আমি আপনার অঙ্গচ্ছেদ করতে এসেছিলাম সৃষ্টিকর্ত্তার সন্ধানে। এঁরও উদ্দেশ্য তাই ছিল—"

"সৃষ্টিকর্ত্তার সন্ধানে? তাঁকে বাইরে সন্ধান করছেন কেন, তিনি তো আপনাদের মধ্যেই আছেন। সূর্য্য যদি আলোর সন্ধানে চন্দ্র ব্যবচ্ছেদ করতে যান তাহলে তা যেমন হাস্যকর হবে, আপনাদের আচরণও ঠিক তেমনি হাস্যকর হচ্ছে"

চার্ব্বাক চুপ করিয়াছিল। এইবার কথা বলিল।

"আমাদের আচরণ যে হাস্যকর তা আমরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে চাই। আপনি যা বললেন পুস্তকেও তা লিপিবদ্ধ আছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তা আমরা যাচিয়ে নিতে চাই"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল চতুর্দ্দিক যেন বজ্র গর্জ্জনে সচকিত হইয়া উঠিল।

"দেখুন, কোন কিছু প্রত্যক্ষ করতে হলে চোখ থাকা দরকার। আমার মনে হচ্ছে আপনাদের তা নেই"

"কি করে' এ অসম্ভব মনে হল আপনার"

"আমার মতো একজন জলজ্যান্ত মানুষকে আপনারা মড়া ভেবেছিলেন, এইটে কি তার যথেষ্ট প্রমাণ নয়?"

"চক্ষুষ্মান মনুষ্যেরও ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম আমরা অহরহই করে' থাকি কিন্তু তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয় যে আমাদের চক্ষু নেই? বলতে পারেন আমাদের দর্শন সব সময় নির্ভুল নয়, বলতে পারেন আমাদের চক্ষুর বোধশক্তি সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমাদের চক্ষু নেই একথা বললে—"

ক্ষিপ্রজঙ্ঘ সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিল।

"ধরুন, আমি যদি মড়াই হতাম, আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করে' সৃষ্টিকর্ত্তার সম্বন্ধে কি তথ্য আপনারা আবিষ্কার করতেন, বলুন"

"কি করে' বলব ! যা এখনও আবিষ্কার করি নি তার স্বরূপই তো অজ্ঞাত আমাদের কাছে"

এমন সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ক্ষিপ্রজজ্ঞের বিশাল দক্ষিণ চক্ষুর কালো অংশটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া বাতায়নের মতো খুলিয়া গেল এবং সেই বাতায়ন হইতে মুখ বাড়াইয়া একটি রূপসী নারী চার্ব্বাককে সম্বোধন করিলেন—

"আপনাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য আমি আপাত-মৃত ক্ষিপ্রজজ্ঞকে পুনর্জ্জীবিত করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে ক্ষিপ্রজজ্ঞের শব-রূপের মধ্যেই আপনারা কোনও সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবেন আশা করে' এসেছিলেন। আমি আপনাদের হতাশ করব না। আমি নিজেকে সংহরণ করছি। আপনারা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হোন। আমি কিছুক্ষণ পরে আবার প্রকট হব ওর দেহে। আশা করি ততক্ষণে আপনারা আপনাদের অনুসন্ধান সমাপ্ত করতে পারবেন"

চার্ব্বাক আর বিস্মিত হইতেছিল না। তাহার বোধ শক্তি যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল। সে নির্ব্বাক হইয়া ক্ষিপ্রজজ্ঞের অক্ষি-বাতায়ন-বর্ত্তিনীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কালকূট প্রশ্ন করিলেন—"ভদ্রে, আপনার এ পরমাশ্চর্য্য আবির্ভাবে আমি অতিশয় বিস্মিত হয়েছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিন"

"আমি ক্ষিপ্রজজ্ঞের প্রাণ-লক্ষ্মী। আমি ওর দেহের অণু পরমাণুতে ওতঃপ্রোত হয়ে আছি অনাদিকাল থেকে, ওকে বিবর্ত্তিত করছি, আনন্দিত করছি নানারূপে নানাভাবে"

"কিন্তু ক্ষিপ্রজজ্ঞের কথা শুনে মনে হল আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই উনি নাকি অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

আমাদের স্পর্শ প্রভাবে ওঁর মহানিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে উনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন”

“আপনাদের স্পর্শ দ্বারা আমি ওঁর মধ্যে প্রবেশ করেছি এ ধারণা আমিই ওঁর মধ্যে সম্ভব করেছি। আমাকে ত্যাগ করে' উনি মহানিদ্রাঘোরে আনন্দ উপভোগ করছিলেন এ ধারণাও আমারই সৃষ্টি। ওঁর প্রতিটি কার্য্য আমিই নিয়ন্ত্রিত করছি। আপনারা ওঁর দেহকে ছিন্ন করে' দেখুন, আপনাদের কৌতূহল চরিতার্থ হোঁক, আমি কিছুক্ষণের জন্য সরে' থাকছি”

“কিন্তু ওঁর ছিন্ন ভিন্ন দেহে আপনি আবার প্রবেশ করবেন কি উপায়ে—”

“আমি তো কোথাও যাব না, আমি সরে' থাকব, সংহরণ করব নিজেকে। আপনাদের মনে হবে ক্ষিপ্রজজ্ঘ জীবন্ত নয়, মৃত, এতক্ষণ যেমন মনে হচ্ছিল—”

“ক্ষিপ্রজজ্ঘ কি বরাবর জীবিতই ছিলেন ?”

“ছিলেন এবং থাকবেন। আমি কখনও কোন কারণেই ওঁকে ত্যাগ করে' যাব না। ক্ষিপ্রজজ্ঘের অথবা আপনাদের যখন মনে হবে যে ওর দেহটা শবদেহ ছাড়া আর কিছু নয় তখনও আমি থাকব। ওঁর দেহের সঙ্গে আমি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমরা দুজনেই বারবার রূপান্তরিত হব, কিন্তু আমাদের বিচ্ছেদ কখনও ঘটবে না।

“আমরা যদি ওঁর দেহ ছিন্ন ভিন্ন করি বা ভস্মীভূত করি তাহলেও কি আপনার অস্তিত্ব নষ্ট হবে না ?”

“সৃষ্ট বস্তু কখনও নষ্ট হয় না, রূপান্তরিত হয় মাত্র। তবে আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ আছে। ক্ষিপ্রজজ্ঘের দেহকে বেশী ছিন্ন ভিন্ন করবেন না। ওঁর দেহের বর্তমান রূপটি অবলম্বন করে'

নূতন রকম আনন্দ উপভোগ করবার ইচ্ছা আছে। এবার আমি সরে যাচ্ছি। আপনারা কার্য্য আরম্ভ করুন”

অক্ষি-বাতায়ন বন্ধ হইয়া গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘ শুইয়া পড়িল।

চার্ব্বাক অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—“অদ্ভুত”

কালকূট বলিলেন—“মহর্ষি চার্ব্বাক, এখন বিহ্বল হয়ে পড়লে চলবে না। আমরা যা করতে এসেছি তা করতেই হবে। এই শবদেহের মধ্যেই আমরা পরমাশ্চর্য্যময়ী প্রাণ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রত্যক্ষ করলাম। হয়তো ব্রহ্মাকেও প্রত্যক্ষ করব। কোন অঙ্গ থেকে আরম্ভ করি বলুন তো? আমার মনে হয় উদর ছিন্ন ভিন্ন করবার আগে হাতটা ব্যবচ্ছেদ করলে কেমন হও?”

চার্ব্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল—“বেশ, তাই করুন”

৭

চন্দ্রালোকে সপ্তশিরা পর্ব্বতের উপত্যকাটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে কলস্বরা তটিনীটি তরঙ্গ-ভঙ্গে চতুর্দ্দিক আনন্দিত করিয়া তুলিয়াছিল মনে হইতেছিল সে যেন তটিনী নয়, সে যেন কোনও উচ্ছ্বসিতা কিশোরী, অশ্রান্ত কলকল স্বরে অন্তরের আনন্দকে ছন্দিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই তটিনী-তীরবর্ত্তী বিশাল বটবৃক্ষের গ্রন্থিল এক শাখায় বিচিত্রবর্ণ যে বিরাট বিহঙ্গমটি ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়াছিল তাহার প্রতিবিম্ব জ্যোৎস্নালোকে তটিনীর স্বচ্ছ তরঙ্গমালায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। মনে হইতেছিল সেই প্রতিবিম্বকে কেন্দ্র করিয়াই বুঝি তরঙ্গিনীর তরঙ্গলীলায় আকুলতা জাগিয়াছে। প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব তরঙ্গাঘাতে প্রতি মুহূর্ত্তে রূপ-পরিবর্ত্তন করাতে তরঙ্গিনী যেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। সে যেন প্রতিবিম্বের একটি

সম্পূর্ণ রূপ দেখিতে চাহিতেছিল, কিন্তু পারিতেছিল না, বুঝিতেছিল না যে তাহার নিজের অসংযত আগ্রহই প্রতিমুহূর্তে প্রতিবিম্বকে বিকৃত করিয়া দিতেছে। উপত্যকার নৈশ নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া সেই বিচিত্রবর্ণ বিরাট বিহঙ্গম সহসা কথা কহিয়া উঠিল।

"অয়ি, নদী-রূপিণী বিনতা,-তুমি বিচলিত হ'য়ো না। তোমার এই অধীরতাই বারম্বার তোমার কষ্টের কারণ হয়েছে। অধীরতা-বশেই তুমি তোমার দ্যুতিমান পুত্র অরুণকে বিকলাঙ্গ করেছ, তার অভিশাপই তোমার জীবনকে দুঃখময় করেছে। এখনও তুমি তোমার সপত্নী কদ্রুর সেবা করে' চলেছ। এখনও তোমার দাসীত্ব মোচন হয় নি—"

নদী আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কই কদ্রু, কোথা সে—"

"তোমার সপত্নী কদ্রুও রূপ পরিবর্তন করেছে। তুমি নদী হয়েছ, কদ্রু হয়েছে তোমার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী তটভূমি। তার গর্ভ-বিবরে এখনও সর্পকুল সঞ্জাত হচ্ছে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ তাদের সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত করতে পারে নি। আর তুমি তোমার অজ্ঞাতসারেই তোমার সপত্নী ও সপত্নী-সন্ততির সেবা করে যাচ্ছ। এখনও তুমি অভিশাপ মুক্ত হও নি"

"বৎস গরুড়, কোথায় ছিলে তুমি এতদিন"

"আমি গরুড় নই। আমি তার মূর্ত্ত স্মৃতি মাত্র"

"কিন্তু আমি যে তোমার শ্বেত বদন, রক্ত পক্ষ, কাঞ্চনসন্নিভ দেহ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। নেবে এস বৎস, জননীকে ছলনা কোরো না"

"অধীর হ'য়ো না বিনতা। যে গরুড় গজকচ্ছপরূপী কলহপরায়ণ ধনলোভী ভ্রাতাদের আহার করেছিল, অমৃত অর্জ্জনের জন্য যে গরুড় দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও পরাঙ্মুখ হয় নি, সে গরুড় বহুকাল পূর্ব্বেই অন্তর্হিত হয়েছে। একটি বিশেষ ব্রত উদ্‌যাপন করতে সে

এসেছিল, ব্রত শেষ হয়েছে, সে চলে গেছে। যে শক্তি তাকে সৃষ্টি করেছিল সেই শক্তিতে সে লীন হয়ে গেছে। সে এখন বিষ্ণুর বাহন, তোমার কেউ নয়। তুমিও কি আর সেই বিনতা আছ? 'কশ্যপের পত্নী যে বিনতা উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ সম্বন্ধে মিথ্যা কদ্রুর সমক্ষে সত্য ভাষণ করেছিল সে বিনতা কোথায়?' সে-ও আর নেই। সৃষ্টির বিশেষ যুগের বিশেষ প্রয়োজনে একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে' সে-ও রূপান্তরিত হয়েছে। একথা বিস্মৃত হয়ো না বিনতা যে আজ তুমি নবরূপে নূতন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছ, নদীরূপে যে মহাসাগরের দিকে তুমি প্রধাবিত হচ্ছ সেই মহাসাগরই এখন তোমার উপাস্য, সেই মহাসাগর কশ্যপ। তোমার মধ্যে স্বামীর নবরূপই এখন তোমাকে নবসম্পদে শক্তিশালিনী করবে। তুমি সেই সম্পদের জন্য প্রস্তুত কি না তাই নির্দ্ধারণ করবার জন্যে আমি গরুড়রূপে নিজেকে তোমার মধ্যে প্রতিফলিত করেছি। দেখছি গরুড়ের সম্বন্ধে এখনও তুমি মোহাচ্ছন্ন। তুমি ভুলে গেছ যে কদ্রুর উপর কর্তৃত্ব লাভ করাই তোমার উদ্দেশ্য, সেইজন্যই তুমি পুত্র কামনা করেছিলে। কিন্তু দু'জন মহাবলশালী পুত্র লাভ করেও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নি। তোমার অত্যধিক ব্যগ্রতা অরুণকে পঙ্গু করেছে, আর তোমার নিরর্থক তর্ক-প্রিয়তার ফলে তোমাকে যে দাসীত্ব বরণ করতে হয়েছিল গরুড়ের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়েছে তোমাকে সেই দাসীত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং তা করতে গিয়ে গরুড় হয়ে গেছে বিষ্ণুর ভক্ত। আপাতদৃষ্টিতে তোমার দাসীত্ব মোচন হলেও প্রকৃত-পক্ষে তুমি স্বাধীন হও নি। নবজন্মেও তুমি তটরূপিনী কদ্রুর সেবা করে' চলেছ, তার নাগ সন্ততিদের লালন পালনে সহায়তা করছ। আমি জানতে এসেছি সত্যই কি তুমি স্বাধীনতা চাও?"

"নিশ্চয় চাই। কিন্তু আমি গরুড়কে চাই। সে মাকে ভুলেছে এ কথা বিশ্বাস হয় না"

"বিষ্ণুকে পেতে হলে মাকেও ভুলতে হয়"

"তবে তার এ অশোভন বিস্মৃতি ভাঙতে হবে"

"এইবার তুমি দক্ষ-কন্যার মতো কথা বলেছ। কিন্তু তার এ বিস্মৃতি ভাঙতে হলে কি করতে হবে জান?"

"কি"

"তাকে বিষ্ণুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে"

"তাই আনব যদি প্রয়োজন হয়। কিন্তু কি করে' এ অসম্ভব সম্ভব হবে তাও বলে দাও"

"নূতন শক্তি অর্জ্জন করতে হবে"

"কি করে"

"প্রথমেই প্রবলভাবে ইচ্ছা করতে হবে। তোমার ইচ্ছার প্রাবল্যই তোমাকে শক্তি দেবে এবং সেই শক্তির আকর্ষণে আরও শক্তি সঞ্চারিত হবে তোমার মধ্যে। অমিত ইচ্ছা-শক্তিতে তুমি যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, তখন তোমার ইচ্ছাই তোমাকে রূপান্তরিত করবে। সেই রূপান্তরিত তুমি গরুড়কে বিষ্ণুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবে তখন"

বিহঙ্গমের কথায় নদীরূপিণী বিনতা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে বলিল—"তুমি যদি সত্যই গরুড় না হও, তাহলে কে তুমি, আত্মপরিচয় দাও। তোমার বাহ্য রূপের সঙ্গে গরুড়ের সাদৃশ এত বেশী যে এখনও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি—"

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই গরুড় মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। বিনতা সবিস্ময়ে দেখিল স্বয়ং মহর্ষি কশ্যপ তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

"প্রভু, আপনি—"

"হ্যাঁ আমিই। সমুদ্রমন্থনের পরই সমুদ্রের মৃত্যু হয়েছিল। পিতামহের আদেশে আমি মৃতসমুদ্রে জীবন সঞ্চার করে' জীবন্ত সমুদ্ররূপে দিগ্বিদিকে প্রসারিত ছিলাম। সহসা [illegible] তিনি আমাকে স্বৈরচর করে' দিয়েছেন, আমি এখন যা' খুশী হ'তে পারি। সেই শক্তিবলেই আমি গরুড় হয়েছিলাম। পিতামহের কৃপায় তুমিও স্বৈরচর হ'তে' পার। স্বৈরচর হলে' গরুড়ের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হবে না। তোমার অতৃপ্ত স্নেহক্ষুধা তাহলে হয়তো তৃপ্ত হবে।"

"কি করে' স্বৈরচর হওয়া যায়"

"তোমার একাগ্র ইচ্ছার সঙ্গে পিতামহের ইচ্ছা সম্মিলিত হলে"

আমার তরঙ্গ ধারা যে আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে বিক্ষিপ্ত করছে"

"নিজেকে সংযত কর, সংহত কর। যে সমুদ্রের দিকে তুমি প্রবাহিত হচ্ছিলে আমি তা ত্যাগ করেছি, তুমি তোমার গতি-বেগ রুদ্ধ কর এইবার। আমি চললাম। কদ্রুর দাসীত্ব থেকে যদি সত্যিই মুক্তি চাও তপস্যা কর। যদি স্বৈরচর হতে পার তাহলেই প্রকৃত মুক্তি পাবে"

এই বলিয়া কশ্যপ বিরাট কূর্ম্মে রূপান্তরিত হইলেন এবং সপ্তশিরা পর্ব্বতের একটি শিরা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সপ্তশিরা পর্ব্বতের শীর্ষদেশে একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য প্রকট হইয়াছিল। সপ্তশিরার উচ্চতম শৃঙ্গ সহসা বিগলিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছিল স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে এবং সেই সরোবরের মধ্যস্থলে একটি বিশাল শ্বেতপদ্ম আরও সাতটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শ্বেতপদ্ম দ্বারা পরিবৃত হইয়া সেই জ্যোৎস্নালোকে স্বপ্ন দেখিতেছিল। বস্তুত, মনে হইতেছিল ওই শ্বেতপদ্মগুলির অলৌকিক স্বপ্নই যেন জ্যোৎস্না-

রূপে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে। মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ শ্বেতপদ্মটির মধ্যস্থলে শোভা পাইতেছিল একটি প্রদীপ্ত ভ্রমর, মনে হইতেছিল জ্যোৎস্না ও তুষারের সমন্বয়ে যেন তাহার দেহ গঠিত হইয়াছে। ভ্রমরের অশ্রান্ত গুঞ্জনে স্বচ্ছ-নীরা সরোবরে উর্ম্মিমালা শিহরিত হইতেছিল, শ্বেতকমলগুলির সৌরভে বায়ু মন্থর হইয়া আসিয়াছিল, আকাশের নক্ষত্রকুল যেন অধীর আগ্রহে কিসের প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। সমস্ত চরাচর যেন রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছিল, একটা ভাষাহীন প্রতীক্ষাই যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল চতুর্দ্দিকে। সহসা সেই প্রগাঢ় প্রতীক্ষাকে বিচলিত করিয়া বৃহৎ শ্বেতপদ্ম কথা কহিয়া উঠিল। ভ্রমরের গুঞ্জন বন্ধ হইয়া গেল। শ্বেতপদ্ম কহিতে লাগিল—

"হে আমার মানসপুত্রগণ, এতকাল তোমরা আকাশে সপ্তর্ষি-রূপে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করছিলে। ধ্রুবের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, ব্যক্ত কর। আমার মনে হল যে নক্ষত্ররূপে হয়তো আমি তোমাদের ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করেছি, হয়তো ধ্রুব সম্বন্ধে তোমাদের কৌতূহল ম্রিয়মাণ হয়েছে, তাই আমি তোমাদের স্বৈরচর করে' দিয়েছি। তোমরা যা খুশী হতে পার। ইচ্ছে করলে পুনরায় তোমরা আকাশে নক্ষত্ররূপেও ফিরে গিয়ে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করতে পার। আমি শুধু জানতে চাই—বিষ্ণু-ভক্ত ধ্রুব সম্বন্ধে তোমরা কে কি ধারণা করেছ? বালক ধ্রুব যখন তপস্যাবলে বিষ্ণুর হৃদয় হরণ করেছিল তখন বিষ্ণুর অনুরোধে আমি ধ্রুবলোক সৃষ্টি করে' ওই বালককে স্থির নক্ষত্ররূপে তার মধ্যস্থলে স্থাপিত করেছিলাম। তোমাদের আমি সপ্তর্ষিরূপে সৃষ্টি করেছিলাম ওই ধ্রুবের উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য। এইবার তোমাদের পর্য্যবেক্ষণের ফল ব্যক্ত কর"

অত্রি কহিলেন—"আমার বিশ্বাস ধ্রুব স্থির নয়, চঞ্চল। তা নিস্তরঙ্গ সরোবরের সঙ্গে নয়, প্রবহমাণ স্রোতস্বতীর সহিত উপমেয়"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"আমরা যে আপনার নির্দ্দেশে ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করেছি আমার কাছে এইটেই একমাত্র ধ্রুব বলে মনে হয়েছে। অরুন্ধতীরও তাই অভিমত"

অঙ্গিরা ভিন্নমত পোষণ করেন দেখা গেল।

তিনি বলিলেন—"যে নামেই তাকে অভিহিত করুন, যে রূপেই তাকে প্রত্যক্ষ করুন একনিষ্ঠ তপস্যার ফলই যে ধ্রুব, তাতে আমার কোনও সন্দেহ নেই"

পুলস্ত্য বলিলেন—"ভোগই ধ্রুব—তা' সে সুখভোগ দুঃখভোগ যাই হোক। আমার মনে হয় তপস্যার লক্ষ্য যে মুক্তি তা-ও এক-প্রকার ভোগ। সেজন্য মনে হয় ধ্রুব ভোগেরই প্রতীক"

পুলস্ত্যের এই উক্তির পর একটা নীরবতা চতুর্দ্দিকে ঘনাইয়া আসিল।

কিছুক্ষণ পরে পুলহ বলিলেন—"ধ্রুব ধ্রুবই, তদতিরিক্ত আর কিছু নয়"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্রতুও তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন।

তিনি বলিলেন—"ধ্রুব সৃষ্টিকর্ত্তার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অসামান্য প্রতিভাশালী স্রষ্টার সৃষ্টি বলেই তা অনন্য, স্বতন্ত্র"

মরীচি উত্তর দিলেন সর্ব্বশেষে।

তিনি বলিলেন—"পিতামহ তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিতে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। অনেক সময় তারা পরস্পর-বিরোধী। আমার নিজের বংশেই সর্প ও সর্পশত্রু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমি এইটেই উপলব্ধি করেছি, সৃষ্টির সর্ব্বপ্রকার বিকাশের শেষ লক্ষ্য ধ্রুবলোক। ধ্রুবের মধ্যেই সমস্ত বিরোধের অবসান। আমার বংশের শেষ নাগ ও গরুড় ধ্রুবলোকেই সন্ধান করছে। ধ্রুব সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যের মিলনতীর্থ"

সপ্তর্ষিগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া শ্বেতপদ্মরূপী পিতামহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এইটেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম। তোমরা যে সকলেই এক একজন গুরুগম্ভীর ঋষি হয়েছ তাতে আর সন্দেহমাত্র নেই। একই রূপে একই পরিবেশে একই ধ্যানের কারাগারে বহু যুগ বন্দী থাকলে এ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভবও নয়, পাষাণের পক্ষে জলের সাবলীলতা বা বায়ুর স্বচ্ছন্দতা অনুভব করা যেমন সম্ভব নয়। আমি তাই ইচ্ছা করেছি নূতন স্বৈরচর-বিশ্ব সৃজন করব। সম্পূর্ণ দৈহিক ও মানসিক স্বাধীনতাই হবে সে বিশ্বের বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির প্রথম যুগে তোমরা সাতজনই ছিলে আমার মানস-পুত্র। তোমাদের মাধ্যমেই আমি সৃষ্টি-কল্পনাকে মূর্ত্ত করেছিলাম। সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, নাগবংশ, বালখিল্য, ঋষি-রাক্ষস সবই সম্ভব করেছ তোমরা। আমার নব-সৃষ্টিতেও তোমরাই অগ্রণী হও—"

অঙ্গিরা কহিলেন—"পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো নিত্য নবায়মান। মানব-প্রতিভায় আপনি যে রুচি সৃষ্টি করেছেন তা তো নিত্য নূতনের পক্ষপাতী, তাহলে আবার—"

"বৎস, তুমি বহুকাল মানব-সমাজচ্যুত হয়ে আকাশে বাস করছ। তুমি ভুলে গেছ অধিকাংশ মানবকে আমি পশু করেই সৃষ্টি করেছিলাম। তারা নানাভাবে তাদের পশুত্বকেই বাড়িয়েছে এবং শেষ পর্য্যন্ত পশুর মতোই ভাবছে যে তারা নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা। এই হাস্যকর অহমিকার নানা রূপই এখন নানা দেশের মানব সমাজ। তারা স্রষ্টাকে ভুলেছে, কিম্বা মানতে চাইছে না। এদের মূঢ়তায় আমি নিজেই লজ্জিত। সেই জন্যেই মনে করেছি এ সব ছবি মুছে ফেলে এবার নূতন ছবি আঁকব···"

পিতামহের বাক্য শেষ হইতে না হইতে মহাকাশে এক প্রচণ্ড শব্দ উত্থিত হইল। সুমিষ্ট হাস্য করিয়া পিতামহ বলিলেন—

"সপ্তর্ষিদের আকর্ষণে যে সব নক্ষত্র নিজ নিজ কক্ষে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছিল সপ্তর্ষিরা অপসৃত হওয়াতে তারা কক্ষচ্যুত হয়ে পরস্পরকে চূর্ণ করছে—"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"পিতামহ, ধ্রুবলোকে উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ একটি নীহারিকাকে বহুকাল ধরে' আমরা কৌতূহল সহকারে লক্ষ্য করছিলাম। সেটিও কি বিনষ্ট হয়ে যাবে?

"তা মহেশ্বর জানেন। আমি যখন বাঘ সৃষ্টি করেছিলাম তখন অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন যে ছাগকুল বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহেশ ছাগবংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারেন নি। কিছু কিছু ছাগ আছে এখনও। স্বৈরচর সৃষ্টি করলে হয়তো তেমনি হবে। কেউ যাবে কেউ থাকবে। তোমাদেরই যদি ইচ্ছা হয় যে পূর্ব্বরূপ ধারণ করে' উক্ত নীহারিকার পরিণতি লক্ষ্য করবে স্বচ্ছন্দে তা করতে পার। যা খুশী হবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তো দিয়েছি তোমাদের। এই পদ্মরূপ তোমরা ইচ্ছা করলেই পরিহার করতে পার"

পদ্মরূপী পিতামহের অন্তর্নিহিত কৌতুক শ্বেতপদ্মের প্রতি পর্ণে ঝলমল করিতে লাগিল। প্রতিটি পর্ণ অপরূপ শোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনে হইল পিতামহ তাঁহার নব-রূপ-ধারী মানসপুত্র-গণের উপর তাঁহার উক্তির প্রভাব কি হইল জানিবার জন্য স-কৌতুক আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছেন, যেন তিনি যাহা কল্পনা করিয়াছেন তাহা এইবার ঘটিবে। ঘটিতে বিলম্ব হইল না। সাতটি শ্বেতপদ্ম সাতটি বৃহৎ খদ্যোতে রূপান্তরিত হইয়া ধ্রুবলোকের উদ্দেশে উড়িয়া গেল। একটু পরেই দেখা গেল সপ্তর্ষিমণ্ডল আকাশপটে পূর্ব্বের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া ধ্রুবলোক পরিক্রমায় ব্যাপৃত হইয়াছেন। জ্যোৎস্না-স্নিগ্ধ তুষারশুভ্র যে ভ্রমরটি এতক্ষণ পিতামহ পদ্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়াছিল সে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিল।

"পিতামহ, আপনার মানসপুত্রগণ তো আপনার নব-সৃষ্টির পরিকল্পনায় নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারলেন না"

"পুরাতনের মোহ ত্যাগ করা সহজ নয় সখি। নূতন অজানা পথে চলতে পারেন কেবল সৃষ্টিকর্ত্তা নূতন সৃষ্টির আগ্রহে। এঁরা তো নিজেদের আগ্রহে স্বৈরচর হন নি, আমি জোর করে' কয়েকজনকে স্বৈরচর করে' দিয়েছি কি হয় দেখবার জন্যে। এই ঋষির দল সব বিষ্টুর পক্ষে, যা আছে তাই আঁকড়ে থাকতে চান। ধ্রুবকে পরিত্যাগ করে অধ্রুবের দিকে যাবার সাহস এঁদের নেই। কশ্যপের হয়তো কিছুটা আছে বলে' মনে হল। তাকেও স্বৈরচর ক'রে দিয়েছি। সে আমাকে সাহায্য করতে পারে"

"কিসে সাহায্য করবে"

"বিষ্টুকে একটু জব্দ করতে চাই। সে আমার নূতন সৃষ্টি-প্রেরণাকে ব্যাহত করছে। বিশ্বকর্ম্মাও জুটেছে ওর সঙ্গে। বিশু ভাবছেন স্বৈরচর সৃষ্টি হলে' ওঁর নিজের শিল্প-কীর্ত্তি সব লোপ পেয়ে যাবে। আর বিষ্ণু ভাবছেন যেহেতু তিনি পালনকর্ত্তা সেই হেতু তিনি সর্ব্বেসর্ব্বা, আমাকেও ওঁর তালে তাল রেখে চলতে হবে"

ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া বলিল—"বিষ্ণু পালন না করলে কিন্তু আপনার সৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত"

"দেবী ভারতি, এমনিতেই আমার সৃষ্টি শুধু লোপ নয়, লোপাট হয়ে যাচ্ছে। তারই হিসেব আমি নিতে চাই বিষ্টুর কাছ থেকে। কিন্তু এমনি হিসেব চাইলে ও কি দেবে ? প্যাঁচে ফেলতে হবে ওকে। কশ্যপ আসছে না কেন। তার তো এখানেই আসবার কথা ছিল"

আমি কিন্তু আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না পিতামহ! আপনারও করা উচিত নয়। ক্ষিপ্রঞ্জজ্যের হাতখানাকে ওরা কাটতে আরম্ভ করেছে। একবার আমাদের সেখানে যাওয়া উচিত"

"চল তাহলে আমরাই এগিয়ে দেখি কশ্যপের কি হল। বিনতাকে পেয়ে পুরানো প্রেম উথলে উঠল না তো। ওরা যে হাত কাটতে শুরু করেছে তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি"

"কশ্যপকে যদি খুঁজতে যান তাহলে দেরি হয়ে যাবে"

"কিছু দেরি হবে না। এস এবার ভোল-পালটানো যাক"

পিতামহ কমনীয়-কান্তি যুবকে রূপান্তরিত হইলেন। ভারতী ভ্রমর-রূপ পরিহার করিয়া হইলেন একটি কিশোর বালক।

"তুমি ব্যাটাছেলে হয়ে গেলে যে!"

"আপনার ওই সব মুনিঋষিদের কাছে যুবতী-রূপে যাবার ইচ্ছে নেই"

পিতামহ বীণাপাণির নাকে ছোট্ট একটি টোকা দিয়া বলিলেন— "একটা কথা তুমি ভুলে যাও বারবার। নিজেকে তুমি কিছুতেই লুকোতে পার না। যে বেশই তুমি ধারণ কর না কেন—তোমার রূপ উথলে পড়ে তোমার সর্ব্বাঙ্গ থেকে। তুমি যে প্রকাশের দেবতা তুমি নিজেকে কি লুকোতে পার?

সপ্তশিরা পর্ব্বত হইতে উভয়ে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদূর গিয়া বালক-রূপী বীণাপাণি সহসা বসিয়া পড়িলেন।

"এত ঢালু পাহাড় থেকে আমি নামতে পাচ্ছি না"

"পট করে পাখী হয়ে উড়তে শুরু কর"

পিতামহ হাসিয়া উত্তর দিলেন।

"তা-ও হবার ইচ্ছে নেই"

"তাহলে?"

বালকরূপী সরস্বতীর নয়নে দুষ্টামিভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে তিনি একটি শিশুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন।

"ও, বুঝেছি তোমার মতলব"

পিতামহ শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন, শিশু তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবতায় কাটিয়া গেল। তাহার পর শিশু পিতামহের কানে কানে বলিল—"লক্ষ্মীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল"

"কোথায়"

"কুবেরের অলকাপুরীতে"

"সেখানে তুমি কি করতে গিয়েছিলে"

"কুবেরের এক গণ্ডমূর্খ নাতিকে সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গম করবার জন্য একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। অধ্যাপক দরিদ্র, অর্থলোভে অসম্ভবকে সম্ভব করতে রাজি হয়েছিলেন, এখন ব্যাপার দেখে আমাকে ডাকাডাকি করছেন ব্রাহ্মণ"

তুমি কি করলে"

"মূর্খকে কি করে' আপাত-বিদ্বান করা যায় তারই পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে এলাম। আপনার স্বৈরচর লোক স্থাপিত হলে হয়তো মূর্খরা ইচ্ছা করলেই বিদ্বান হতে পারবে, কিন্তু এখন তা হওয়া সম্ভব নয়। এখন—"

"যাক, ও কথা। লক্ষ্মী কি বললেন"

"আপনি যে বিষ্ণুকে জব্দ করতে চান তা তিনি টের পেয়েছেন। কি করে' পেয়েছেন তা জানি না। আমাকে তিনি অনুরোধ করলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর এই কলহে আমরা যেন জড়িয়ে না পড়ি"

"তুমি কি বললে"

"বললাম, কলহ যদি বাধে আমি তাঁর পক্ষে থাকব"

পিতামহের চক্ষু দুইটি হাসিতে ঝলমল করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ স্মিতমুখে শিশুর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন—"হাঁসের পক্ষ দুটি, কিন্তু যখন সে ওড়ে তখন তার

গতি এক দিকেই হয়। তোমার গতি যে কোনদিকে হবে তা আমি জানি সুতরাং আমার ভয় নেই"

পিতামহ 'উঃ' বলিয়া সহসা থামিয়া গেলেন।

"কি হল?"

"ওরা খুব জোর ছুরি চালাচ্ছে"

'আপনার লাগছে না কি"

"লাগছে না? তোমার?"

বীণাপাণির শিশু-অধরে একটি মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিল কেবল, তিনি ইহার কোনও উত্তর দিলেন না। প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হইলেন।

"কশ্যপের তো কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না"

"এখানেই তার আসবার কথা ছিল। সপ্তর্ষিরা যে এত শীগ্‌গির রণে ভঙ্গ দিবেন, তা ভাবিনি। সেই জন্য তাকে বলেছিলাম মধ্য রাত্রিতে আসতে। মধ্য রাত্রির আর বেশী দেরীও নেই, চল ওই বড় পাথরটার উপর বসে' অপেক্ষা করা যাক। এই পথেই সে আসবে"

অদূরে একটি গোলাকার বিরাট প্রস্তর ছিল। উভয়ে তাহার উপর উপবেশন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রস্তরটি নড়িয়া উঠিল।

"এ কি"

প্রস্তর কথা কহিল।

"আমি কশ্যপ। প্রস্তর রূপ ধারণ করে' আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছিলাম"

পিতামহ বীণাপাণিকে কোলে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন।

"কি আপদ! এত জিনিস থাকতে তুমি প্রস্তররূপ ধারণ করতে গলে কেন?"

কশ্যপ উত্তর দিলেন—“সমুদ্ররূপে বহুকাল অশান্ত ছিলাম। প্রস্তরের সুনিবিড় স্থৈর্য্য খুব ভাল লাগছিল পিতামহ”

“স্বৈরচর হওয়ার সুবিধাটা দেখ! যাই হোক বিনতা কি বললে”

“তাকে স্বৈরচর করে’ দিলে গরুড়কে ঠিক টেনে আনবে। আমি গরুড় রূপ ধরে তার কাছে গিয়েছিলাম, দেখলাম এখনও সে গরুড়ের জন্য উতলা”

“সবাইকে তো আর চট করে’ স্বৈরচর করা যায় না। আগে দেখি তার দৌড়টা কতদূর”

“সে তপস্যা করছে”

“দেখা যাক”

পিতামহ সানন্দে লক্ষ্য করিলেন কশ্যপের মুখমণ্ডলে একটা গদগদভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই তিনি চাহিতেছিলেন। সম্মোহিত ভক্তকেই সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা সম্ভব। বিনতা-প্রসঙ্গেই আরও কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল কিন্তু শিশু-রূপিণী বীণাপাণির নয়নের দিকে চাহিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। মনে হইল কশ্যপকে তিনি বোধহয় কিছু বলিতে চান।

পিতামহ কশ্যপকে বলিলেন—“কশ্যপ তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর। আমি এই শিশুটিকে রেখে আসছি”

বীণাপাণিকে কোলে করিয়া পিতামহ পুনরায় পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিলেন এবং কিছুদূর উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তেই পর্ব্বতগাত্রস্থ শিংশপা বৃক্ষের শাখায় যে দুইটি অপরূপ নৈশ বিহঙ্গম কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল তাহারাই যে পিতামহ ও সরস্বতী তাহা কল্পনা করা কশ্যপের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

সরস্বতী কহিলেন—“আপনার কশ্যপকে একটু কাজে লাগাতে চাই পিতামহ”

"স্বচ্ছন্দে। কি করতে হবে বল। ও যে রকম মুগ্ধ হয়েছে এখন যা করতে বলব তাই করবে। কি করতে বলব বল"

"আপনি বললে হবে না, আমি বলব। আপনি একটু অন্তরালে থাকুন"

"বেশ। আমি এইখানেই অপেক্ষা করছি। তুমি বেশী বিলম্ব কোরো না। আমি বরং এক কাজ করি, তারাকে নিয়ে আসি। তাকে একটু দরকার"

"কোন্ তারা ?"

"বৃহস্পতির বউ গো, চাঁদ যাকে নিয়ে পালিয়েছিল। বুধের মা"

"বুঝেছি। আচ্ছা, যান"

পিতামহ আলোক-রেখা-রূপে আকাশের দিকে চলিয়া গেলেন। বীণাপাণি কশ্যপের সমীপবর্ত্তী হইলেন শবরীর রূপ ধারণ করিয়া।

৮

ক্ষিপ্রজঙ্ঘের হস্তের পেশীশিরাসমূহকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কালকূট অবশেষে চার্ব্বাককে বলিলেন—"মহর্ষি, একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে। জানি না, আপনারও তা মনে হয়েছে কিনা"

"কি বলুন"

"আমি অভিভূত হয়ে পড়েছি। শিরা-উপশিরা পেশী অস্থির গঠন ও স্থাপন নৈপুণ্য দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন কোনও বিরাট নগরী প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু সে নগরীর নির্ম্মাতাকে প্রত্যক্ষ করতে হলে ভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হবে"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ তপস্যা করতে হবে, সেই কাপালিক যেমন করেছিল"

"এই ছিন্নভিন্ন শবের কাছে চোখ বুজে বসে' থাকবেন তার মানে ?"

"থাকলে ক্ষতি কি"

"সময় নষ্ট হবে, আর কিছু যদি না-ও হয়"

"মহর্ষি আপনি তো একাধিকবার প্রত্যক্ষ করলেন যে, যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির মাপকাঠিতে অসম্ভব তা-ও সম্ভব হল। আপনি আমাকে সর্পে রূপান্তরিত হতে দেখলেন, এই শবের মধ্যে মূর্ত্তিমতী প্রাণ-দেবতাকে দেখলেন, তবু আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না যে—যা আমরা অসম্ভব বলে' মনে করি তার হেতু আমাদের বুদ্ধির অসম্পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত ?"

"বিশ্বাস হচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে যে, এই অসম্পূর্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করাও তো নিরাপদ নয়। কোনও অজ্ঞাত কারণে আমার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়েছে এইটে মেনে নিয়ে তাই আমি আপাতত চুপ করে' থাকতে চাই, আপনি যদি তপস্যা করতে চান করুন !"

"আপনি কি চুপ করে' বসে থাকবেন ? আপনিও যদি তপস্যায় ব্রতী না হন তাহলে আপনার উপস্থিতি আমার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হবে এবং বলা বাহুল্য, আমার তপস্যাও বিঘ্নিত হবে তাহলে"

"বেশ, আমি উঠে যাচ্ছি। চারিদিকে ঘুরে দেখি দেশটা কেমন। আপনি তপস্যা করুন"

"বেশ"

কালকূট নয়নযুগল মুদিত করিয়া বদ্ধপাণি হইতেই চার্ব্বাকের অধরে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নের দৃষ্টিতে ব্যঙ্গ, বিস্ময় ও করুণার এমন একটা সমন্বয় হইল যাহা প্রকৃতই চার্ব্বাকীয়। নীরব

ভাবায় সে বৃষ্টি যেন বলিতে লাগিল—'আহা, স্বল্পবুদ্ধি লোকগুলির কি দুর্দ্দশা।' পরমুহূর্ত্তেই কিন্তু তাহার মনে হইল, "আমিও তো কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মায়ানদীর তীরে বসে' অনুরূপ মূর্খতার পরিচয় দিয়েছিলাম। মানুষের কিসে কখন যে বুদ্ধিভ্রংশ হয় কিছুই বলা যায় না। তীব্র সুরাই হয়তো আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করেছে, কে জানে।" চার্ব্বাক উঠিয়া পড়িল এবং উপলবহুল পার্ব্বত্য উপত্যকায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রূপসী সুরঙ্গমার অঞ্জন-সুন্দর খঞ্জন-নয়ন দুইটিও তাহার মানস প্রাঙ্গণে যেন কৌতুক ভরে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। চার্ব্বাক পুনরায় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল—'চতুরাননের অনস্তিত্ব আমাকে প্রমাণ করতেই হবে। যে মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করেছে তা কিছুক্ষণ পরে অপসারিত হবে নিশ্চয়ই। উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে তখন আমি নিশ্চয় সত্যকে আবিষ্কার করতে পারব। সুরঙ্গমার বিশ্বাসকে বিচলিত করতেই হবে।' একটা ঝম্ ঝম্ শব্দে চার্ব্বাকের স্বগতোক্তি বাধাপ্রাপ্ত হইল। চার্ব্বাক দেখিতে পাইল একটা বিরাটকায় শজারু তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সর্ব্বাঙ্গের কণ্টক সমুচ্ছ্রিত হওয়াতে তাহাকে এক চলমান বিরাট বিচিত্র কদম্ব ফুলের ন্যায় দেখাইতেছিল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে সে দিকে চাহিয়া রহিল।

"চার্ব্বাক, আমি তোমারই অপেক্ষায় এখানে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছি"

"কে তুমি"

"আমি তোমার কৌতূহল"

"এ মূর্ত্তি কেন তোমার"

"আমি সংশয়-কণ্টকিত হয়েছি। শব-ব্যবচ্ছেদ করে' বিশেষ কোন লাভ তো হল না। কালকূটের তপস্যার ফলেও যে বিশেষ

কিছু হবে—তা মনে হচ্ছে না। তোমার এই সন্ধান-লোকে নূতন আর কি পাওয়া যেতে পারে? কিসের জন্য অপেক্ষা করছি আমরা?"

"'ইচ্ছা করে' তো আমি এখানে অপেক্ষা করছি না, আমাকে এখানে বাধ্য হয়ে থাকতে হচ্ছে। এ দেশের নাম সন্ধান-লোক না অদ্ভুতলোক তা-ও আমি জানি না। আমার কৌতূহল কি উপায়ে যে আমার দেহের বাইরে এসে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে পারে তা-ও আমার বুদ্ধির অতীত। সংক্ষেপে যদি আমার মানসিক অবস্থা বোঝাতে হয় তাহলে বলতে হবে আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি"

"আমি তাহলে এখন অন্তর্দ্ধান করি"

"তুমি বারবার রূপান্তরিত হচ্ছ কি করে"

"তা জানি না। আমি আপনা-আপনিই বদলে যাচ্ছি, তুষার যেমন জল হয়। অনুভব করছি আবার একটা পরিবর্ত্তন আসছে। এই দেখ—"

শজারু পিপীলিকায় পরিণত হইল।

"তুমি যতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকবে ততক্ষণ আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই। আমি চললুম"

পিপীলিকা গর্ত্তে প্রবেশ করিল। প্রত্যক্ষজ্ঞান-বিলাসী চার্ব্বাক অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিল, "যে সব অনুমানবাদী বেদবিৎ পণ্ডিতদের আমি এতকাল উপহাস করেছি তাঁরা যদি এখন আমার দুরবস্থা দেখতে পেতেন তাহলে আনন্দের কিছু খোরাক পেতেন নিশ্চয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি ক্রমশ। মনে হচ্ছে—কিন্তু না, আমি নিশ্চয়ই অসুস্থ। বিকারের ঘোরে অসম্ভব প্রলাপকে সত্য বলে মনে করছি। দেখি এই বিকার আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে কতদূর বিকৃত করতে পারে। নির্ব্বিকার হয়ে সেইটেই

যদি লক্ষ্য করতে পারি তাহলেও আত্মরক্ষা করতে পারব। কালকূটের কার্য্যকলাপই একটু অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করা যাক্ আপাততঃ। এ ছাড়া আর করবার তো কিছু নেই"

চার্ব্বাক পুনরায় সেই শবদেহের অভিমুখে গমন করিয়া দেখিতে পাইল যে কালকূট নিমীলিতনয়নে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। চার্ব্বাক নিকটস্থ একটি ঝোপে আত্মগোপন করিয়া নীরবে কালকূটকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার মনে হইল বর্ণমালিনী যে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা তাহা প্রমাণ করিবার জন্যে ব্রহ্মাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন কি। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাহার রূপের তুলনা করিয়া ক্ষুব্ধ হওয়াই বা কেন। পাতালনিবাসী রাজপুত্র? পাতালে কি জনসমাজ আছে? কি রকম রাজ্যের রাজপুত্র ইনি? কালকূটকে কেন্দ্র করিয়া বিবিধ চিন্তা চার্ব্বাকের মস্তিষ্কে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। কিছুকাল পূর্ব্বে এক অদ্ভুত ঊর্ণনাভকে দেখিয়া তাঁহার মনে যে-জাতীয় বিস্ময় উৎপন্ন হইয়াছিল সেইরূপ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চার্ব্বাক ঘন ঝোপে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ভ্রূ যুগল কুঞ্চিত হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় ক্ষুদ্রায়িত হইল, নয়নের প্রখর দৃষ্টিতে মূর্ত্ত হইল কৌতুক ও করুণা।

সপ্তর্ষিগণের সাময়িক অন্তর্দ্ধানে অন্তরীক্ষে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রশমিত হইয়াছে। সুধাকর সোমদেবতার বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। নিজস্ব চন্দ্রলোকে তিনি নির্ম্মল কৌমুদী বিস্তার করিয়া পুনরায় রোহিণীর মনোরঞ্জন করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয়ে ছায়াপাত হইল। মনে হইল যে জ্যোৎস্না-বিধৌত শুভ্র মেঘখণ্ডের অন্তরালে তারা দেবী আত্মহারা হইয়া স্বপ্নজাল রচনা করিতেছিলেন সেই শুভ্র মেঘখণ্ড সহসা গুম্ফশ্মশ্রুসমন্বিত বিরাট এক মনুষ্যমুখে রূপান্তরিত হইয়া তারা দেবীর সহিত আলাপ করিতেছে। ঈর্ষায় কলঙ্কীর মুখমণ্ডল আরও কালো হইয়া গেল। তিনি সন্দেহ করিতে লাগিলেন, বৃহস্পতি হয়তো কোনও দূত পাঠাইয়াছেন তাহার কাছে। লোকটা এত অপমানিত হইল তবু ছাড়িবে না? হইতে পারে তারা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী, কিন্তু সে যখন তাঁহার কাছে থাকিতে রাজী নয়, সে যখন স্বেচ্ছায় আমার সহিত পলাইয়া আসিয়াছে, তখন ইহা লইয়া আর মাতামাতি কেন? তারার পুত্র বুধ যে আমারই পুত্র ইহা সর্ব্বজনবিদিত। পিতামহ নিজে আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরও বৃহস্পতি যদি···। চন্দ্রের চিন্তাধারা কিন্তু আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পাইল না। সেই মেঘনির্ম্মিত মনুষ্যমুখ তাহারই দিকে সবেগে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। চন্দ্রদেব চমকিত হইলেন—একি, এ যে স্বয়ং পিতামহ!

পিতামহ নিকটস্থ হইয়া চন্দ্রদেবকে ঘিরিয়া অপরূপ শোভা-সৃষ্টি

করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"ওহে চাঁদ, আমি তোমার তারা দেবীকে নিয়ে চললাম। মেঘের আড়ালে যেটা রইল, সেটা তারার মতোই দেখাবে বটে, কিন্তু সেটা ওর কঙ্কাল—ওটার সঙ্গে প্রেম করতে যেও না, সুখ পাবে না"

চন্দ্র শঙ্কিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কোথা নি[illegible]লেন"

"মর্ত্যলোকে। পাতালের এক পাগল রাজপু[illegible]ক ভোলাতে"

"ভোলাতে ?"

চন্দ্র হতবাক হইয়া পিতামহের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পিতামহ মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"বুঝেছি, তোমার ভয় হচ্ছে, ও যদি নিজেই ভুলে যায় তাহলে তোমার দশা কি হবে। ভয় নেই, ও ভুলবে না। একটি পুরুষের পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করে' সারাজীবন তার দাসী হয়ে থাকার মতো মনোভাব এদের নয়। এদের আমি সৃষ্টি করেছিলাম অভিনেত্রী করে'। মোহিনী প্রেয়সীর অভিনয়ে এদের জোড়া নেই। তোমাকে কি ভাবে ভুলিয়েছিল মনে আছে তো ? আমার বিশ্বাস পাতালের রাজপুত্র ওকে বাগাতে পারবে না। তোমার কাছেই ও ফিরে আসবে আবা[illegible]। তুমি ওকে যথেষ্ট সুখে রেখেছ দেখছি—"

"কিন্তু পিতামহ, যদি না আসে—"

"তাহলে বৃহস্পতির যে দশা হয়েছে, তোমারও তাই হবে"

"কিন্তু পিতামহ—"

"দক্ষ রাজার সাতাশটি মেয়েদের উপর তো একাধিপত্য করছ ! তবু তোমার আশা মিটছে না ? এদিকে শুনছি যক্ষ্মা হয়েছে—"

রোহিণী অপ্রত্যাশিতভাবে বলিয়া উঠিল—"তারাকে নিয়ে যান আপনি। ওর কথা শুনবেন না—"

বাকী ছাব্বিশ জন দক্ষ কন্যাও সমস্বরে সমর্থন করিল সে

কথার। পিতামহ অন্তর্দ্ধান করিতেছিলেন এমন সময় চন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"একটা কথা শুধু বলে যান পিতামহ—"

"কি বল"

"তারাকে কার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে"

"মেঘমালতীর"

"সে আবার কে"

"স্বর্গের একজন অপ্সরী"

"কি করে' তা সম্ভব হবে পিতামহ। তারা কি তারা ছাড়া আর কিছু হতে পারে?"

"ওকে স্বৈরচর করে' দেব। ও যা খুশী হতে পারবে। আপাতত ওকে মেঘমালতী হতে হবে, আর প্রয়োজন মতো মাছিও হতে হবে মাঝে মাঝে"

"মাছি?"

"হ্যাঁ, কালকূটের সঙ্গে একা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ মেঘমালতী সেজে থাকবে, তারপর যেই তার বউ বর্ণমালিনীর সাড়া পাবে অমনি পট করে' মাছি হয়ে যাবে।"

"কেন"

"প্রাণ বাঁচাবার জন্যে। নাগিনী বর্ণমালিনী নক্ষত্র-বধূদের মতো উদারচেতা নয়। সপত্নীর সান্নিধ্য সে সহ্য করতে পারবে না। সে মনোহারিণী, কিন্তু হিংসা বিষে পরিপূর্ণ, তার সুদীর্ঘ জিহ্বা ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুতীক্ষ্ণ। যদিও নিজেকে সে বর্ণবিরোধী বলে' প্রচার করে, যদিও মুখে সে বলে' যে সমস্ত পৃথিবী একরঙা হয়ে যাক, কিন্তু নিজে সে বিচিত্রবর্ণা, কালকূটকে সম্পূর্ণভাবে সে নিজে অধিকার করে' রাখতে চায়। সুতরাং তারাকে সাবধানে থাকতে হবে"

"এ সব বিপজ্জনক জটিলতার মধ্যে কেন ওকে নিয়ে যাচ্ছেন পিতামহ"

পিতামহ স্মিতমুখে কিছুক্ষণ শশধরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাহার পর বলিলেন—"দেখ, আমার নিজের তৈরী খেলাঘরে আমার নিজের তৈরী পুতুল তোমরা। তোমাদের আমি যখন যেখানে খুশী রাখব, যখন যেমন খুশী নাচাব। তোমরা খেলাটাকে খেলার মতোই উপভোগ কর—তাহলে যেটাকে বিপজ্জনক জটিলতা মনে হচ্ছে, তাতেই আনন্দ পাবে। ওগো তোমরা এই ছেলেমানুষটাকে একটু ভোলাও তো!"

পিতামহের কথা শুনিয়া সাতাশটি নক্ষত্রের সর্ব্বাঙ্গে নব নব দীপ্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

স্বাতী হাসিয়া বলিল—"আপনি যান, আমরা ওকে সামলাব"

"আমার একটা নালিশ আছে পিতামহ"

রোহিণী আগাইয়া আসিল।

"কি হল তোমার আবার"

"কিছু হয় নি, কিন্তু আপনি মানুষ নামক যে জীব সৃষ্টি করেছেন তাদের এত বোকা করেছেন কেন বলুন তো"

"কেন কি করেছে তারা তোমার"

"একজন মানুষ জ্যোতিষী নাকি বলেছে যে, আমার চেহারা ষাঁড়ের মুখের মতো! দেখুন দিকি কাণ্ড! অশ্বিনীকে বলেছে ঘোড়া-মুখো, শতভিষাকে কুম্ভ, ধনিষ্ঠাকে মৃদঙ্গ—। আপনি ওদের বুদ্ধিটাকে একটু ঘসে' মেজে ঠিক করে' দিন"

"আমাকেই ওরা চতুর্ম্মুখ বানিয়ে দিয়েছে। ওদের কাছে কি ঘেঁসবার জো আছে। ওরা নিজেদের বুদ্ধি, দৃষ্টি আর শক্তি দিয়ে

নিজেদের মতো জগৎ সৃষ্টি করে' তাতে মশগুল হয়ে আছে। ওদের কিছু করা যাবে না। ওরা নিজেদের পথে নিজেরাই বদলাবে ক্রমশ”

“আমরা কিছু করব না ?”

“আমরা মজা দেখব”

নক্ষত্র-রূপসীদের নয়নে অধরে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল।

চন্দ্রদেব পুনরায় কথা কহিয়া উঠিলেন—“পিতামহ, আমি কি তাহলে আর তারার দেখা পাব না ?”

“যদি মাছি হয়ে পাতালে যেতে পার তাহলে পাবে। তারা যখন মাছি-রূপ ধারণ করবে, তখন তুমি মাছি-রূপে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে আলাপ করতে পারবে—”

“তা কি করে' সম্ভব”

“খুবই সম্ভব। এর নজীরও আছে অনেক। অশ্বিনীকুমারদের জন্মের ইতিহাসটা স্মরণ কর না। মনে নেই ?”

“আজ্ঞে, আমি তো কিছুই শুনিনি। বাইরের কোন খবর রাখবার অবসরই পাই না”

“পাবার কথাও নয়। সাতাশটি পত্নী, উপরিও দু' একটা আছে। ঘটনাটা শোন তবে। বিশ্বকর্ম্মার মেয়ে সংজ্ঞার বিয়ে হয়েছিল সূর্য্যের সঙ্গে। দুটি ছেলে—বৈবশ্বত মনু আর যম এবং একটি মেয়ে যমী হবার পর সংজ্ঞা কাবু হয়ে পড়ল। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রেম সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠল তার পক্ষে। সে তখন তার এক দাসী ছায়াকে পতিদেবতার কাছে এগিয়ে দিয়ে সরে' পড়ল বনে তপস্যা করবার জন্যে এবং সম্ভবত সূর্য্যের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে অশ্বিনীরূপ ধারণ করে' তপস্যা করতে লাগল। কিন্তু সহস্রাক্ষ সূর্য্যের

দৃষ্টি এড়ান সহজ কথা নয়। সূর্য্য অশ্বরূপ ধারণ করে' হাজির হলেন তার কাছে গিয়ে। ফলে অশ্বিনীকুমারদের জন্ম হল। ইচ্ছা কর' তো তুমিও মক্ষিকারূপ ধারণ করে' তারার কাছে যেতে পার"

চন্দ্রদেব নাসা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "মক্ষিকা? তা পারব না পিতামহ"

"তাহলে বিরহ ভোগ কর কিছুদিন। আমি চললুম। আপত্তি না কর তো তোমার প্রেয়সীদের অধর সুধা চেখে যাই একটু"

"না, না, আপত্তি আর কি"

পিতামহ সাতাশটি নক্ষত্রকে একে একে চুম্বন করিয়া সূক্ষ্ম আলোকরেখা-রূপে পুনরায় মর্ত্ত্যের দিকে নামিয়া গেলেন।

"দেখ দেখ, কত বড় উল্কাপাত হল একটা"

ভরণী দেবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন।

"ওটা উল্কা নয়। শ্রীমতী তারা পিতামহকে অনুসরণ করছেন। কত ঢঙই যে জানেন।"

চন্দ্রদেব ক্ষণকাল বিমর্ষ হইয়া রহিলেন, তাহার পর রোহিণীর দিকে ফিরিয়া যথারীতি প্রণয় নিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কালকূট তপস্যা করিতেছিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তে প্রত্যাশা করিতে-ছিলেন যে স্বয়ং পিতামহ আবির্ভূত হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইল, ঝোপের অন্তরালে চার্ব্বাক নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটিল না। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ছিন্নভিন্ন হস্তকে ঘিরিয়া কতকগুলি রক্তলোভী মক্ষিকা ভনভন করিতে লাগিল কেবল। নিমীলিত নয়নে কালকূট মক্ষিকাদের গুঞ্জন কলরবই শুনিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল মক্ষিকা-গুঞ্জনের অন্তরালে যেন মনুষ্যকণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। বহুদূর হইতে কে যেন বলিতেছে—ভয় নাই, আমি আসিতেছি। কালকূট একাগ্র-চিত্তে সেই আশ্বাস বাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল স্বয়ং পিতামহই বুঝি মক্ষিকাগুঞ্জনের ভিতর দিয়া বার্ত্তা প্রেরণ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে কিন্তু মক্ষিকাগুঞ্জন স্তব্ধ হইয়া গেল। কালকূট চক্ষু উন্মীলন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্র-জঙ্ঘের শবদেহও উঠিয়া বসিল এবং তাহার অক্ষিবাতায়নে সেই রূপসী আবির্ভূতা হইলেন। কালকূটকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—আপনার অনুসন্ধান কি সমাপ্ত হয়েছে? আপনি এর হস্তের শিরা উপশিরা পেশী স্নায়ু ছিন্নভিন্ন করে' কোন রহস্যের সন্ধান পেলেন কি? যে হস্ত গুরু খড়্গ ধারণ করে' নৃশংস হত্যায় সহায়তা করে, যে হস্ত নিপুণ বিলাসে লঘু তুলিকা চালনা করে' মনোরম চিত্র অঙ্কন করে, যে হস্ত এক মুহূর্ত্তে পেলব পল্লবতুল্য—পরমুহূর্ত্তে কঠিন বর্ত্তুলবৎ হ'তে পারে, যে হস্ত বরদান করে, ভিক্ষাদান করে, যে হস্ত

সেবা করে, চপেটাঘাত করে, যে হস্ত কখনও মৌন কখনও ভাষাময়, কখনও লুণ্ঠক কখনও দাতা, সে হস্তের প্রকৃত রূপ কি আপনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন? যদি পেরে থাকেন তাহলে অনুমতি দিন আমি অন্যান্য প্রার্থীদের বাসনা চরিতার্থ করবার আয়োজন করি। আপনি যখন তপস্যায় রত ছিলেন তখন একদল প্রার্থীর বাসনা আমি পূর্ণ করেছি—"

কালকূট উত্তর দিলেন—"দেবি, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

"ক্ষিপ্রজঙ্ঘের শবদেহে আপনার যেমন প্রয়োজন ছিল, আরও অনেকের তেমনি প্রয়োজন আছে, সকলকেই আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যে তাদের প্রয়োজনও আমি মেটাব। আপনাদের প্রয়োজনের বৈচিত্র্যেই আমি আনন্দিত। এখনই একদল মক্ষিকা ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ক্ষতস্থানে বসে' আমাকে প্রচুর আনন্দ দান করে' গেল। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের দেহব্যবচ্ছেদ করে' আপনি যে তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন তাতেও আমি কম আনন্দিত হই নি। ওই দেখুন, আর একদল প্রার্থী বসে আছে,—"

কালকূট দেখিলেন অনতিদূরে কয়েকটি শৃগাল বসিয়া রহিয়াছে।

"এই শৃগালদের মুখে আপনি আত্মসমর্পণ করবেন?"

"আত্মসমর্পণ করেই আমি যে কৃতার্থ"

"দেবি, আমি কিন্তু এখনও তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিনি"

"কি ধরণের সিদ্ধি আপনি লাভ করতে চান বলুন। হস্ত ব্যবচ্ছেদ করে' আপনি কি পেলেন?"

"আমি যা পেয়েছি তা সবই প্রত্যাশিত। আমি আশা করেছিলাম অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে—"

"সে প্রত্যাশাও আপনার সফল হবে হয়তো। এই মানবদেহ

অসীম সম্ভাবনা পূর্ণ। ক্ষিপ্রজঙ্ঘের ব্যবচ্ছেদিত হস্তের মধ্যবর্ত্তী শিরাটি লক্ষ্য করুন। শিরাটি কি ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে না?"

কালকূট অবিলম্বে শিরাটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন যে সত্যই তাহা ক্রমশ স্ফীতকায় হইয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহা রজ্জুবৎ হইয়া উঠিল, তাহাতে বহুবর্ণের শল্ক সমাবিষ্ট হইল অবশেষে তাহা আর শিরা রহিল না, সর্পে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সেই সর্প মুহূর্ত্তমধ্যে ফণা বিস্তার করিয়া কালকূটকে সম্বোধনও করিল—"কালকূট, তুমি স্পষ্ট ভাষায় বল তুমি কি চাও। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আবির্ভাব তুমি কামনা করছ কেন? তাঁর একটা বিশেষ রূপ প্রত্যক্ষ করাই কি তোমার উদ্দেশ্য? না, আর কোনও উদ্দেশ্য আছে? সত্যভাষণ যদি কর তাহলে আমি তোমাকে সহায়তা করব"

"আপনি কে"

আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ কশ্যপ। পিতামহের আদেশে আমি তোমার প্রকৃত মনোভাব জানতে এসেছি। তুমি যদি তোমার প্রকৃত মনোভাব ব্যক্ত কর তাহলে তিনি তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন"

তিনি কি আমার মনোভাব জানেন না?"

"তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি সবই জানেন। কিন্তু তোমার মুখ থেকে তিনি তোমার অভিলাষ আমার মাধ্যমে শুনতে চান। তুমি নাগপুরী পাতাল পরিত্যাগ করে' এসেছ কেন? সেখানেও তো তপস্যার উপযোগী বহু স্থান ছিল"

কালকূট কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিলেন—"আমার পত্নী বর্ণমালিনীর অগোচরে আমি এ তপস্যা করতে চাই, নাগপুরীতে তা সম্ভব নয়"

"বর্ণমালিনী সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এই প্রমাণ করতে তুমি বেরিয়েছ,

বর্ণমালিনীকে এই কথা তুমি বলেও এসেছ, তা কি তাহলে মিথ্যা ?”

কালকূট বলিলেন—“আমি যা বলব তা বর্ণমালিনী টের পাবে না তো ?”

“না। তুমি নির্ভয়ে সত্যভাষণ কর”

“হ্যাঁ, তা মিথ্যা। আমি তাকে প্রতারণা করেছি”

“কেন”

“আমি যা কামনা করেছি তা সফল হলে' বর্ণমালিনী ক্ষেপে যাবে। ক্ষিপ্তা বর্ণমালিনীর প্রকোপে আমার জীবন ছারখার হয়ে যাবে তাহলে”

“আমি তো শুনলাম তুমি পিতামহের দর্শন কামনা করছ। পিতামহ যদি তোমাকে সত্যই দেখা দেন তাহলে বর্ণমালিনী ক্ষিপ্তা হয়ে উঠবে একথা কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। পিতামহকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়, বর্ণমালিনীই বা না হবে কেন। তুমি কি তাহলে পিতামহকে দর্শন করতে চাও না ?”

“পিতামহকেই আমি দর্শন করতে চাই”

“তাহলে বর্ণমালিনী রাগ করবে কেন বুঝতে পারছি না। বৎস কালকূট, তুমি সরলভাবে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর”

“আপনি আমার আদিপুরুষ পরম পূজনীয় কশ্যপ। আপনার কাছে আমি অকপটে সব কথা বলতে লজ্জিত হচ্ছি—”

“আমার শারীরিক সান্নিধ্যই কি তোমার লজ্জার কারণ হচ্ছে ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ”

“বেশ, আমি অশরীরী হচ্ছি। তুমি স্পষ্ট করে তোমার মনোভাব ব্যক্ত কর”

সর্প অন্তর্হিত হইল।

কালকূট শূন্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আমি মেঘমালতীকে চাই, তাই আমার এ তপস্যা। পিতামহ-অসম্ভবকে সম্ভব কর। শবদেহের মধ্যে একদিন আমি অসম্ভবকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাই আমি শবসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছি, স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলাম, মর্ত্যের মায়ানদীর পারে অবস্থিত সন্ধানলোকে আমি বিরাটকায় এক শবের সন্ধান পাব যদি আমি সেই মায়া নদী পার হতে পারি। বর্ণমালিনীর জিহ্বার সাহায্যে আমি সে নদী পার হয়েছি, বর্ণমালিনী আমাকে জিহ্বা বিস্তার করে' সহায়তা করেছে, কারণ তাকে বলেছি যে ত্রিভুবনে তারই রূপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যেই আমার তপস্যা। কিন্তু তুমি তো জান, পিতামহ, আমার তপস্যা মেঘমালতীর জন্য, তুমি আমার এ বাসনা চরিতার্থ কর। যতক্ষণ আমি সিদ্ধিলাভ না করি ততক্ষণ আমি প্রার্থনা করব, হে অসম্ভব-সম্ভব-কর্তা আদিজনক, তুমি প্রসন্ন হও—"

মহাশূন্যলোকে একটি শুভ্র মেঘখণ্ড ভাসিতেছিল, মনে হইতেছিল একটি প্রসন্ন শুভ্র হাস্য যেন মেঘরূপ ধরিয়াছে। সহসা তাহার উপর স্বর্ণালোক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বর্ণালোককে সম্বোধন করিয়া শুভ্র মেঘখণ্ড বলিল—"সরো, শুনলে তো?"

"শুনলাম"

"মানে, ও ক্রমাগত জ্বালাতন করবে। খেলনাটা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকবে ক্রমাগত। চল, আর দেরি করে' কি হবে? নেবে পড়ি। তুমি বায়ুরূপে বহন কর আমাকে"

"বহন করে' কোথায় নিয়ে যাব"

"সেই পদ্ম সরোবরে। তারা সেখানে পদ্মের পরাগ মাখছে ভ্রমরীর বেশ ধরে"

"চলুন"

বায়ুর বেগ বর্দ্ধিত হইল। শুভ্রমেঘ লীলায়িত গতিতে ধীরে ধীরে চক্রবাল রেখার পরপারে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

কালকূটের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিক কালো হইয়া গেল। সূর্য্যালোক অবলুপ্ত হইল না, কেবল তাহা কৃষ্ণাভ হইয়া হিংস্র হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল যেন অভূতপূর্ব্ব উপায়ে কোন ক্রূর বিষধরের নয়নের দৃষ্টি মূর্ত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। সেই কৃষ্ণাভ আলোকে কশ্যপ পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। কালকূট কশ্যপকে চিনিতে পারিলেন না, কারণ তিনি সর্পরূপে আসেন নাই, নীলাভ জ্বলন্ত শিখার রূপে আসিয়াছিলেন। সেই শিখা যখন কথা কহিয়া উঠিল তখনই কালকূট বুঝিতে পারিলেন। শিখা বলিল—"বৎস কালকূট, তোমার অকপট মনোভাব জ্ঞাত হয়েছি। এখনই পিতামহের নিকট গিয়ে তা আমি ব্যক্ত করব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। আমি লজ্জিত হয়েছি। নাগবংশের কুলতিলক শেষ-নাগ কেন যে সহোদরদের সংসর্গ বর্জ্জন করে' তপস্যায় দেহপাত করতে উদ্যত হয়েছিলেন তা এখন আমি বুঝতে পারছি। নাগ বংশীয়েরা ক্রূর, ও খল; তারা কুলাঙ্গার ও মন্দস্বভাব, তাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, তাদের তপস্যা তুচ্ছ বরলাভের জন্য। আমি সুর, অসুর, দৈত্য দানব নাগ পশুপক্ষী সকলেরই জনক, তাদের আচরণের নিন্দা বা গৌরব আমাকেই বহন করতে হয়, তাই আমি কঠিনপৃষ্ঠ কূর্ম্মরূপ ধারণ করে' থাকি। বৎস, তোমার এই কদর্য্য আচরণের জঞ্জাল-

স্তূপও আমি বহন করব। কিন্তু বৎস, তোমাকে অনুরোধ করছি তুমি পরিচ্ছন্ন হও, সত্যকে কামনা কর, সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে ধ্রুবকেই সন্ধান কর—"

কালকূট বলিলেন—"বর্ণমালিনী এবং মেঘমালতীর মধ্যে কে ধ্রুব—"

জ্বলন্ত শিখা ইহার কোন উত্তর দিল না। সহসা তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া পরমুহূর্ত্তে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কালকূট সবিস্ময়ে দেখিল এক পর্ব্বতাকার বিরাটকায় কূর্ম্ম দিগ্বলয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার বিশাল পৃষ্ঠে পরস্পর-বিরোধী বিভিন্ন বস্তুর বিচিত্র সমাবেশ। সে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। মণি-মাণিক্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, আবর্জ্জনা, কঙ্কাল, কর্দ্দম, সুদৃশ্য খাদ্য, বহুবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র, বিবিধ বর্ণের পুষ্পসম্ভার—একটা বিরাট জগৎ যেন। কালকূট বিস্ফারিত নয়নে সেই চলমান পর্ব্বতের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা সে দেখিতে পাইল কূর্ম্মপৃষ্ঠস্থ একটি নরকঙ্কাল ক্রমশ যেন জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে দেখিতে তাহা মেঘমালতীর রূপ পরিগ্রহ করিল। কালকূটের মনে হইল মেঘমালতী হস্ত সঙ্কেতে যেন তাহাকে আহ্বানও করিতেছে। স্বপ্নাচ্ছন্নবৎ সে অনুসরণ করিতে লাগিল।

১১

আকাশ যেখানে গিয়া কল্পলোকে মিশিয়াছিল সেখানে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র কিছুই ছিল না, বাতাসও ছিল না, আলোক তো ছিলই না। কল্পলোকের প্রগাঢ় অন্ধকার তথাপি স্পন্দিত হইতেছিল। নিরবচ্ছিন্ন একটি সুর সেই অন্ধকার জগৎকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন সেই অদৃশ্য সুরেই সেই অন্ধকার লোক বিধৃত হইয়া আছে; তাহার অণুপরমাণু যেন সেই সুর-স্পন্দনে স্পন্দিত হইতেছে। ক্রমশ একটি সুর ভাঙিয়া দুইটি হইল, একই যেন দুই বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। মনে হইতে লাগিল দুইটি সুর-রেখা সমান্তরালে যে অদৃশ্যলোকের উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে তাহারা বাঙ্ময় হইল।

"হে স্রষ্টা, তুমি আর একবার বল, কিসে তুমি প্রকৃত আনন্দ পাও"

"সৃষ্টিতে"

"সৃষ্টির অর্থ কি"

"অয়ি ছলনাময়ি, তুমিই তো আমার সর্ব্ব সৃষ্টির বাণী। সৃষ্টির অর্থ কি তোমার জানা নেই? না, এটা তোমার ছলনা"

"যদি ছলনাই হয় তাহলে তা-ও আপনার সৃষ্টি। কারণ আমি আপনারই বাণী। আমি আপনার সৃষ্টি-প্রেরণার ভাষা। কিন্তু সৃষ্টি মানে কি তা আমি জানি না"

"যা ছিল না তাই সম্ভব করাই সৃষ্টি। এতেই আমার আনন্দ"

"সৃষ্টি-রক্ষায় আপনার আনন্দ নেই ?"

"সৃষ্টি-রক্ষা বিষয়ে আমি উদাসীন"

"তাহলে আপনি বিষ্ণুকে সৃষ্টির হিসাব দাখিল করতে বলেছেন কেন"

"তাতেও একটা সৃষ্টি হবে"

"কি রকম সৃষ্টি"

"রস-সৃষ্টি"

সহসা দুইটি বিভিন্ন সুরের কলহাস্যে অন্ধকার আনন্দিত হইয়া উঠিল। তাহার পর একটা নীরবতা ঘনাইয়া আসিল। মনে হইতে লাগিল কল্পলোকের সেই নিবিড় অন্ধকার যেন তপস্যা-মগ্ন হইয়া গিয়াছে। নিবিড় অন্ধকার যেন নিবিড়তর হইতেছে, যুগ যুগান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। সহসা সেই মহাশূন্য আবার বাঙ্ময় হইয়া উঠিল।

"বাণী, কোথা তুমি"

"এই যে"

"আমাকে আর তুমি স্রষ্টা বলে সম্বোধন কোরো না"

"কেন"

"কারণ আমি স্রষ্টা নই। মানুষই স্রষ্টা। মানুষই তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে। তাদের কল্পনা আমাদের সৃষ্টি করছে, তাদের অনুসন্ধিৎসা আমাদের ধ্বংস করছে। আমি সেই সংশয়াচ্ছন্ন সত্য-সন্ধানীকে, তোমার আমার স্রষ্টাকে, যেন দেখতে পাচ্ছি। সে ধন চায় না, মান চায় না, স্তুতিনিন্দাকে গ্রাহ্য করে না, চায় শুধু সত্য—অর্দ্ধ-সত্য নয়, সম্পূর্ণ সত্য। তার সত্য সন্ধানের খেলা ঘরে আমরা তারই তৈরী খেলনা মাত্র। আমাকে স্রষ্টা বলে আর ডেকো না তুমি"

"আপনি কি চার্ব্বাক কালকূটদের কথা ভাবছেন ?"

"ওরা সত্য চায় না, ওরা চায় আত্মপ্রসাদ। সেই আলেয়ার পিছনে ছুটে ছুটে ওরা সব অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ওদের মধ্যেই সেই সত্য-সন্ধানী আছে যে দ্রষ্টা যে স্রষ্টা—

"আমি আপনি কেউ নই তাহলে"—

"আমি ওদের প্রেরণা, আর তুমি ওদের ভাষা। ওরা যেমন বদলাবে আমরাও তেমনি বদলাব। ওরাই কবি, আমরা ওদেরই সৃষ্টি"

"কিন্তু আপনি যে স্বৈরচর সৃষ্টি করলেন"

"তা ওদেরই কবির প্রেরণায়, ওদেরই প্রেরণাকে আমি রূপ দিয়েছি কল্পলোক। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় মানুষ হয়তো থাকবে না, আমরাও তখন থাকব না—"

"মানুষ থাকবে না কেন"

"যারা একান্তভাবে সত্যকে চায় তারা একদিন সত্যেই লীন হয়ে যায়, তাদের আলাদা অস্তিত্ব আর থাকে না। সত্য সৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না, বাণীরও প্রয়োজন নেই তার"

"এ অবস্থায় পৌঁছতে মানুষের কত দেরি আছে"

"অনেক দেরি। হয়তো কোনও দিনই কেউ পৌঁছবে না। কিন্তু সম্ভাবনা আছে ওদেরই—"

"যতদিন না পৌঁছচ্ছে ততদিন"—

"ততদিন এস আমরা খেলা করি দেব-দৈত্য, দানব-মানবদের কামনা নিয়ে। ভবিষ্যৎ যুগের এক চার্ব্বাকের ছবি তুমি দেখাবে বলেছিলে—"

"চলুন তাহলে নিয়ে যাই আপনাকে ভবিষ্যৎ যুগের কবির মানসলোকে"। কিন্তু উপস্থিত যে চার্ব্বাকটি ঝোপের ভিতর বসে আছে তার গতি কি হবে"

"তাতো আমি এখনও জানি না। ওর নব প্রেরণায় যে নবব্রহ্মা সৃষ্টি হবে সেই চালিত করবে ওকে—"

সহসা সেই কল্পলোকে এক আর্ত্তকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল—"পিতামহ, পিতামহ, গরুড় আমাকে ত্যাগ করে' যাচ্ছে, আমি অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাকে রক্ষা করুন—"

পিতামহ বলিলেন—"চল! নাটক করা যাক্—"

১২

পিতামহের কল্পলোকের মহাশূন্যে বর্ত্তমান সহসা ভবিষ্যতে পরিণত হইল। সেই সহসা-সৃষ্ট ভবিষ্যযুগের রঙ্গমঞ্চে ধীরে ধীরে যে লীলা নাটক তাঁহার মানস-লোকে মূর্ত্ত হইল তাহার অসম্ভব আবাস্তবতায় তিনি নিজেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল সত্যই যদি এই অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিতেন—কি অদ্ভুত কাণ্ডই না হইত! কিন্তু তিনি জানেন সৃষ্টিকর্ত্তাও স্বাধীন নহেন, তিনিও নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। সুদক্ষ যাদুকরের মতো স্বৈরচর সৃষ্টি করিয়া তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে বিস্মিত করিতে পারেন, বীণাপাণিকে আনন্দিত করিতে পারেন, নিজের কল্পনা-বিলাসে বিভোর হইয়া অসম্ভব-সৃষ্টি-সম্ভাবনায় মগ্ন থাকিতে পারেন, কামনাতুর চার্ব্বাক-কালকূটদের ভোজবাজি দেখাইয়া বিভ্রান্ত করিতে পারেন, কিন্তু সত্যই তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন না। করিতে পারেন না বলিয়া কিন্তু পিতামহের দুঃখ হইতেছিল না। বরং তাঁহার মনে হইতেছিল বাস্তব-অবাস্তবের প্রভেদ তো অনুভূতির তারতম্য মাত্র। চক্ষুহীনের চেতনায় আলোক অবাস্তব, বর্ণসমারোহ অর্থহীন। তাঁহার মানস-লোকেই যদি তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন, সত্যই যদি অমূর্ত্ত

মূর্ত্ত হইয়া ওঠে, বস্তুলোকের মানদণ্ডে তাহার মহিমা না-ই বা ধরা পড়িল। তিনি নিজে আনন্দিত হইতেছেন ইহাই তো যথেষ্ট।

…নাটক সুতরাং জমিয়া উঠিয়াছিল। পিতামহ সত্যই পিতামহ সাজিয়া বসিয়াছিলেন। আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু, আস্কন্ধ-বিলম্বিত পক্ক কেশদাম, শুভ্র উত্তরীয়, নিষ্কলুষ কাবায় বস্ত্র তাঁহাকে সনাতন পিতামহের মহিমা দান করিয়াছিল। তাঁহার বাম পার্শ্বে ছিল রত্নখচিত অহিফেনের কৌটা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে ছিল সুবর্ণনির্ম্মিত বৃহৎ একটি গড়গড়া। দুগ্ধধবল বিরাট তাকিয়ায় ঠেস দিয়া পিতামহ নিমীলিত-নয়নে তাম্রকূট সেবন করিতেছিলেন। গলা খাঁকারির শব্দ পাইয়া তিনি চক্ষু খুলিলেন। দেখিলেন, স্বয়ং বিষ্ণু তাঁহার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া আছেন।

বিষ্ণু। পিতামহ, অতিশয় বিপন্ন হয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আমার বাহন গরুড় সহসা মানব-মূর্তি পরিগ্রহ করে' তার জননীর কাছে ফিরে গেছে। হর্ষ-নীড় নামক গ্রামে বাস করছে তারা। আপনি হয় আমাকে আর একটি বাহন সৃষ্টি করে দিন, না হয় গরুড়কে আবার আমার কাছে ফিরে আসতে আদেশ করুন। আপনার কথা সে অগ্রাহ্য করতে পারবে না।

পিতামহ। আমি কিছু করব না। আমি চটেছি। বহুকাল থেকে তুমি তোমার কাজে ফাঁকি দিচ্ছ। গরুড়ের পিঠে চড়ে' কমলিকে বাঁ পাশে নিয়ে তুমি আকাশে আকাশে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ কেবল। কাজকর্ম্ম কিছুই করছ না।

বিষ্ণু। আপনার মুখে একথা শুনব প্রত্যাশা করি নি। নিখিল বিশ্বের কল্যাণ কামনায় অহোরাত্র আমি ব্যস্ত। এক মুহূর্ত্ত আমার বিশ্রাম নেই।

পিতামহ। (অধীর ভাবে) ওসব একদম বাজে কথা। তোমার

অক্ষমতা ক্রমশই প্রকট হয়ে পড়ছে বিষ্ণু। কথা ছিল আমি সৃষ্টি করব, তুমি রক্ষা করবে। তা কি তুমি করছ?

বিষ্ণু। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি পিতামহ।

পিতামহ। এর নাম চেষ্টা করা? আদিম যুগে আমি যে সব বিশাল সমুদ্র, বিরাট পর্ব্বত, দিগন্তপ্রসারী তুষারপ্রান্তর সৃষ্টি করে-ছিলাম তার চিহ্ন পর্য্যন্ত আছে আর?

বিষ্ণু। আপনি একটা কথা বিস্মৃত হচ্ছেন পিতামহ। আপনি নিজেই যে নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে দিলেন হঠাৎ একদিন। সব উলটে পালটে গেল, মহেশ্বর তাই সুবিধে পেলেন

পিতামহ। কিন্তু তুমি কি করছিলে? মহেশ্বরকে রুখলে না কেন তুমি? তোমার পালন করবার কথা না?

বিষ্ণু। ন্যায্য কারণ ঘটলে মহেশ্বরকে রোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই যে পিতামহ। আপনি নক্ষত্রাদির পরিবেশ বদলে না দিলে—

পিতামহ। (ধমক দিয়া) আরে, কি বিপদ! বড় শিল্পী মাত্রেই নিজের রচনার একটু আধটু অদল বদল করে' থাকে, তাই বলে' সব উড়িয়ে দিতে হবে! গোড়ার যুগে আমি যে সব অপূর্ব্ব উদ্ভিদ, অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি করেছিলাম সব উপে গেল ওই জন্যে? ওসব কিছু শুনতে চাই না। হিসেব দাখিল কর তুমি

বিষ্ণু। কোন যুগের হিসেব চাইছেন আপনি? প্রোটারোজোয়িক না আর্লি প্যালিয়োজোয়িক?

পিতামহ। কি বললে?

বিষ্ণু। প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক। মানে—

পিতামহ। ওসব আবার কি কথা!

বিষ্ণু। মানুষেরা আপনার বিভিন্ন যুগের সৃষ্টির বিভিন্ন নামকরণ করেছে কি না!

পিতামহ। মানুষেরা! তাই না কি। কি রকম, কি কি নাম শুনি

বিষ্ণু। অ্যাজোয়িক, প্রোটারোজোয়িক, আর্লি প্যালিয়োজোয়িক, লেটার প্যালিয়োজোয়িক, ক্যাইনোজোয়িক—

[বিষ্ণু দ্বারের দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। উর্ব্বশী আসিয়া প্রবেশ করিল]

উর্ব্বশী। [মধুর হাসিয়া] অর্দ্ধ-স্ফুট পারিজাতের নব পরাগে প্রতি প্রভাতে যে ললিত সুষমা জাগে, তাকেই আজ মূর্ত্ত করেছি একটি রাগিণীতে। শুনবেন পিতামহ ?

পিতামহ। কাজের কথা হচ্ছে, ভ্যান ভ্যান কোরো না এখন, যাও

[উর্ব্বশী বিষ্ণুর দিকে চাহিয়া বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া অপসৃতা হইল]

পিতামহ। মানুষ কোন যুগে আছে ?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক যুগে। মানুষ আবার নিজের যুগকে নূতন নানা নামে ভাগ করেছে। আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক —

পিতামহ। দৈত্যেরা কোন যুগে আছে ?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িক

পিতামহ। দেবতারা ?

বিষ্ণু। ক্যাইনোজোয়িকই বলতে হয়

পিতামহ। রাম রাবণ চার্ব্বাক প্রহ্লাদ সবাইকে এক গোয়ালে পুরেছে। ধাষ্টামো যত

বিষ্ণু। স্তন্যপায়ী জীবমাত্রকেই ওরা এক যুগে ধরেছে। কিন্তু সভ্যতার প্রগতি হিসাবে ওই যে বললাম, আর্লি প্যালিয়োলিথিক, লেটার প্যালিয়োলিথিক—

পিতামহ। ধাষ্টামো, ধাষ্টামো, সব ধাষ্টামো। তুমি এই সব বাজে খবর সংগ্রহ করে' সময় নষ্ট করেছ খালি। তোমার আসল কর্ত্তব্য ছিল সৃষ্টি রক্ষা করা, সেইটিই কর নি কেবল

বিষ্ণু। যথাসাধ্য করেছি বই কি পিতামহ

পিতামহ। কিচ্ছু কর নি

বিষ্ণু। এ কথা বলছেন কেন পিতামহ, আপনার সৃষ্টি তো এখনও আছে—

পিতামহ। আমি যে সব মহাকাব্য সৃষ্টি করেছিলাম, কোথায় সে সব? বহু যোজনব্যাপী বিশাল দেহ সরীসৃপ, দ্বীপাকৃতি কূর্ম্ম, দিগন্তবিস্তৃত-পক্ষধারী বিহঙ্গম, পর্ব্বতপ্রমাণ রোমশকায় হস্তী, কোথায় তারা? গোটাকতক ছুঁচো ফড়িং আর চামচিকে বাদে সব তো লোপাট হ'য়ে গেছে

বিষ্ণু। তার জন্যে আমাকে মিছিমিছি দোষ দিচ্ছেন। আমি চেষ্টার কসুর করেছি কি? কিন্তু কিছুতেই রাখা গেল না, কি করব বলুন। আপনার মহাকাব্যগুলি যে বড় বেশী রকম অমিত ছিল পিতামহ। বিরাট পাখী, বিরাট তার ঠোঁটের ভিতরও আবার বড় বড় দাঁত—

পিতামহ। আমি কি তোমার ফরমাশ অনুযায়ী সৃষ্টি করব না কি।

বিষ্ণু। আজ্ঞে না, আমি তা বলছি না

পিতামহ। তবে ও কথা বলবার মানে?

বিষ্ণু। মানে, আমি বলছি কিছুতেই রাখা গেল না ওদের। নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি করে' গেল কিছু কিছু, গেল প্রাকৃতিক প্রভাবে—

পিতামহ। কিন্তু তুমি করছিলে কি! তোমার কর্ত্তব্য ছিল তাদের রক্ষা করা

বিষ্ণু। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নি। প্রত্যেকবার অবতার হয়ে তাদের মধ্যে জন্মেছি আদর্শ স্থাপন করবার জন্যে। কূর্ম্ম মৎস্য বরাহ রূপ ধারণ করে' অসীম কষ্ট সহ্য করেছি কাদায়, জলে, বনে-বাদাড়ে। সে যে কি অসহ্য কষ্ট—

পিতামহ। মজাও কম লোট নি। কৃষ্ণলীলার অজুহাতে বৃন্দাবনে তুমি যে রকম স্ফূর্ত্তি উড়িয়েছ (সহসা) অথচ যদুবংশটাকে রাখতে পারলে না। একটি মুষল জুটিয়ে—আঃ। একটু দুরন্ত দামাল কিছু হলেই অমনি মহেশটাকে ডেকে ধ্বংস, ধ্বংস আর ধ্বংস! ওই এক শিখেছ [চীৎকার করিয়া] ওই গুণ্ডটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে' আমার সমস্ত সৃষ্টি তছনছ করেছ তুমি—

[বিষ্ণু কাতরভাবে পুনরায় দ্বারের দিকে চাহিলেন। যে সিনেমা-তারকাটি মর্ত্ত্যলোক অন্ধকার করিয়া সম্প্রতি দেবলোকে উত্তীর্ণা হইয়াছেন, তিনি প্রবেশ করিলেন। ভাত-খেকো ভুঁড়িদার চেহারা। বিষ্ণুর বিশ্বাস ছিল আধুনিকা বলিয়া ইহার সম্বন্ধে পিতামহের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে বিশ্বাস কিন্তু ভূলুণ্ঠিত হইল]

পিতামহ। [রুক্ষকণ্ঠে] তুমি এখানে ঘুরঘুর করছ কেন?

সিনেমা-তারকা। [সসঙ্কোচে] আপনার আফিঙের কৌটতে আফিঙ আছে কি না দেখতে এসেছি। ভাবলুম, সন্ধ্যে হয়ে গেছে

পিতামহ। সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও এখান থেকে। ফক্কড় কোথাকার—

[সিনেমা-তারকা মুখ ফিরাইয়া হাস্য গোপন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন]

বিষ্ণু। আপনার অহিফেন-সেবনের সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হয়েছে পতামহ

পিতামহ। ওসব চালাকি রেখে দাও হিসেব চাই আমি

বিষ্ণু। হিসেব কি করে' দোব তা তো বুঝতে পারছি না

পিতামহ। তা বুঝতে পারবে কেন! [সগর্জ্জনে] আমি আজ পর্য্যন্ত যত কিছু সৃষ্টি করেছি, তার পাই পয়সা নিখুঁত হিসেব চাই

বিষ্ণু। এ যে অসম্ভব কথা বলছেন পিতামহ। আপনার সৃষ্টি অনন্ত—

পিতামহ। শুধু অনন্ত নয়, অপরূপ, বিচিত্র, বিস্ময়কর। তুমি আর ময়শা মিলে গোল্লায় দিয়েছ সব। আবার না কি যুদ্ধ বাধবে শুনছি। ময়শা আবার না কি লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর করব না। হিসেব দাও। তোমার উপর রক্ষা করবার ভার দিয়েছিলাম, পাই-পয়সা হিসেব বুঝিয়ে দাও আমাকে।

বিষ্ণু। কি মুশকিল। হিসেব কি করে দোব বলুন। নানা বিবর্ত্তনে—

পিতামহ। হিসেব দিতে তুমি বাধ্য।

[বিষ্ণু কি যে বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না]

পিতামহ। কথার জবাব দিচ্ছ না যে

বিষ্ণু। সেদিন একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হল, তাঁকেই না হয় ডেকে আনি, তিনি সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক খবর বলতে পারবেনা।

[পিতামহকে কথা বলিবার অবসর না দিয়া বিষ্ণু চলিয়া গেলেন এবং হেকেলকে লইয়া প্রবেশ করিলেন]

পিতামহ। এ কে?

বিষ্ণু। ইনি একজন বড় বৈজ্ঞানিক; (হেকেলকে) বলুন—

হেকেল। (সবিনয়ে) আমি অবশ্য খুব বেশী জানি না। ফসিলে মিসিং লিংক্‌সের যে সব প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম তার থেকে আমি মানুষ আর অ্যানথ্রোপয়েডস্‌দের একটা যোগসাধন করবার চেষ্টা করেছিলাম

পিতামহ। (বিষ্ণুকে) বাজে ধাপ্পা দিয়ে আমার কাছে পার পেয়ে যাবে ভেবেছ

বিষ্ণু। আজ্ঞে ধাপ্পা নয়, ফসিলেই আপনার সৃষ্টির ইতিহাস নিহিত আছে

পিতামহ। ফসিল? সে আবার কি!

হেকেল। ভূস্তরে মৃত প্রাণীদের যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, তার নাম ফসিল। কোথাও হয়তো একটা দাঁত পাওয়া গেছে, কোথাও বা মাথার খুলির খানিকটা, কোথাও হয়তো পায়ের এক টুকরো হাড়, কোথাও—

পিতামহ। [যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] অ্যাঁ, আমার সৃষ্টির এই দুর্দ্দশা হয়েছে না কি! কোথাও একটা দাঁত, কোথাও একটা মাথার খুলি, আর তাই শোনাচ্ছ আমাকে এসে।

হেকেল। এই সব থেকে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তা হচ্ছে—

পিতামহ। [সহসা ফাটিয়া পড়িলেন] বেরোও এখান থেকে, বেরোও, বেরিয়ে যাও।

[হেকেল দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন]

বিষ্ণু। পিতামহ, ধৈর্য্য রক্ষা করুন। শুনুন—

[পিতামহ এতক্ষণ একমুখ ছিলেন, সহসা চতুর্ম্মুখ হইয়া গেলেন]

পিতামহ। [চতুর্ম্মুখ একসঙ্গে] মূর্খ, ভণ্ড, ক্রূর, শঠ।

বিষ্ণু। শুনুন

পিতামহ। অস্পৃশ্য, নারকী, দুরাত্মা, দুর্ম্মতি

বিষ্ণু। পিতামহ, পিতামহ

পিতামহ। দুঃশীল, পাপাশয়, নীচমনা, বিভীষণ

বিষ্ণু। [অতিশয় শশব্যস্ত] শুনুন, শুনুন পিতামহ—

[অতঃপর পিতামহ প্রাকৃত ভাষা শুরু করিলেন]

পিতামহ। জালিয়াত, ধড়িবাজ, লম্পট, স্বার্থপর—

[পিতামহের অষ্ট নয়নে ক্রোধবহ্নি ধকধক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নিরুপায় বিষ্ণু শেষে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন ও পিতামহের দুই পত্নী দেবসেনা, দৈত্যসেনাকে ডাকিয়া আনিলেন]

দৈত্যসেনা। ভীমরতি হয়েছে মুখপোড়ার—

দেবসেনা। [বিষ্ণুকে] আমরা পেরে উঠব না। ডাক্তার ডাক। দু'জন বিলেত-ফেরত ডাক্তার স্বর্গে এসেছেন সম্প্রতি, তাঁদেরই ডেকে আন। বেশ ছেলে দুটি—

পিতামহ। [সগর্জ্জনে] দূর হও, ধুমসি, মুটকি, ধ্যাদ্ধেড়ে, ধুকড়ি—

[দেবসেনা দৈত্যসেনা চলিয়া গেলেন। বিষ্ণু ত্বরিত-গতিতে গিয়া ডাক্তার দুইজনকে ডাকিয়া আনিলেন]

প্রথম ডাক্তার। এখানে টেরামাইসিন পাওয়া যাবে কি

দ্বিতীয় ডাক্তার। সালফানিলামাইড ট্রাই করলেও মন্দ হয় না।

পিতামহ। [ক্ষিপ্ত হইয়া] গুণ্ডা গাড়োল উল্লুক গাধা

প্রথম ডাক্তার। এ রাঁচির কেস মশাই। টেরামাইসিন দিলে—

দ্বিতীয় ডাক্তার। আমি কিন্তু একটা এনকেফালাইটিসে সালফানিলামাইড দিয়ে বেশ উপকার পেয়েছিলাম। ও মশাই, খড়ম তোলে যে চলুন চলুন—

[সন্ত্রস্ত হইয়া ডাক্তার দুইজন সরিয়া পড়িলেন। গালাগালি দিতে দিতে পিতামহের চতর্মুখ ফেনময় হইয়া গেল। নিরুপায় বিষ্ণু তখন যাহাকে পাইলেন তাহাকেই ডাকিয়া আনিলেন। সকলেই আসিলেন, কিন্তু কেহই কাছে যাইতে সাহস করিলেন না। সকলেই অবশ্য

পিতামহকে প্রশমিত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অপ্সরাগণ দূরে সারিবদ্ধ হইয়া কেহ মধুর হাস্য, কেহ বা কটাক্ষ দ্বারা মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাইলেন। কিন্নরদল গান গাহিতে লাগিলেন। স্বয়ং পবন আসিয়া চামর হস্তে লইলেন, বরুণ শীকর-স্নিগ্ধতা সৃজন করিলেন। বীণাপাণিও আসিয়াছিলেন, তিনিও বীণায় ঝঙ্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হাস্য-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি অতিশয় মধুর একটি রাগিণী আলাপ করিতে করিতে পিতামহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পিতামহের চতুর্ম্মুখ হইতে সমবেগে চারচারটি করিয়া গালি একসঙ্গে ছুটিতে লাগিল]

বিষ্ণু। [সকাতরে] শুনুন পিতামহ—

পিতামহ। দমবাজ, বদমাস, বেইমান, জোচ্চর—

[সহসা বিষ্ণু করজোড়ে বসিয়া পড়িলেন এবং অন্য সকলকে তাহাই করিতে ইঙ্গিত করিলেন]

পিতামহ। জঘন্য, অন্ত্যজ, পাপী, পাজি

সকলে। [সমস্বরে] হে ব্রহ্মা, হে পিতামহ, হে কমলযোনি চতুরানন, তুমি সর্ব্বতোমুখ বাগীশ্বর, সকলের বিধাতা তুমি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি

পিতামহ। ফক্কড়, ফাজিল, ডেঁপো—

সকলে। হে কবি, সৃষ্টিকর্ত্তা, সূর্য্য যেমন প্রসন্ন কিরণজাল বিস্তার করত কুজ্ঝটিকাকুল পদ্মবনকে পুলকিত করে, তুমিও তেমনি আলোক-শুভ্র প্রসন্নতা বিস্তার করিয়া দিশাহারা আমাদের চিত্তকে উদ্ভাসিত কর—

পিতামহ। নির্লজ্জ, নচ্ছার—

সকলে। [দ্বিগুণ উৎসাহে সমস্বরে] হে আদিকারণ, সৃষ্টির

পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই বিদ্যমান ছিলে। হে অজ, সলিলগর্ভে একদা যে অমোঘ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে তাহা হইতেই এই চরাচর বিশ্বসমুদ্ভূত হইয়াছে, হে ব্রহ্মরূপী, হে গুণাকর, হে অনন্ত সৃষ্টিনিধান, হে পিতামহ—

পিতামহ। যতো সব—

সকলে। [সমস্বরে] হে জগৎপতি ; তুমি ঋষি, তুমি সুখ, তুমি জ্ঞান, তুমি প্রজাপতি, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি যুবাশ্রেষ্ঠ, তুমি অমিতবল, তুমি অমৃত, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমিই স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমিই সর্ব্বোত্তম, তুমিই পরিত্রাণস্থান, সর্ব্বপ্রকার কল্পনার আকর, হে আদীশ্বর তোমা ভিন্ন কাহারও গতি নাই, হে দেবোত্তম, হে মূলাধার—

এই ভাবে সকলে তারস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ প্রার্থনা চলিবার পর দেখা গেল পিতামহের চতুরাননে হাসি ফুটিয়াছে এবং তিনি আফিঙের কৌটা খুলিতেছেন।

বিষ্ণু। [করযোড়ে] পিতামহ, গরুড়কে ফিরিয়ে দিন

পিতামহ। এদের সবাইকে চলে যেতে বল, তোমার সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করবার আছে—

[বিষ্ণুর ইঙ্গিতে সমাগত দেবদেবীরা অন্তর্দ্ধান করিলেন]

বিষ্ণু। কি বলুন

পিতামহ। আমরা কোথায় আছি জান ?

বিষ্ণু। স্বর্গলোকে

পিতামহ। কবিদের কল্পনায়। কবিরাই আমাদের স্রষ্টা। সম্প্রতি একদল যুক্তিবাদী ঋষি পদে পদে সেই কবিদের অপদস্থ করছে। কবিরা যদি লোপ পায়, তাহলে আমরাও লোপ পাব। সুতরাং কবিদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বৈদিক ঋষিরা একদা ভূর্লোক,

ভূবর্লোক, স্বর্লোক সৃষ্টি করেছিলেন ; অগ্নির জ্বলন্ত শিখায় পবিত্র হবিঃ দান করে দেবতাদের মূর্ত্ত করেছিলেন। সেই বৈদিক ঋষিরা আজকাল বিপন্ন হয়েছেন চার্ব্বাক নামক এক অর্ব্বাচীন যুবকের যুক্তিজালে। বীণাপাণি চেষ্টা করেছিলেন তাকে মোহাচ্ছন্ন করতে। কিন্তু সফল হন নি। অলৌকিক নানারকম দৃশ্য দেখে চার্ব্বাক বিস্মিত হয়েছে, কিন্তু যুক্তিভ্রষ্ট হয় নি। আচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে তার যুক্তি আঁকড়ে বসে আছে। শক্তিশালী গরুড়কে তাই লাগিয়েছি এবার। চার্ব্বাককে কাবু করতেই হবে। তা না করতে পারলে আমরা গেলাম। তুমিও লেগে পড়, মহেশকেও ডাক

বিষ্ণু। আমাদের কি করতে হবে

পিতামহ। চার্ব্বাকের কাছে আমাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। হর্ষনীড় গ্রামে গরুড়কে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি, তোমরাও যাও

বিষ্ণু। আর আপনি ?

পিতামহ। আমি তো যাবই। কিন্তু আমি আড়ালে থাকব

বিষ্ণু। দেবী বীণাপাণি চার্ব্বাককে কি ভাবে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন ?

পিতামহ। দেবী বীণাপাণির আজকাল নূতন একটা [illegible]ই চেগেছে। তিনি মানুষের অবচেতনলোকে ঢুকে কি সব যেন করেছেন। চার্ব্বাকের অবচেতনলোকেও তিনি নানারকম কারিকুরি করেছিলেন, কিন্তু কিচ্ছু হয় নি, তার নাস্তিকাবুদ্ধি বেশ টনটনে আছে। ওসব সূক্ষ্ম কারিকুরির মর্ম্ম চার্ব্বাক বুঝবে না। ওর কাছে স্থূল ব্যাপারের অবতারণা করতে হবে। অসম্ভব স্বপ্নকে সত্য বলে' ও কোনদিনই মানবে না, সে শক্তিই ওর নেই। ধরবার ছোঁবার মতো একটা বাস্তবিক কিছু হাজির করতে হবে ওর কাছে। সুরঙ্গমা নাম্নী এক নর্ত্তকীকে ভোলাবার জন্যে

ও মনে মনে ব্যগ্র হয়ে আছে। সেই রন্ধ্র পথে ঢুকে দেখ যদি কিছু করতে পার—

বিষ্ণু। বেশ, সেই চেষ্টাই করি তাহলে

পিতামহ। হ্যাঁ, যাও

রঙ্গমঞ্চে যবনিকা-পাত হইল।

ক্ষণপরেই দেখা গেল মর্ত্ত্যের এক গহন কান্তারে বিশাল এক ময়ূর পেখম বিস্তার করিয়া একটি তন্বী ময়ূরীকে মুগ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

১৩

প্রখর সূর্য্যালোকে চার্ব্বাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু খুলিয়া প্রথমেই সে দেখিতে পাইল আলুলায়িত-কুন্তলা নীলোৎপলা ভ্রূভঙ্গী সহকারে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। নীলোৎপলাই প্রথমে কথা কহিল।

"আপনি যে ঘরে শয়ন করেন সেই ঘরের কোণে একটি ভাণ্ডে সুরা ছিল, তা কি আপনি পান করেছেন ?"

চার্ব্বাক সবিস্ময়ে উঠিয়া বসিল। তাহার হৃদয়ের ভার লঘু হইয়া গেল। এতক্ষণ সে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল তাহা যে সুরা-জনিত অলীক স্বপ্ন নিমেষের মধ্যে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া সে আত্মস্থ হইল, সূর্য্যালোক-স্পর্শে কুজ্ঝটিকার রহস্যলোক যেন বিলীন হইয়া গেল।

নীলোৎপলা অধীর ভাবে পুনরায় প্রশ্ন করিল—"বলুন, আপনি কি তা পান করেছেন ?"

"করেছি। ওই ভাণ্ডে আমি নিজের জন্য পানীয় জল রাখতাম। কাল দেখলাম জলের পরিবর্ত্তে সুরা রয়েছে। মনে হল আমার

শ্রান্তি অপনোদন করবার জন্যে তুমিই হয় তো তাতে সুরা রেখে দিয়েছ। নারীরা স্বভাবতই করুণাময়ী, আর তুমি তো নারী-শ্রেষ্ঠা—"

"আমিই আপনার জলভাণ্ডে সুরা রেখেছিলাম। কিন্তু ঠিক করুণাবশত রাখিনি। আমার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। কাল আপনি যখন রাত্রে ফিরলেন না তখন বড় ভাবনা হয়েছিল আমার। নিজেই তাই আজ সকালে আপনার সন্ধানে বেরিয়েছি, আপনাকে জীবিত দেখে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি কি সমস্ত রাত এই মাঠেই পড়েছিলেন?"

"আমার দেহটা হয় তো ছিল, কিন্তু আমার মন—"

সহসা চার্ব্বাক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, নীলোৎপলার দুই হস্ত ধরিয়া প্রদীপ্ত নয়নে কহিল,—"ভদ্রে, গতরাত্রে আমি এক আশ্চর্য্য জীবন যাপন করেছি"

"কি রকম"

কাল সমস্ত রাত্রি আমি এমন এক রূপকথালোকে বিচরণ করেছি যেখানে অসম্ভব সম্ভব হয়, যেখানে বাস্তবে অবাস্তবে কোনও প্রভেদ নেই, যেখানে অলীক এবং বাস্তব অভিন্ন। প্রভেদ নির্ণয় করবার উপায় নেই। আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছিল হয় তো আমি পাগল হয়ে গেছি—"

চার্ব্বাকের কথা শুনিয়া নীলোৎপলার মুখমণ্ডল আনন্দোদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

"বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ তাহলে মিথ্যাভাষণ করেন নি দেখছি। যে সুরা তিনি আমাকে দিয়েছেন তা প্রকৃতই তাহলে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। আপনার উপর ওই সুরার প্রভাব পরীক্ষা করবার জন্যই আমি আপনার জলভাণ্ডের জল ফেলে দিয়ে তাতে সুরা রেখেছিলাম। আপনার বিশেষ কোনও কষ্ট হয় নি তো? চলুন, স্বহস্তে আমি

আপনাকে আজ ভোজ্য পানীয় প্রস্তুত ক'রে দেব। আহারাদি ক'রে আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আজ আর আপনাকে মাটি কাটতে যেতে হবে না।"

"ভদ্রে, আমার সঞ্চিত অর্থ তো কিছু নেই। প্রতিদিন পরিশ্রম না করলে—"

"আজ অন্তত আপনি বিশ্রাম করুন। আপনার আজকের পারিশ্রমিক আমিই দেব। আর ওই সুরা-প্রভাবে যদি ধনকুবের মহাশকুন্তকে সম্মোহিত করতে পারি তাহলে কোনদিনই হয়তো আপনাকে আর অর্থোপার্জ্জনের জন্য কায়িক পরিশ্রম করতে হবে না।"

"ধনকুবের মহাশকুন্ত ব্যক্তিটি কে"

"তিনি এ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠী একজন"

"সুরা-প্রভাবে তাকে সম্মোহিত করতে হবে কেন। তোমার সান্নিধ্যই কি যথেষ্ট নয়?"

"মহাশকুন্ত ধনকুবের কিন্তু জরাগ্রস্ত স্থবির"

"ও—"

"চলুন সব কথা বলছি আপনাকে। বাড়ী চলুন"

নীলোৎপলা বলিতেছিল—"কোনও নির্ভরযোগ্য পুরুষকে বিবাহ করে' গৃহস্থালি স্থাপন করাই সাধারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে নিরাপদ পথ। যারা তা করতে পারে তারা ভাগ্যবতী। কিন্তু আমি দুর্ভাগিনী, তাই আমাকে নিত্য নব-পুরুষের মনোরঞ্জন করে' জীবিকানির্ব্বাহ করতে হয়। বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ আমার এখানে আসেন মাঝে মাঝে। তিনি আমার দুঃখ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই তিনি সহস্র খদ্যোতের নির্য্যাস রক্তকমলের মধু, মহুয়া ও আরও নানাপ্রকার উপকরণ দিয়ে

এই অদ্ভুত সুরা প্রস্তুত করে' আমাকে দিয়েছেন। বলেছেন এই সুরা প্রভাবে আমি নিজের পছন্দমত যে কোনও ব্যক্তিকে বশীভূত করতে পারব"

"কেন, এ সুরার বিশেষ গুণ কি—"

"এতে মানুষের কল্পনাশক্তি বেড়ে যায়। এ সুরা পান করলে দুর্ব্বলও নিজেকে সবল মনে করে। ভাবে তার দুরাকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হচ্ছে। মনে মনে সে যা হ'তে চায় এ সুরা প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য তা হতে পারে"

নীলোৎপলার কথা শুনিতে শুনিতে চার্ব্বাক সবিস্ময়ে ভাবিতেছিল আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা কি আমার ছিল কোনদিন? বৈদিক পণ্ডিতদের অলৌকিক কাব্যকাহিনী আমার মনে যে কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাই হয়তো সুরা-প্রভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্যাবলীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি আমি···চার্ব্বাক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। নীলোৎপলা তাহার ব্যর্থজীবনের কাহিনী বলিয়া চলিয়াছিল, তাহার কথা চার্ব্বাকের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল বটে কিন্তু হৃদয়-স্পর্শ করিতেছিল না। সহসা নীলোৎপলার একটি প্রশ্নে চার্ব্বাকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল।

"আমি আপনাকে পারিশ্রমিক স্বরূপ পাঁচটি সুবর্ণ মুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি। আমার একটি কাজ ক'রে দেবেন আপনি?"

"বল কি কাজ"

"আমার একটি আলেখ্য এবং লিপিকা মহাশকুন্তের কাছে পৌঁছে দিন"

"কোথায় থাকেন তিনি?"

"নবীনা গ্রামে। যে প্রান্তরে আপনি কাল সমস্ত রাত্রি ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সেই প্রান্তরের পশ্চিম দিকে একটি পথ আছে। সেই পথ ধরে' দক্ষিণ দিকে কিছুদূর গেলে আপনি একটি তরুবীথিকা দেখতে পাবেন। বকুল, চম্পক এবং কৃষ্ণচূড়া ছাড়া আর কোনও গাছ সেই বীথিকায় নেই। সেই বীথিকা অনুসরণ করে' কিছুদূর অগ্রসর হলেই আপনি শ্রেষ্ঠী মহাশকুন্তের হর্ম্ম্য দেখতে পাবেন। সেই হর্ম্ম্যের শিখরদেশে দেখবেন বিরাট এক সুবর্ণ কলস শোভা পাচ্ছে। চিনতে কষ্ট হবে না আপনার—"

একজন বার-বনিতার প্রণয়-দৌত্য করা কোনও ভদ্রলোকের পক্ষে আত্মসম্মান-হানিকর কি না এ প্রশ্ন চার্ব্বাকের বিবেককে বিব্রত করিল না। অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া সে নীরব হইয়া রহিল।

"এ উপকারটি করবেন আমার?"

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে পুনরায় অনুরোধ করিল নীলোৎপলা।

"ভদ্রে, তোমার নিকট এ অঞ্চলের অনেক লোক তো প্রত্যহ আসে। তাদের কাউকে নিয়োগ না করে আমাকে তুমি নির্ব্বাচন করছ কেন বুঝতে পারছি না"

"আমার নিকট যারা আসে তারা দরিদ্র হলেও আমার প্রণয়া-কাঙ্ক্ষী। তাদের কারো কাছে এ প্রস্তাব করা অসম্ভব আমার পক্ষে। কথাটা তাদের কাছ থেকে আমি গোপনই রাখতে চাই। আপনার সঙ্গে আমার সে রকম কোনও সম্পর্ক নেই, তাছাড়া যদিও আমি আপনার সম্যক পরিচয় জানি না কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয় আপনি প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, কোনরূপ অবস্থা বিপর্য্যয়ে পড়ে আমার আশ্রয় নিয়েছেন। সেজন্য মনে করি আপনি যদি ভার নিতে সম্মত হন আমার কার্য্যটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে"

চার্ব্বাক হাসিয়া উত্তর দিল—"তোমার কথা শুনে তোমার তীক্ষ্ণ-

বুদ্ধির পরিচয় পেলাম। সত্যই আমি অবস্থা বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হয়েছি। তুমি যে কাজ করতে আমাকে অনুরোধ করছ তা আমি করব। আমি খুশী হব, যদি তুমি আমাকে এর জন্য দশটি সুবর্ণ মুদ্রা দাও। দশটি সুবর্ণ মুদ্রা পেলে আমি আবার ভদ্রভাবে কোথাও গিয়ে জীবন আরম্ভ করতে পারব"

নীলোৎপলা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। ক্ষণ পরে সে দশটি সুবর্ণ মুদ্রা, হস্তীদন্তের উপর নিপুণভাবে অঙ্কিত একটি আলেখ্য এবং পুষ্পরেণু সুবাসিত একটি লিপি চার্ব্বাকের হস্তে দিয়া বলিল—"আপনার দৌত্যের উপর আমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মহাশকুন্তকে যদি বশীভূত করতে পারি আপনার ভবিষ্যতের ভাবনাও আর থাকবে না—"

"আমি এখানে বেশী দিন থাকব না ভদ্রে। তোমার এ কার্য্যটি সম্পন্ন করে' অন্যস্থানে যেতে হবে আমাকে। যে অর্থের অভাবে আমি যেতে পারছিলাম না সে অর্থ তুমি আমাকে দিয়েছ। আর আমার এখানে থাকবার বাসনা নেই। তবে তোমার কাজটি আমি সুসম্পন্ন করে' দেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তোমার লিপিটি বেশ দীর্ঘ মনে হচ্ছে—"

নীলোৎপলা আনত নয়নে বলিল—"কবি শশাঙ্কের 'মিলনোৎকণ্ঠা' নামক কবিতাটির ভাবানুবাদ করে' দিয়েছি আমি নিজের ভাষায়"

"আমার পরামর্শ যদি শোন, তাহলে তুমি নিজের ভাষায় নিজের ভাবই ব্যক্ত কর। আর সেটা কর সংক্ষেপে। মহাশকুন্ত সত্যই যদি স্থবির হয়ে থাকেন তাহলে দীর্ঘপত্র ক্লান্তিজনক হবে তাঁর পক্ষে। তাছাড়া কবি শশাঙ্কের কবিতাটি তিনি যদি পড়ে' থাকেন তাহলে তোমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা হবে না তাঁর—"

চার্ব্বাকের কথা শুনিয়া নীলোৎপলা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল।

"আমি কি লিখিব তাহলে বলে' দিন"

"শুধু লেখ, শুনেছি আপনি সুরসিক, তাই আপনার কাছে পাঠাচ্ছি শিল্পের সামান্য নিদর্শন। যদি গ্রহণ করেন কৃতার্থ হব। আরও কৃতার্থ হব, যদি কোনদিন আলাপের সুযোগ দেন—ইতি নীলোৎপলা"

"ওইটুকু লিখলেই হবে?"

"হবে। ইঙ্গিতময়ী রমণীরাই তো বিজয়িনী হয়। মনের কথা সম্পূর্ণভাবে খুলে বলতে নেই। তার আভাসমাত্রই ফলপ্রদ"

"বেশ, তাহলে আপনি যা বলছেন তাই করি"

নীলোৎপলা পাশের ঘরে গিয়া পুনরায় লিপিরচনায় মনোনিবেশ করিল।

১৪

ঘন নীল মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। মৃদু মৃদু মেঘগর্জ্জন দূরাগত মৃদঙ্গ-ধ্বনির মতো শুনাইতেছে। গহন কান্তারের ঘনশ্যাম শোভা ঘনতর হইয়া উঠিয়াছে। যে ময়ূরটি এতক্ষণ পেখম বিস্তার করিয়া তন্বী প্রিয়ার মনোরঞ্জনে ব্যাপৃত ছিল সে সহসা উচ্ছ্বসিত কেকারবে কানন-কান্তার মুখরিত করিয়া তুলিল। সেই কেকাধ্বনির তরঙ্গে তরঙ্গে সৃষ্টিকর্ত্তার আনন্দ মূর্ত্ত হইয়া উঠিল যেন। মনে হইল সেই ধ্বনির স্পন্দনে স্পন্দনে যেন সৃষ্টি প্রেরণার উল্লাস তরঙ্গিত হইতেছে। তাহারই সংঘাতে যেন নবোদিত নীল জলধরে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইল, কদম্ব-কেশরে শিহরণ জাগিল।

ময়ূররূপী পিতামহ কহিলেন—"সখি এই তো আনন্দ···কিন্তু···"

তন্বী ময়ূরী এতক্ষণ অন্যমনস্কতার ভাণ করিয়া শস্যকণা আহরণ করিতেছিল। পিতামহের কথা শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার অপাঙ্গে এক ঝলক হাসি ঝিকমিক করিতে লাগিল কেবল। সে ভাষায় কিছু বলিল না, তাহার হাস্যদীপ্ত অপাঙ্গ দৃষ্টিতেই যেন তাহার বক্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

"কথা বলছ না কেন বাণী"

"বলবার তো কিছু নেই"

"আমি এতক্ষণ কি করছিলাম জান ?"

"জানি"

"কি বলতো"

"নিজের খেয়ালে মত্ত ছিলেন"

"মত্ত নয়, উন্মত্ত ছিলাম। আমি কি কল্পনা করছিলাম জান ?"

"বলুন, শুনি—"

"আমি কল্পনায় এমন সব কাণ্ড করেছিলাম যে শুনলে অবাক হয়ে যাবে। বিশ্বকর্ম্মাকে বরখাস্ত করে' নিজেই স্বৈরচর সৃষ্টি করতে লেগে পড়েছিলাম। বিষ্ণুকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলাম, গরুড়কে মানুষ করে' পাঠিয়েছিলাম [illegible]-নীড় গ্রামে, মাতাল চার্ব্বাকটা মদের ঘোরে যে সব আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছিল আমি কল্পনা করছিলাম—তুমি বুঝি তার অবচেতনলোকে ঢুকে তাকে ওই সব স্বপ্ন দেখাচ্ছ, এ নিয়ে কল্পনায় তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করেছি। কশ্যপ, বিনতা, সপ্তর্ষি সবাইকে স্বৈরচর বানিয়ে নানারকম আজগুবি স্বপ্নে মশগুল হয়েছিলাম—"

"এখনও হয়তো আছেন"

ঠিক ধরেছ। কল্পনার আমার অন্ত নেই। একটা কথা কিন্তু

বুঝতে পারছি—একবার যা সৃষ্টি করে' ফেলেছি, তার বেশী আর কিছু করা যাবে না। মনে মনে যতই না কল্পনা করি। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে তাই নানাভাবে বিকশিত হচ্ছে। সবাই মনে করছে নূতন সৃষ্টি হচ্ছে বুঝি, কিন্তু আমি জানি সব পুরোণো। নিজের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আর আনন্দ পাচ্ছি না কোন। তাই আজগুবি কল্পনার আশ্রয় নিচ্ছি। কিন্তু আজগুবি কল্পনা নিয়েই বা কতকাল থাকা যায়। কি করি বল ত—"

ময়ূরীর নয়নে আর এক ঝলক হাসি চকমক করিয়া উঠিল।

ময়ূরী বলিল—"আপনি আপনার প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ বপন করেছেন। অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যেই কি অনন্ত অভিনবত্বের সূচনা নিহিত নেই? ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিরাট মহীরুহের সম্ভাবনা সুপ্ত আছে। সে মহীরুহের জীবন-যাত্রায় যে অসংখ্য উত্থান-পতন, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব আপনি সূচিত করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ কি আপনি জানেন?"

"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না জানলেও—"

"পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে চেষ্টা করলেই দেখতে পাবেন যে, আপনার পুরাতন সৃষ্টি চিরনূতন। আপনার যে কোনও একটি সৃষ্টির প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তন যদি লক্ষ্য করেন তাহলেই আনন্দ পাবেন"

"কিন্তু আমি আনন্দ পাই সৃষ্টি করে'। অন্য আর কিছুতে আমার আনন্দ নেই"

"আপনার একটি সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে'ই আপনি কল্পনা করুন—তার কি কি পরিণতি হতে পারে, তার পর মিলিয়ে দেখুন—সত্যি সত্যি তা হল কিনা। আপনার প্রতিটি সৃষ্টি নানা সুরে প্রকাশের ভাষা খুঁজছে। তাদের এই নিরন্তর অনুসন্ধানই আবার পরস্পরকে

ব্যর্থও করে' দিচ্ছে। শার্দ্দুলের আত্মপ্রকাশের প্রচেষ্টা ব্যাহত করছে হরিণের প্রচেষ্টাকে। হরিণ আবার তৃণদলের প্রকাশ-লীলাকে বিঘ্নিত করছে, তৃণদল বাধা দিচ্ছে মহীরুহদের, কিছুতেই তাদের বীজকে ভূমিস্পর্শ করতে দিচ্ছে না। বিশ্ব জুড়ে এই চলছে—"

"তুমি এই সব লক্ষ্য করেছ ?"

"আমি যে সকলেরই আত্মপ্রকাশের ভাষা"

"ও, তুমি যে বাণী ! সব সময়ে মনে থাকে না কথাটা। যা বলছ তা মন্দ নয়। কাকে লক্ষ্য করা যায় বল তো"

"আপনার ওই চার্ব্বাককেই করুন না"

"বেশ। তুমি চললে কোথায়"

"ওই মেঘলোকে। ও অনেকক্ষণ থেকে ডাকছে আমাকে"

ময়ূরী পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িল এবং দেখিতে দেখিতে মেঘলোকে বিলীন হইয়া গেল।

১৫

শ্রেষ্ঠী মহাশকুন্তের হস্তে নীলোৎপলার লিপি এবং আলেখ্য সমর্পণ করিয়া চার্ব্বাক প্রত্যাবর্তন করিতেছিল। শ্রেষ্ঠী যে নীলোৎপলার আমন্ত্রণে পুলকিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার মুখভাব দেখিয়াই চার্ব্বাক অনুমান করিতে পারিয়াছিল। নবীনা গ্রামে দুই চারিজনের সঙ্গে আলাপ করিয়া চার্ব্বাক ইহাও শুনিয়াছিল যে মহাশকুন্তের প্রথমা পত্নী বহুকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর মহাশকুন্ত আরও চারবার বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু দাম্পত্যজীবনে সুখী হইতে পারেন নাই। দুইটি পত্নী উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, একটি পত্নী উন্মাদিনী

হইয়া গিয়াছে, চতুর্থা পিতৃগৃহে গিয়া আর ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং মহাশকুন্ত আর্থিক জগতে সমৃদ্ধিশালী হইলেও মানসিক জগতে অতি দরিদ্র। কোনও রমণী, যদি তাহার এই আন্তরিক বুভুক্ষাকে শান্ত করিতে পারে তাহা হইলে মহাশকুন্ত যে তাহার নিকট ক্রীতদাসবৎ থাকিবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুরা-প্রভাবে নীলোৎপলা সত্যই যদি এই অসাধ্য সাধন করিতে পারে, তাহা হইলে সেইই মহাশকুন্তের এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। নীলোৎপলার বাক্যগুলি পুনরায় চার্ব্বাকের মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে তাহার মনস্কাম যদি পূর্ণ হয় তাহা হইলে চার্ব্বাকের জীবনের অর্থ সমস্যাও সে সমাধান করিয়া দিবে। চার্ব্বাককে আর কায়িক পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হইবে না। চার্ব্বাক চিন্তা করিতেছিল—কি করা উচিত? নীলোৎপলার নিকট ফিরিয়া যাওয়াই কি সঙ্গত হইবে? স্বার্থের দিক দিয়া ভাবিলে ফিরিয়া যাওয়া উচিত, কিন্তু চার্ব্বাকের ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় যে বর্ণ সমারোহ উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল তাহারা যেন বর্ণের অবর্ণনীয় ভাষায় তাহাকে বলিতেছিল, তোমার নিকট তো দশটি সুবর্ণমুদ্রা রহিয়াছে, তবে আবার কেন ওই কুৎসিত উপযাচিকার নিকট যাইতে চাহিতেছ, তোমার মানসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা কর, মধ্যপ্রদেশ কত দূর?

চার্ব্বাক সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল। কৃষ্ণচূড়ার শিখরে শিখরে কামনার লেলিহান শিখা জ্বলিতেছে, স্বর্ণকান্তি চম্পকের উগ্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত, বকুল তরুর নিম্নে সহস্র সহস্র বকুল ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে, ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া পাপিয়া সারা আকাশকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। এক অনির্ব্বচনীয় রসে চার্ব্বাকের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল তাহার জীবন

কি ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তি যদি সুরঙ্গমার হৃদয় স্পর্শ করিতে না পারে তাহা হইলে সে যুক্তির মূল্য কি? সুরঙ্গমাকে কাছে পাইলে···সহসা সে দেখিতে পাইল চক্রবালরেখালগ্ন পথ বহিয়া শকটশ্রেণী চলিয়াছে। তাহার মনে হইল ওই শকট-চালকগণ নিশ্চয়ই দেশের পথঘাটের সহিত পরিচিত, কোন পথে গেলে মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হওয়া যায় এ খবর উহারাই হয়তো দিতে পারিবে। আর কালবিলম্ব না করিয়া চার্ব্বাক শকটশ্রেণীর উদ্দেশ্যে পদচালনা করিল। সম্মুখে বিরাট প্রান্তর। নির্ম্মেঘ আকাশে প্রখর সূর্য্য জ্বলিতেছে। উপল-বহুল প্রান্তর অমসৃণ ও বন্ধুর। চার্ব্বাকের কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া সে ছুটিতে লাগিল, তাহার সমস্ত সত্তা একাগ্র হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইল যে বকুলচম্পকের গন্ধে, কৃষ্ণচূড়ার বর্ণ-মহিমায়, নীলাকাশে প্রতিফলিত স্বচ্ছ স্বর্ণকিরণ জালে, পাপিয়ার আকুল সঙ্গীত ধারায় যাহা সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার জীবনেও আনন্দময় রূপ পরিগ্রহ করিবে—যদি সে সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিতে পারে এবং কিছুদিন যদি সুরঙ্গমার নিকটে থাকিবার সুযোগ পায় তাহা হইলে তাহার অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয়ে নিশ্চয়ই সে আলোকপাত করিতে পারিবে এবং আলোকপাত করিলেই···।

শকটশ্রেণী লক্ষ্য করিয়া চার্ব্বাক ছুটিতে লাগিল।

চার্ব্বাকের মাথার উপরে দুইটি চিল চক্রাকারে উড়িতেছিল। প্রথম চিল দ্বিতীয় চিলকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"পিতামহ, ছুটন্ত চার্ব্বাককে দেখে কি বুঝতে পারছেন যে এর পর ও কি করবে?"

"না, ঠিক পারছি না। ভৃগু হয়তো পারতো। যে রকম ছুটছে ভয় হচ্ছে মুখ থুবড়ে পড়ে' না যায়—বা! বেশ লাগছে কিন্তু দেখতে—"

"আমি তো বলেছিলাম আপনার যে কোনও সৃষ্টির প্রতি মুহূর্ত্তের বিকাশ যদি লক্ষ্য করতে পারেন, তা কাব্যের মতো মনোরম হবে—"

"দেখ, দেখ, বেশ বড় একটা গর্ত্ত ও একলাফে পার হয়ে গেল। বাহাদুর আছে ছোকরা"

"লক্ষ্য করে' দেখলে আপনার প্রত্যেক সৃষ্টিই নানা রসের আঁধার"

"কিন্তু নিজের সৃষ্টির পিছনে দৌড়োদৌড়ি করতে বেশীক্ষণ ভাল লাগবে কি! বিশেষ করে' এই চড়চড়ে রোদে—"

"চলুন, এই বিরাট বটবৃক্ষের ছায়ায় গিয়ে আশ্রয় নেওয়া যাক—পাতার আড়ালে বসে' বসে' লক্ষ্য করা যাক কি করে ও—"

"শাখাপত্র-নিবিড় এক বিশাল মহীরুহের উচ্চ-শিখরে উপবেশন করিয়া পিতামহ বলিলেন—"এখন মন্দ লাগছে না। ছোকরা এখনও ছুটে চলেছে দেখছি—"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পিতামহ পুনরায় বলিলেন—"কিন্তু তুমি যাই বল বাণী, ঘটনার পর ঘটনা প্রত্যক্ষ করে' খানিকটা সময় কাটানো যেতে পারে বটে, কিন্তু আসল আনন্দ কল্পনায়—"

"বেশ তো কল্পনা করুন না আপনি"

"বেশ আমি কল্পনা করছি তুমি তাতে ভাষা দাও। এ রকম একঘেয়ে বসে' থাকতে ভাল লাগবে না বেশীক্ষণ"

"বেশ। কল্পনা করুন, আমি তাদের ভাষা যোগাই—"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পিতামহ বলিলেন—"দেখ, কয়েকদিন আগে আমি কল্পনা করেছিলাম তুমি যেন আমাকে ভবিষ্যৎ যুগের

চার্ব্বাকের গল্প শোনাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। ওই কল্পনাটাই রং দিয়ে ফলাও করা যাক, কি বল"

"করুন"

"ভবিষ্যৎ যুগের চার্ব্বাকরা কি রকম হবে বল দেখি—"

"বৈজ্ঞানিক হবে। যন্ত্র আবিষ্কার করবে নানারকম—"

"কি করে' বুঝলে—?"

"ওই যে চার্ব্বাক এখন মাঠ ভেঙে ছুটছে আমিই যে তার মনের ভাষা। ও চাইছে ওর শক্তি শতসহস্র গুণ বর্দ্ধিত হোক। যে সীমা ওর চলচ্ছক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তিকে আবদ্ধ করে' রেখেছে সেই সীমাকে ও লঙ্ঘন করতে চায়। সুরঙ্গমাকে দেখবার জন্যে যে কামনা ওকে উতলা করেছে সেই কামনাসিদ্ধির যত রকম বাধা আছে বুদ্ধিবলে তা ও নিমেষে সরিয়ে ফেলতে চায়—"

"ও বাবা!"

"আশ্চর্য্য হচ্চেন কেন এতে। আপনি যে সীমা সৃষ্টি করেছেন সে সীমা লঙ্ঘন করবার বুদ্ধি এবং শক্তিও যে আপনি সৃষ্টি করেছেন"

"তাতো করেছি। কিন্তু সব রকম সীমা লঙ্ঘন করে' ওরা গিয়ে থামবে কোথায় শেষটা"

"ওরাও থামবে না, আপনার কল্পনাও থামবে না।…"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পিতামহ বলিলেন—"আমি একটু আগে কালকূট নামে এক পাতালনিবাসী নাগবংশীয় রাজপুত্রকে কল্পনা করেছিলাম—সে তাঁর প্রেয়সীকে পায়নি, কেবল দূর থেকে তার আভাস পেয়েছিল। তাকেও ভবিষ্যযুগের কল্পনায় আনব কি?"

"ক্ষতি কি। ভবিষ্যযুগেও ওরকম লোক থাকবে—"

"বেশ। আরম্ভ করা যাক তাহলে—"

"করুন"

শকটশ্রেণীর সমীপবর্ত্তী হইয়া চার্ব্বাক দেখিল যে প্রত্যেক শকটে বৃহদাকৃতি কলস সজ্জিত রহিয়াছে। একজন শকট চালককে সম্বোধন করিয়া সে বলিল—"ভাই, আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তোমাদের শকটে একটু স্থান পেতে পারি কি"

"পিছনের কোন শকটেই স্থান নেই। প্রথম শকটে আমাদের নায়ক আছেন, সেখানে স্থানও আছে। তিনি সদাশয় ব্যক্তি। তাঁর কাছে যান, তিনি আপনার অনুরোধ রক্ষা করবেন"

"এ সব কলসে কি আছে—"

"ঘৃত"

"এত ঘৃত কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তোমরা ?"

"কুমার সুন্দরানন্দ একটি যজ্ঞের আয়োজন করেছেন, তাতেই এই সব ঘৃত লাগবে—"

"কোথায় যজ্ঞ হবে ?"

"তা আমি ঠিক জানি না। আমরা শ্রোণী গ্রামে এই কলসগুলি পৌঁছে দেব। সেখান থেকে আর একদল শকট এগুলিকে বহন করবে, কোথায় নিয়ে যাবে, আমি জানি না, আমাদের নায়ক হয়তো জানেন"

চার্ব্বাকের সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

"তোমাদের নায়কের নাম কি ?"

"গুণপতি"

আর বাক্যালাপ না করিয়া চার্ব্বাক প্রথম শকটের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে লাগিল।

চার্ব্বাককে দেখিবামাত্র গুণপতি হাস্যমুখে সম্বর্দ্ধনা করিলেন—"আসুন, আসুন, মহর্ষি চার্ব্বাক, আপনাকে এখানে দেখব প্রত্যাশা করি নি। কোথায় চলেছেন"

"শ্রৌণী গ্রামে যাব"

"আমরা তো সেখানে চলেছি। সুন্দরানন্দের মহাযজ্ঞে আপনিও একজন ঋত্বিক না কি—"

"আপনার শকটে একটু স্থান হবে কি—"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। আসুন—"

চার্ব্বাক শকটে আরোহণ করিল। পূর্ব্বপরিচিত গুণপতিকে দেখিয়া মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেও তাহার মুখমণ্ডলে সে ভাব প্রকটিত হইল না।

গুণপতি পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—"আপনি কি যজ্ঞে যোগদান করতে যাচ্ছেন"

চার্ব্বাক মৃদুহাস্য করিয়া কহিল—"যজ্ঞে যোগদান করাই তো প্রচলিত রীতি"

"নিশ্চয়। এ যজ্ঞটিও একটু নূতন ধরণের হচ্ছে। শুনছি বিদেশ থেকে এক ম্লেচ্ছ রাজা এসেছেন। মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে সুন্দরানন্দের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, বন্ধুত্বও হয়েছে। তিনিই নাকি সুন্দরানন্দকে এই যজ্ঞ করতে উৎসাহিত করেছেন"

"এ যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক কে?"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে এটা জানি যে মহর্ষি পর্ব্বত ও তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ অশ্ববাহিত রথে কয়েকদিন পূর্ব্বে যাত্রা করেছেন। আপনিও নিশ্চয় নিমন্ত্রিত হয়েই যাচ্ছেন?"

চার্ব্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিল গুণপতি ব্যঙ্গ করিতেছেন কি না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছুই দেখা গেল না যাহা সন্দেহজনক

"না, আমি নিমন্ত্রণ পাই নি। আমি তো ছিলাম না"

"কোথায় গিয়েছিলেন আপনি"

"দেশভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি"

"ও"

এইবার কিন্তু গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন হাসির আভা ধরা পড়িল। চার্ব্বাক বুঝিতে পারিল যে গুণপতি সমস্ত খবরই জানেন। চার্ব্বাক নীরব হইয়া রহিল।

গুণপতি বলিলেন—"তাই আপনার বাড়ি গিয়ে আপনার দেখা পাই নি"

চার্ব্বাক নীরব হইয়াই রহিল। কারণ—ঠিক ইহার পরই যে প্রসঙ্গ অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা হইতেছিল তাহা প্রীতিকর তো নহেই, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে অসুবিধাজনকও।

গুণপতি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—"অবশ্য এটা আমি জানি যে আমার টাকা মারা পড়বে না। যেদিনই আপনার সঙ্গে দেখা হবে সেইদিনই আপনি ঘিয়ের দামটা দিয়ে দেবেন"

চর্ব্বাক বুঝিল—বিস্মৃতির দোহাই না পাড়িলে মানরক্ষা হইবে না।

"আপনি ঘিয়ের দাম পাবেন নাকি আমার কাছে? আমার মনেই নেই"

"তাতে কি হয়েছে। এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তো আপনাদের মনে থাকবার কথাও নয়। কত বড় বড় দার্শনিক ব্যাপার নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন আপনারা—"

গুণপতির অতিবিনীত ভাষণে যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিল তাহাতে চার্ব্বাক বিশেষ বিব্রত বোধ করিল না। এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ব্যঙ্গ ও রূঢ়তর ব্যবহারে সে অভ্যস্ত ছিল। মনে মনে সে চিন্তা করিতে লাগিল গুণপতির সহিত কিরূপ আচরণ এখন

সঙ্গত অর্থাৎ সুবিধাজনক হইবে। বৎসরাধিককাল গুণপতি তাহাকে ধারে উৎকৃষ্ট ঘৃত সরবরাহ করিয়াছে। সমস্ত মূল্য যদি এখনই শোধ করিতে হয় অন্তত দুইটি সুবর্ণমুদ্রা খরচ হইয়া যাইবে। খরচ করিতে চার্ব্বাকের আপত্তি ছিল না, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করিয়াই সে শঙ্কিত হইতেছিল। মাত্র দশটি সুবর্ণমুদ্রাই তাহার সম্বল, তাহার পঞ্চমাংশ যদি ঋণ-শোধ করিতেই চলিয়া যায় তাহা হইলে—। সহসা চার্ব্বাক ভীত হইয়া পড়িল। সুন্দরানন্দের রাজত্বে কেবল গুণপতির নিকটেই যে সে ঋণী তাহা নয়, অনেকেই তাহার নিকট টাকা পাইবে। সুরা-বিক্রেতা সুসেনও কি সুন্দরানন্দের যজ্ঞ দেখিতে যাইতেছে না কি! তাহার নিকট যে অনেক ধার! ব্যাধ গম্ভীরের নিকটও অনেক মৃগমাংস ও বন্যকুক্কুটের মূল্য বাকী আছে। ইহাদের সকলের সহিত যদি সাক্ষাৎ হইয়া যায় তাহা হইলে তো সে নিঃস্ব হইয়া পড়িবে! কিন্তু—। সহসা সে মন স্থির করিয়া ফেলিল। সুরঙ্গমার নিকট যখন যাইতেই হইবে তখন গুণপতিকে খুশী না করিয়া উপায় নাই।

"কত পাবেন আপনি?"

"বেশী নয়। মাত্র পঞ্চাশটি রৌপ্যমুদ্রা—"

"আমার কাছে কয়েকটি সুবর্ণমুদ্রা আছে"

"বেশ, আমি ভাঙিয়ে দেব"

চার্ব্বাক সুবর্ণমুদ্রা বাহির করিতে লাগিল।

১৬

চিল রূপে পিতামহ অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার কেমন যেন অস্বস্তি হইতে লাগিল। সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ বাণী, ছোঁ মারতে ইচ্ছে করছে। ওই যে লোকটা ঠোঙায় করে' তেলে-ভাজা নিয়ে যাচ্ছে—"

চিল-রূপিণী বাণী কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন।

"ওই সব দিকে যদি আপনার মন যায়, তাহলে আর গল্পে মন দেবেন কি করে"

নে,

"তা বটে। কিন্তু তেলে-ভাজাও নিতান্ত খারাপ জিনিস কি

াকে

"তাহলে তেলে-ভাজা নিয়েই থাকুন। ভবিষ্যযুগের চার্ব্বা

ারত

গল্প থাক তাহলে"

তুলত

"না, না—ওটা শুনতেই হবে। তাহলে এক কাজ করি এ

খন

এই চিল-রূপ পরিত্যাগ করি। কারণ যতক্ষণ চিল থাকব ছোঁ মারতে ইচ্ছে করবে খালি। হাঁস হতে আপত্তি আছে?"

"আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। কিন্তু হাঁস হলে একটা বিপদ আছে। হাঁস হলে অনেক শিকারীর লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আমরা অবশ্য মরব না, কিন্তু গল্পটা বিঘ্নিত হবে"

"গল্প তৈরী হয়ে গেছে না কি"

"অনেকক্ষণ। বাইরে আপনি তেলে-ভাজার দিকে নজর দিলেও আপনার মনের আকাশ যে অনেক আগেই কল্পনার রঙে বিচিত্র হয়ে উঠেছে"

"কি করে' বুঝলে"

"বাঃ, আমি বাণী, আমি বুঝব না?"

"সঙ্গে সঙ্গে গল্পও বানিয়েছ?"

"গল্পটা কিন্তু শুনতে হবে একজন কবির মারফত। ঠিক শুনতে নয়—দেখতে হবে"

"দেখতে হবে? তার মানে—"

"সে লিখে যাবে, আর তার মনের ভিতর বসে' আপনি দেখবেন। আপনার একটা অংশ তার মনকে কল্পনাবিষ্ট করবে—আর একটা অংশ তার চোখের ভিতর দিয়ে দেখবে সে কি লিখছে"

"আর তুমি কোথা থাকবে"

"তার লেখনীর মুখে"

"বুদ্ধিটা মন্দ করনি। চল, তাহলে হাঁসই হওয়া যাক। নীল [illegible]র হাঁস হলে কেউ আমাদের আর দেখতে পাবে না। আকাশের [illegible] মিশে যাব আমরা"

"বেশ"

"চার্ব্বাক সামনের গাড়িতে বসে' বেশ খোশগল্প জমিয়েছে দেখছি। [illegible]চ্ছা এত গাড়ি কোথা চলেছে? বড় বড় সব কলসী রয়েছে প্রত্যেক গাড়িতে। ব্যাপারটা কি"

"মনে হচ্ছে ওগুলো ঘৃতপূর্ণ। কোথাও যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে বোধ হয়। আমরা তো সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি, দেখতেই পাবো সব"

ক্ষণকাল পরে ঊর্দ্ধে ঘন-নীল-বর্ণ হংস-মিথুন শকটশ্রেণীকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। মাথার উপরে নিঃশব্দে পাখা ঘুরিতেছে। নিঃশব্দে জ্বলিতেছে বৈদ্যুতিক আলোটা। মনে হইতেছে যেন এক বিচিত্রবেশী বৃহৎ পতঙ্গ কবির টেবিলের উপর নীরবে বসিয়া আছে, অপরূপ-জ্যোতিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন সবিস্ময়ে দেখিতেছে কবি লিখিতেছেন।

ভবিষ্যযুগের কবি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন। তাঁহার প্রেরণার মূলে যে সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার দৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি যে তাঁহার সৃষ্টিকর্ম্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহার ভাবকে ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য স্বয়ং বাণী যে লেখনীমুখে প্রচ্ছন্নরূপে আসিয়াছেন—এসব কথা কবির সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, তিনি নিজেই বুঝি স্রষ্টা। কথা ও কাহিনী সবই বুঝি তাঁহার নিজস্ব।

আবেগভরে লিখিতেছিলেন তিনি।

"যা চিরকালের মতো নাগালের বাইরে চলে গেছে তাকে, মানে, তার দেহটাকে—অভিমান-ভ্রূভঙ্গী-হাসির ঝলক যে তন্বী দেহটাকে ক্ষণে ক্ষণে স্থূলতার সীমা পার করে নিয়ে যেতে চাইত কিন্তু পারত না এবং সেই পারা-না-পারার দ্বন্দ্ব আরও অপরূপ করে' তুলত যাকে—সেই দেহটাকে, আলিঙ্গন-পাশে বাঁধবার সম্ভাবনাটুকুও যখন অবলুপ্ত হল তখন তাকে নূতন রকমে যে আবার পাওয়া যেতে পারে এ আশা আমার মনে জাগে নি কোনদিন। কল্পনায় তাকে পাচ্ছিলাম অবশ্য অহরহ, নানারূপে, নানা বেশে, নানা ভঙ্গীতে—আমার চেয়ে ঢের বেশী বিদ্বান, ঢের বেশী রূপবান, তাকে বিয়ে করেছে এ জেনেও ক্ষণকালের জন্য তাকে পর ভাবতে পারি নি, আমি নিজেও বিয়ে করেছি একজন অনবদ্য সুন্দরীকে, কিন্তু আমার মানসলোক পূর্ণ করে' রেখেছিল আলেয়া—হ্যাঁ, মনে মনে তাকে পাচ্ছিলাম অহরহ, কিন্তু বাস্তবেও যে তাকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে পেয়ে যাব, পাওয়া যে সম্ভব, একথা আমার সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। পেয়ে গেলাম কিন্তু। অভিনব উপায়ে। আপিসের ছুটি ছিল সেদিন। বউবাজার ষ্ট্রীটে যে বোর্ডিং হাউসে থাকতাম তারই ছাতে উঠে পায়চারি করে'

বেড়াচ্ছিলাম। মনের মধ্যে অসংখ্য মধুকর যেন গুঞ্জন করছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কোন বসন্তের আগমনী গাইছে ওরা? একটা খামখেয়ালী এলোমেলো হাওয়া চারদিক তোলপাড় করছিল। কোলকাতা শহরের হট্টগোলও যেন মাঝে মাঝে উতলা হ'য়ে উঠছিল সেই হাওয়ার তোড়ে···অসংখ্য মধুকর গুঞ্জন করে' চলেছিল আমার মনে···এমন সময়, বসন্ত নয়, হঠাৎ বর্ষার সম্ভাবনা সূচিত হ'ল ঈশান কোণে। মুগ্ধ নেত্রে উদীয়মান নব-জলধরের দিকে চেয়ে রইলাম। আকাশ পরিব্যাপ্ত করে' মদমত্ত ঘনকৃষ্ণ হস্তীযূথ ছুটে আসছে! সেই কৃষ্ণ পটভূমিকায় একটা শাদা বাড়ি সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ইতিপূর্ব্বে শাদা বাড়িটা একাধিকবার আমার চোখে পড়েছে। কিন্তু ওর বিশিষ্ট রূপটা ইতিপূর্ব্বে দেখি নি। কালো মেঘের পটভূমিকায় সেদিন প্রথম দেখতে পেলাম। মনে হল যেন বাড়ি নয়, অহল্যা, অভিশপ্তা-পাষাণী, বুক-ভরা তৃষ্ণা, মুখে ভাষা নেই, নবোদিত মেঘের দিকে চেয়ে আছে অবরুদ্ধ মৌন প্রত্যাশায়। তারপরই ঠিক···নবোদিত মেঘে তখনও বিদ্যুৎ-স্ফুরণ হয় নি···আমার সমস্ত দেহে, শিরায় উপশিরায় স্নায়ুতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হ'ল। ওই পাষাণ অট্টালিকার ক্ষুদিত আত্মাকে যেন মূর্ত্ত দেখলাম। ছাতের উপর আলসে ধরে' চেয়ে আছে মেঘের দিকে, নিস্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে, নীলাম্বরীর আঁচলটা এলোমেলো হাওয়ায় উড়ছে, মনে হচ্ছে তার মৌন অধীরতা যেন ভাষা পেয়েছে ওই উড়ন্ত অঞ্চলপ্রান্তে, যেন ওর সমস্ত সত্তা উড়ে যেতে চাইছে অসীম আকাশে ওই কালো মেঘের দিকে···হঠাৎ হাওয়ায় তার মাথার কাপড়টা সরে' গেল, আলেয়াকে চিনতে পারলাম: আলেয়া? এত কাছে আছে? নিরুপমবাবু এলাহাবাদ থেকে বদলি হ'য়ে এসেছেন না কি! এর পর খানিকক্ষণ আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, ঠিক কি করেছিলাম, কি

ভেবেছিলাম মনে নেই। ঘণ্টাখানেক পরে আপাদমস্তক জলে ভিজে দূরবীণটা কিনে যখন বাসায় ফিরলাম তখন আলেয়া ছাত থেকে নেমে গেছে। তখন তাকে দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু তারপর থেকে অনেকবার দেখেছি। নানা ভাবে, নানা ভঙ্গীতে, বিভিন্ন ঘটনার আলো-ছায়ার বৈচিত্র্যে বহুবার কাছে পেয়েছি তাকে। অনেক দূরে নাগালের বাহিরে যে বীণাটা বাজছিল ওই দূরবীণের সহায়তায়, তার নানা আলাপ নানা ঝঙ্কার ক্ষণে ক্ষণে পূর্ণ করে তুলেছে আমার ক্ষুধিত চিত্তকে। বস্তুতঃ, ওই দূরবীণটাই শেষে হয়ে উঠল আমার অবসর-বিনোদনের একমাত্র সঙ্গী এবং ওই দূরবীণের মাধ্যমেই আমি শিখর সেনকেও আবিষ্কার করলাম।

আমি শিখর সেনের গল্পটাই লিখতে বসেছি। আমার কথাটা এসে পড়ল প্রসঙ্গত। শিখর আমার বাল্যবন্ধু। তাকে কিন্তু আমি চিনি নি। আমার জীবনে যেমন মর্ম্মান্তিক ট্রাজেডি ঘটেছে তার জীবনে যে তেমনি ঘটেছিল তা আমি অনেকদিন জানতামই না। শিখর স্বল্পভাষী লোক ছিল, তাছাড়া অনেকদিন ছাড়াছাড়িও হয়েছিল আমাদের। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেই চাকরী নিতে হয়েছিল আমাকে, শিখর গিয়েছিল কলেজে। পিতৃমাতৃহীন শিখরকে মানুষ করেছিলেন তার বিপত্নীক মামা। তিনিই তাকে এম. এস-সি পর্য্যন্ত পড়িয়েছিলেন। শিখরের খবর আমি মাঝে মাঝে পেতাম চন্দ্রমোহনের কাছে। চন্দ্রমোহন আমাদের উভয়েরই বন্ধু ছিল। একই গ্রামে বাস ছিল তাদের। তাই মাঝে মাঝে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে যখন দেখা হত তখন শিখরের খবর পেতাম। চন্দ্রমোহন লেখাপড়া বিশেষ শেখে নি, কিন্তু ব্যবসা করে' প্রচুর উন্নতি করেছে সে। বাড়ি কিনেছে কোলকাতায়। ব্যবসা উপলক্ষে প্রায়ই আসতে হয় তাকে এবং যখনি আসে আমাকে নিমন্ত্রণ করে। তার মুখেই শিখর সেনের

অনেক খবর পেয়েছি। শিখর সেন প্রথম যৌবনে যে ডায়েরি লিখত সেই ডায়েরিটাও হস্তগত করেছিল চন্দ্রমোহন। বলেছিল, শিখর সেন যখন মামার সঙ্গে কলহ করে' চলে আসে তখন তার মামা শিখরের সমস্ত বই খাতা বিক্রি করে' দেন এক মুদিকে। সেই মুদির দোকান থেকে সে উদ্ধার করেছিল ডায়েরিটা। এই ডায়েরির পাতাতেই শিখরের প্রথম যৌবনের প্রণয় কাহিনীটা লিপিবদ্ধ আছে। এ কাহিনী আমি জানতাম না। তার জীবনের দ্বিতীয় অংশ—অর্থাৎ মামার সম্পর্ক-ছিন্ন করার পর কোলকাতায় সে যে জীবন যাপন করেছে সেই জীবনের খানিকটা, আমি শুনেছিলাম আমার এক আত্মীয় পুলিশ অফিসারের মুখ থেকে। কিছু কিছু আমি নিজেও দেখেছি স্বচক্ষে। অর্থাৎ শিখর সম্বন্ধে আমার যতটুকু জ্ঞান তার সবটা আমার প্রত্যক্ষ নয়। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি, কল্পনাও করেছি কিছুটা। আমাদের সমস্ত জ্ঞানই কি এই তিনের সমন্বয় নয়? আমার নিজের জীবনের সঙ্গে ওর জীবনের অদ্ভুত রকম একটা মিল আছে বলেই ওর কাহিনীটা লিখতে বসেছি। দূরবীণের ভিতর দিয়ে আমার আলেয়ার অপরূপ আবির্ভাব দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখতে পেলাম শিখর সেনকে, এক নূতন শিখর সেনকে, যাকে আমি চিনতাম না। দেখলাম সে-ও অনুসরণ করছে আর এক আলেয়াকে। মনে হ'ল সে শিখর সেন নয়, পতঙ্গ, আমারই মতো পতঙ্গ, প্রদক্ষিণ করে' চলেছে এক জ্বলন্ত শিখাকে, যে শিখা শেষে তাকে—কথাটা মনে হলে এখনও আমি শিউরে উঠি। উমেশ মামার (আমার সেই আত্মীয় পুলিশ অফিসারটির) কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। ভয় হয়, আমারও ওই পরিণাম হবে না কি! মাঝে মাঝে লোভও হয়, মনে হয় আহা সত্যিই যদি ওরকম পরিণাম, ওরকম নাটকীয় পরিণাম আমার জীবনেও হ'ত, ওরকম একটা তীব্র জ্বালাময় আনন্দময় দৃশ্যের শেষে

আমার জীবনেও সত্যি যদি যবনিকাপাত হত, কি ক্ষতি ছিল তাতে? শিখর সেনকে ঈর্ষা হয়। নিজের আদর্শ থেকে সে চ্যুত হয় নি, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে সত্যকেই আঁকড়ে ছিল।..."

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখক থামিয়া গেলেন কিছুক্ষণের জন্য। বিদ্যুৎ-প্রদীপ্ত টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। কাহিনীর গঠন-কৌশল কিরূপ হইবে সেই চিন্তায় তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল, সীমাহীন কল্পনালোকে দিশাহীন হইয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু প্রতিভা কাহিনীর সূত্র খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি টেবিল-ল্যাম্পটির দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু টেবিল-ল্যাম্পকে দেখিতেছিলেন না। তিনি উৎসুক নেত্রে তাহাই দেখিতে চাহিতেছিলেন যাহা সহজে দেখা যায় না, যাহা মাঝে মাঝে সহসা দেখা দেয়। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ থাকিয়া অবশেষে তিনি যে অধ্যায়টি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার নাম-করণ করিলেন—'কমল-কিশোরের আত্মকথা'। তাহার পর আর একটি ছোট কাগজে লিখিয়া রাখিলেন—'শিখর সেনের কলিকাতা প্রবাসের ডায়েরি'। তাঁহার মনে হইল এই দুই অংশে গল্পটি বলিলে সম্পূর্ণভাবে গল্পটি বলা হইবে।

'অগণিত নক্ষত্রের আলোকে আকাশ ঝলমল করিতেছে! আস্তাচলচূড়াবলম্বী শুক্লা তৃতীয়ার শশী দিগন্তরেখায় মোহাচ্ছন্ন মানসে স্বপ্নলোক সৃজন করিতেছে। আলো-আঁধারির প্রহেলিকায় মহাকাশ রহস্যমগ্ন, ছায়াপথের নিহারিকা-লোকে নব নব সৃষ্টি-প্রেরণা আহত বীণাতন্ত্রীবৎ কম্পিত হইতেছে। পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে নীল হংস-মিথুন।

পিতামহ বলিলেন—"কমল-কিশোরই কালকূট হয়ে উঠল না কি শেষে"

বাণী উত্তর দিলেন—"স্রষ্টার কল্পনায় যা একদা কালকূট ছিল তাই যদি এখন কমল-কিশোর হয়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। পঙ্কই তো পঙ্কজে রূপান্তরিত হয়—"

"এক্ষেত্রেও তা হচ্ছে কি? কালকূটই কি কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হচ্ছে? বিশ্বাস কর বাণী, আমি যখন সৃষ্টি করি তখন বুঝতেই পারি না যে ছাই পাঁশ কি হচ্ছে! একটা অদ্ভুত আনন্দ-স্রোতে হাবুডুবু খেতে খেতে যা দেখি বা অনুভব করি, তাই আমার সৃষ্টি হয়ে ওঠে। কি যে হচ্ছে তা বুঝতেই পারি না তুমি যতক্ষণ না তাকে পরিচ্ছন্ন রূপ দাও। আমার ভাবের তুমিই ভাষা। তাই তোমাকে জিগেস করছি, কালকূটই কি কমল-কিশোর হ'য়ে ফুটছে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। কালকূটের কামনা ওর মধ্যে ফুটেছে; কিন্তু সাপটাকে দেখতে পাচ্ছি না এখনও"

পিতামহ আর কোন কথা বলিলেন না।

নীল হংস-মিথুন পুনরায় উড়িয়া চলিল। তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, অস্তগামী চন্দ্রকে তাহারা বুঝি কিছু বলিবে, তাই তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া গিয়াছে।

কবি পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

"শিখর সেন সত্যই শেষ পর্য্যন্ত সত্যকে আঁকড়ে ছিল। Every thing is fair in war and love—এই বিদেশী প্রবচনের নির্দ্দেশ মানে নি সে। সে মেনেছিল বিবেককে। বিবেকের বাঁধনে সে নিজেকেও বেঁধেছিল, অবন্ধনাকেও বাঁধতে চেয়েছিল। অবন্ধনা কিন্তু বাঁধা পড়ে নি। শিখর সেনের ক্ষণিকের দুর্ব্বলতার ছিদ্র দিয়ে সেই যে সে পালিয়েছিল আর ধরা দেয় নি। তাকে কাছে পেয়েও আর অধিকার করতে পারে নি শিখর। তার ধারণা হয়েছিল—ভুল ধারণাই হয়েছিল— যে অবন্ধনা যে পাপ-পথে নেবেছে সে পথ তাকে

সরিয়ে আনতে পারলেই বুঝি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু ঠিক হয়ে যায় নি, অত সহজে কিছুই ঠিক হয়ে যায় না। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, অবন্ধনাকে শিখর ভালবাসে নি ঠিক অর্থাৎ ভালবেসে অন্ধ হ'য়ে যায় নি। যে ভালবাসা অন্ধ করতে পারে না সে ভালবাসার জোর কতটুকু? সে যে অন্ধ হয় নি, অবন্ধনা তা বুঝেছিল। আমার মনে হয় সেই জন্যই সে ধরা দেয় নি, পাপ-পথ থেকেও নড়ে নি একচুল। অবন্ধনার বাবা অদ্ভুত লোক ছিলেন শুনেছি। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি নাকি নিরুদ্দেশ হয়ে যান, সন্ন্যাসী হয়ে নয়, জাহাজের নাবিক হয়ে। অবন্ধনার তখন জন্মও হয় নি। যাবার সময় ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নাকি বলে গিয়েছিলেন, যদি মেয়ে হয় নাম রেখ অবন্ধনা, আর যদি ছেলে হয় তাহলে রেখ মহাকাল। মহাকাল মুখোপাধ্যায়, মন্দ শোনাবে না।' তাঁর নিজের নাম ছিল নীলাম্বর। তিনি আর ফেরেনই নি। ফিরলে হয় তো শিখর সেনের জীবন-কাহিনী অন্য রকম হয়ে যেত। কিন্তু আমার মনে হয় এতই গতানুগতিক হ'ত তা যে 'কাহিনী' কথাটার পুরো স্বাদ পাওয়া যেত না তাতে। নীলাম্বর মুকুজ্যে ফিরলে শিখর সেনের জীবনের এই সমুজ্জ্বল মর্ম্মান্তিক পরিণতি আমরা দেখতে পেতাম কি না সন্দেহ। বিদ্রোহী নীলাম্বর জাতের গণ্ডী অনায়াসেই ডিঙিয়ে যেতেন, শিখরের সঙ্গে অবন্ধনার বিবাহের কোন বাধাই তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কাহিনীটা জমবে বলেই অবন্ধনাকে জন্মাতে হল তার দূরসম্পর্কীয় পিসেমশাইয়ের আশ্রয়ে গোঁড়া গাঙুলী পরিবারে। সে পরিবারের কর্ত্তা কয়াধুনাথ গাঙুলীকে গ্রামের রসিক ছোকরারা বলত কয়েদী গাঙুলী, এত রকম আচার-বিচারের শৃঙ্খলে তিনি নিজেকে বন্দী ক'রে রাখতেন। আমি দেখেছি ভদ্রলোককে। শীর্ণ-কান্তি লোকটি, শ্যামবর্ণ, বেঁটে, কপিশ বর্ণের গোঁফ-দাড়িতে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন, চোখ দুটি ছোট ছোট রক্তবর্ণ।

কয়াধুনাথের পিতা ভবতোষ গাঙুলী ম্লেচ্ছভাবাপন্ন নাস্তিক ছিলেন। পৌরাণিক দেবতাদের চেয়ে দৈত্যদের তিনি নাকি শ্রদ্ধা করতেন বেশী। তাই ছেলের ওই রকম অদ্ভুত নামকরণ করেছিলেন। বিদ্রোহী হিরণ্যকশিপুকে বিশেষ রকম শ্রদ্ধা করতেন তিনি। তাঁর ধারণা ছিল হিরণ্যকশিপু একজন খাঁটি ভারতীয় বীর ছিলেন, বিজয়ী আর্য্য রাজাদের অনুগ্রহলালিত পুরাণকারেরা বিদ্বেষবশত তাঁর গায়ে মিথ্যা কলঙ্ক কলিমা লেপন করেছে। তিনি বলতেন পরবর্তী যুগেও এ ঘটনা ঘটেছে। হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্ট বাঙালী বীর শশাঙ্ককে হেয় করতে কুণ্ঠিত হন নি। কয়াধুনাথ নিজ পুত্রের নাম যদি প্রহ্লাদ রাখতেন বেশ মানানসই হত—কিন্তু তিনি সুর আর একটু চড়িয়ে ছেলের নাম রাখলেন জগন্নাথ। ভবতোষ ছিলেন গোঁড়া নাস্তিক, কয়াধুনাথ হলেন গোঁড়া আস্তিক। জগন্নাথ হয়েছেন গোঁড়া কেরাণী। আস্তিক্য নাস্তিক্য কোন কিছুরই ধার ধারেন না তিনি।

এই কয়াধুনাথের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নীলাম্বর-দুহিতা অবন্ধনা যে ইতিহাস সৃষ্টি করল তা চিরন্তন ইতিহাস। একজন ধনীর ড্রয়িংরুমে আমি একবার এই চিরন্তন ইতিহাসের অপরূপ নজির দেখেছিলাম মনে পড়ছে। সুদৃশ্য টবে একটি বিদেশী ফুল ফুটেছিল। ড্রয়িংরুমের জানালাগুলো বন্ধ ছিল কাচের দরজা দিয়ে তবু কিন্তু সেই বন্দিনী বিদেশিনীর বর্ণমদির গন্ধ-সুষমা ব্যর্থ হয় নি সেদিন। ওই বন্ধ ঘরের ভিতরও ভ্রমর এসেছিল দু'একটি, গুঞ্জন করছিল ফুলটিকে ঘিরে। যে গোঁড়ামীর প্রাচীর দিয়ে কয়াধুনাথ তাঁর পরিবারকে ঘিরে রাখতেন সে প্রাচীর লঙ্ঘন করতে অবন্ধনারও যে বিলম্ব হয় নি—তার জীবন-কাহিনীই তার প্রমাণ। নীলাম্বর মুকুজ্যে আর ফেরে নি, কিন্তু তার দুঃসাহসী কবি-প্রকৃতি ফিরে এসেছিল তার কন্যার চরিত্রে। নীলাম্বরের স্ত্রী মৃন্ময়ী ছিলেন অতিশয় কোমল-হৃদয়া। কন্যাকে

শাসন করতে পারতেন না, কয়াধুনাথের প্রখর শাসন থেকেও বাঁচাতে চেষ্টা করতেন তাকে যথাসাধ্য। অবন্ধনার কোনও দুষ্কৃতিই কয়াধুনাথের কর্ণগোচর হত না। দৃষ্টি-গোচর হবারও উপায় ছিল না, কারণ কয়াধুনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত শাস্ত্রসম্মত পরলোকের দিকে। ঠাকুর ঘরেই অধিকাংশ সময় কাটত তাঁর জপতপ নিয়ে। কয়াধুনাথের পত্নী ষোড়শী ইচ্ছে করলে হয়তো অবন্ধনাকে শাসন করতে পারতেন। কিন্তু তিনিও সে ইচ্ছে করেন নি, কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র জগন্নাথই অবন্ধনার চিত্তকে বহির্মুখী করেছিল। জগন্নাথই প্রথম প্রথম তাকে নিয়ে আমবাগানে ঘুরে বেড়াত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত। স্বামীর কাছে অবন্ধনার দুষ্কৃতি কীর্ত্তন করতে গেলে জগন্নাথেরও করতে হয়। পুত্রবৎসলা ষোড়শী তা করতে ভয় পেতেন, কারণ স্বামীকে চিনতেন তিনি। সুতরাং অবন্ধনা সত্যিই অবন্ধনা হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। শিখর ছিল জগন্নাথের প্রতিবেশী এবং সহপাঠী। সুতরাং বাল্যকাল থেকেই অবন্ধনার সঙ্গে শিখরের পরিচয় ঘটেছিল। শিখর, জগন্নাথ, চন্দ্রমোহন এবং আমি—আমরা সব এক স্কুলেই পড়তাম। কিন্তু অবন্ধনাকে আমি কখনও দেখি নি, দেখবার সুযোগই হয় নি। কারণ আমি আসতাম ভিন্ন গ্রাম থেকে। অন্য দিকে মন দেবার মতো মনের অবস্থাও ছিল না আমার, কারণ তখন থেকেই···ওই বোধহয় আলেয়া এসে দাঁড়িয়েছে জানালায়···নীলাম্বরী-খানা পরেছে মনে হচ্ছে···ও কি জানে যে আমিই ওকে রোজ দেখি···"

কবি তদ্গত চিত্তে লিখিয়া চলিয়াছিলেন। সম্মুখের আলোকিত শুভ্র দেওয়ালে দুইটি বিচিত্রপক্ষ প্রজাপতি আসিয়া পাশাপাশি বসিল। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে অপরূপ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। কবি কিন্তু কিছুই লক্ষ্য করিলেন না, তিনি নূতন একটি পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিলেন।

শিখর সেনের ডায়েরি

১৭-৬-৩৪

ভিক্টর হুগোর 'লে মিজারেবল্‌স্' পড়লাম। অদ্ভুত বই। মাঝে মাঝে অনেক জায়গা বুঝতে পারি নি। মনে হচ্ছিল যেন জঙ্গলে মাঝে মাঝে পথ হারিয়ে ফেলছি। অচেনা কথার জঙ্গল, ঘটনার জঙ্গল, মানব-মানবীর জঙ্গল। সমস্তই অচেনা, সমস্তই অপরিচিত। এই অচেনা অপরিচিতের ভিড়ে একটুও ভয় করছিল না কিন্তু, আনন্দ হচ্ছিল। এদেরই মধ্যে চেনা এবং পরিচিতের আভাস পাচ্ছিলাম, মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এরা আমার চেনা লোকই, অনেকদিনের চেনা, কিন্তু কোথায় কি যেন সব অদল বদল হয়ে গেছে বলে' চিনতে পারছি না। খুব ভাল লাগল জ্যাভার্টকে। মনে হল যেন খাঁটি একটি আর্য্যচরিত্র মহাভারত থেকে উঠে এসেছে। আমাদের দেশে পুলিশের লোককে লোকে ঘৃণা করে কেন? এদেশে কি জ্যাভার্টের মতো পুলিশ অফিসার নেই?...এ দেশে আমাদের ক্লাসের জগুর বোন অবু আজও এসেছিল দক্ষিণপাড়ার বাগানে। নিজের সম্বন্ধে মেয়েটির ধারণা খুব উচ্চ বলে মনে হল। তার ধারণা সে যদি নিজের মুখে কোনও জিনিস চায় তাহলে তাকে তা দিতেই হবে। তার দাবীকে কেউ অগ্রাহ্য করতে পারবে না। অনায়াসেই আমাকে বলে বসল ওই উঁচু ডাল থেকে আমাকে পেয়ারাটা পেড়ে দাও না। পেয়ারা অবশ্য আমি পেড়ে দিলাম, কিন্তু ওরকম বলাটা কি ওর উচিত হয়েছে? একটু পরেই দেখি বিশাই বাগ্‌দির ছেলে নব্‌নে এক ঝাঁক পদ্মফুল এনে হাজির। অবুর আদেশেই না কি সে-ও সাপে-ভরা পালং-দীঘিতে নেবেছিল পদ্মফুল জোগাড় করতে। একটা আধফোটা পদ্ম নিজের মাথায় গুঁজতে গুঁজতে এমন ভাবে সে চাইলে আমার দিকে, যার অর্থ—দেখলে? তুমি আমাকে সামান্য একটা পেয়ারা পেড়ে

দিতে ইতস্তত করছিলে—নবনে প্রাণ তুচ্ছ করে পদ্মফুল আনতেও দ্বিধা করে নি! বেশ একটু অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে অবু। জগন্নাথকে তো সে মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না দেখলাম। অথচ জগন্নাথ ওর দাদা। অন্তত চার পাঁচ বছরের বড়। আগে তুমি বলত, এখন তো তুই-তোকারি করে। চাকরের মতো ফরমাস করে, আর জগন্নাথটা ওর ফরমাস খেটে যেন কৃতার্থ হয়ে যায়। যে সামান্য একটা অ্যালজ্যাব্রার অঙ্ক বুঝতে পারে না, তার কি কোন পদার্থ আছে...”

প্রথম প্রজাপতি দ্বিতীয় প্রজাপতিকে নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, “বাণী, ভিক্টর হুগো লোকটি কে? আমিই অবশ্য সৃষ্টি করেছি, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না—”

“ভিক্টর হুগো একজন বিখ্যাত ফরাসী কবি”

“ও। আচ্ছা, অ্যালজ্যাব্রা জিনিসটা কি বল তো”

“গণিতশাস্ত্রের একটা শাখা”

“ও”

আবার খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রথম প্রজাপতি বলিল—“গল্পটা তোমার ভাল লাগছে বাণী?”

আমি শুধু অপ্রকাশকে প্রকাশ করছি। আমার ব্যক্তিগত ভাল-লাগা না-লাগার কথা আমি ভাবছি না, কোন কালেই আমি ভাবি না। ভবিষ্যৎযুগে মানুষের মনীষা যে মুদ্রাযন্ত্র সৃষ্টি করবে সে-ও ভাববে না—”

“হেঁয়ালি ছাড়। এখনি আর একটা মজার ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলুম, বুঝলে—”

“কি”

“কালকূটকে দেখতে পেলুম। দেখলুম পর্ব্বতপ্রমাণ কূর্ম্মপৃষ্ঠ

থেকে যে কঙ্কাল মেঘমালতীর রূপ ধারণ করে' কালকূটকে ইঙ্গিতে ডাকছিল সে যেন ডানা মেলে আকাশে উড়ছে—আর কালকূট ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে তার পিছু পিছু।...”

“আপনি ওই সব ভাবছেন তাই কবির লেখাও থেমে গেছে দেখুন! উনিও ভাবছেন বসে' বসে'—”

“ভাবুক একটু। চল আমরা একবার চার্ব্বাকের খবরটা নিয়ে আসি”

প্রজাপতি-যুগল বাতায়নপথে বাহির হইয়া গেল।

১৭

নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা নিগূঢ় মহিমা আছে। সন্ধ্যাকালে যাহা প্রচ্ছন্ন থাকে গভীর রাত্রে তাহা আত্মপ্রকাশ করে। সেই আত্মপ্রকাশের ছন্দ অত্যন্ত মৃদু, অতিশয় প্রচ্ছন্ন, অতীব নিগূঢ়। তাহাতে কোনও ঝনৎকার নাই। নিদ্রিত পৃথিবীর বুকে তাহা স্বপ্নের মতো অতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া ওঠে। জ্যোৎস্নাকুল নিশীথ রাত্রিতে যাহারা জাগিয়া থাকে তাহারাও প্রথমে বুঝিতে পারে না যে রূপ-লোকের ঐশ্বর্য্য পরিবৃত হইয়া তাহারা রূপলোকের কল্পনায় নিমগ্ন হইয়াছে। জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রির গহন মর্ম্ম হইতে যে নীরবতা নিখিল বিশ্বকে সমাচ্ছন্ন করে তাহাও যে ভাবাময়, তাহারাও যে গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত আছে চিন্তাশীল দ্রষ্টার নিকট তাহা অবশ্য বেশীক্ষণ অজ্ঞাত থাকে না। স্বকীয় চিন্তার শত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও তাহার চিন্তাধারা জ্যোৎস্নাপ্লুত হইয়া যায়। তাহাতে তীক্ষ্ণতা থাকে না, সীমারেখা থাকে না। চার্ব্বাকেরও ছিল না। অজানা গ্রাম-প্রান্তবর্ত্তী এক প্রান্তরে চার্ব্বাকও জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন হইয়া

বসিয়াছিল। সুরঙ্গমার কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু সে চিন্তাধারায় যে নূতন সুর বাজিতেছিল তাহা আর কখনও বাজে নাই। তাহার মনে হইতেছিল যুক্তি দ্বারা কি সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করা সম্ভব? সুরঙ্গমা শুধু রূপসী নয়, সে বুদ্ধিমতীও। চার্ব্বাক যে সব যুক্তি তাহার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল তাহা সে বুঝিতে পারে নাই, একথা মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই। তবু সে অনায়াসে চলিয়া আসিল কেন? সে কি কুমার সুন্দরানন্দের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিত না? মৃগয়া-অভিযানে যোগদান করিবার তাহার অভিরুচি নাই? যেরূপ তৎপরতার সহিত সাগ্রহে সে চলিয়া গেল তাহাতে এই কথাই মনে হয় যে চার্ব্বাকের যুক্তিগুলি যতই সুচিন্তিত হউক না কেন তাহা সুরঙ্গমার হৃদয়স্পর্শ করে নাই। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাই যে সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সেই বিকট দানবের প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে একদা সে যে শপথ উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা যে অলঙ্ঘনীয় এ ধারণা তো চার্ব্বাক কিছুতেই অপনোদন করিতে পারে নাই। কেন? যুক্তিতো নির্ভুল, চার্ব্বাকের বাক্‌পটুতাও অসাধারণ, সুরঙ্গমাও বুদ্ধিমতী—তবে—কেন এ অসাফল্য? আর একটা কথাও চার্ব্বাকের মনে হইল। এত কষ্ট স্বীকার করিয়া সে-ই বা সুরঙ্গমার অনুসরণ করিতেছে কেন! তাহার কুসংস্কার দূর করাই কি উদ্দেশ্য? তাহা তো নয়। তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া নিজের পৌরুষ চরিতার্থ করাই তাহার উদ্দেশ্য। তাহার নিকট নাস্তিক্য-যুক্তিজাল বিস্তার করার আর কোনই অর্থ নাই বা ছিল না। সে জালে ধারামতী ধরা দিল, তাহাকে শেষে ত্যাগ করিয়া আসিতে হইল, কিন্তু সুরঙ্গমা তো অবলীলাক্রমে তাহা এড়াইয়া গেল। "গেলেই বা"—চার্ব্বাক নিজেকেই প্রশ্ন করিল—"তুমিই বা তাহার জন্য এত উতলা কেন? অঙ্গনা-আলিঙ্গনই যদি পৌরুষ হয় তাহা হইলে যে কোনও অঙ্গনাই

তো তাহার জন্য যথেষ্ট। একটি বিশেষ অঙ্গনার জন্য তুমি ব্যস্ত কেন? নিছক দৈহিক মাপকাঠি দিয়া যদি বিচার করিতে হয় তাহা হইলে শবরীকন্যা ধারামতী কি সুরঙ্গমা অপেক্ষা অধিক লোভনীয়া ছিল না? তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুরঙ্গমার ধ্যান করিতেছ কেন? সুরঙ্গমার মধ্যে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য তুমি এত কৃচ্ছ্র সাধন করিতেছ।"

চার্ব্বাক জ্যোৎস্নাবিধৌত আকাশের দিকে চাহিয়া নিজের অযৌক্তিক আচরণের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

চার্ব্বাকের চিন্তাধারা কিন্তু বিঘ্নিত হইল।

"জেগে আছেন দেখছি। ঘুম হচ্ছে না—নাকি। বিদেশে বিভুঁয়ে ঘুম হওয়া কঠিন। আমি এতক্ষণ চোখ বুজে পড়েছিলাম, ঘুমের দেখা নেই"

"শ্রোণী গ্রামে কতক্ষণে পৌছব আমরা কাল?"

"সন্ধ্যা নাগাদ"

"সেখান থেকে যজ্ঞস্থল কতদূর"

"শুনেচি বেশীদূর নয়। হেঁটে যদি যান প্রহর দুই লাগবে। তবে আমার বিশ্বাস হাঁটতে হবে না আপনাকে। হাতী, ঘোড়া, নিদেন গরুর গাড়িও পেয়ে যাবেন একটা। ঘোড়ায় চড়তে পারেন তো?"

"পারি"

"তবে আর ভাবনা কি, ঘোড়া অনেক থাকবে। আর আপনাকে দেখতে পেলে ওঁরা সাদরে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন। আপনি তো আর যে-সে লোক নন আমাদের মতো। আমি তো আশা করেছিলাম যে, আপনি হোতা বা উদ্গাতা বা ওই রকম কিছু একটা হোমরা-চোমরা গোছের হয়ে যাচ্ছেন, দেশে থাকলে যেতেনও,

কুমার সুন্দরানন্দ আপনাকে যেরকম খাতির করেন শুনেছি তাতে মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গে একই রথে আপনাকে নিয়ে যেতেন তিনি"

চার্ব্বাক গুণপতির মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। দেখিতে পাইলেন গুণপতির চক্ষুযুগল হইতে কৌতুক হাস্য বিচ্ছুরিত হইতেছে।

বলিলেন—"মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গে একরথে আমার স্থান নেই, হতে পারে না। ওঁরা ব্রাহ্মণ নন, মহর্ষি তো ননই—ওঁরা ক্রীতদাস। আমি স্বাধীন মানুষ, নিজের মতে নিজের পথ চলি। ওঁদের সঙ্গে একাসনে আমার স্থান নেই। ওঁরাও আমাকে সহ্য করতে পারবেন না, আমিও ওঁদের সহ্য করতে পারব না"

গুণপতির আনন ঈষৎ ব্যায়ত হইয়া গেল। তিনি বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন—"তাই. নাকি! আমরা মূর্খ মানুষ। কিছুই বুঝি না তো। আমরা জানি, আপনিও মহর্ষি। উনি ক্রীতদাস একথা তো জানতাম না! শবরী ভল্লুকীকে নিয়ে একটা কানাঘুসো শুনতাম বটে, কিন্তু উনি ক্রীতদাস? সুন্দরানন্দের পিতার ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কেনার ঝোঁক ছিল শুনেছি। আমার পিতামহ ধনপতি তাঁর জন্যে বাহ্লীক থেকে, শ্যাম থেকে, সিংহল থেকে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী কিনে আনতেন—বাবার মুখে শুনেছি এসব গল্প। আপনি তাহলে অনেক খবরই জানেন। ক্রীতদাস উনি!

"হ্যাঁ। শুধু সুন্দরানন্দেরই নয় কুসংস্কারেরও। উনি মনে করেন বেদবাক্য স্বতঃপ্রমাণ। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের সমস্ত বিধিনিষেধ উনি অভ্রান্ত বলে' মনে করেন, ওঁর ধারণা সুর করে দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র আউড়ে আগুনে ঘি ঢাললেই অন্তরীক্ষবাসী দেবতারা কাম্য ফল দেবেন। উনি অন্ধ, আমি চক্ষুষ্মান। আমি বিচার করি, উনি বিশ্বাস করেন"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চার্ব্বাকের কথা শুনিতেছিলেন, চার্ব্বাক থামিতেই বলিলেন—"বটে! আমি মূর্খ মানুষ কিছুই বুঝি

না। আচ্ছা, মহর্ষি, বেদই বা কি, আর ব্রাহ্মণই বা কি। যখন সুযোগ পেয়েছি তখন জেনেই নি কথাটা"

"বেদে শুধু মন্ত্র আছে, আর ব্রাহ্মণে আছে সেই মন্ত্রের প্রয়োগবিধি। এসব বাজে কথা জেনে কিছু লাভ নেই। বেদ এবং ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটি মাত্র সংক্ষিপ্ত জ্ঞানই যথেষ্ট"

"সেটি কি"

"সেটি হচ্ছে এই যে, ওসব ভাঁওতা ছাড়া আর কিছু নয়। ওসব সরল-বিশ্বাসী গৃহস্থদের ঠকিয়ে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় মাত্র। যজ্ঞের নামে সারা দেশ জুড়ে যে অপচয় হচ্ছে, যে ভণ্ডামি চলছে, সহজ বুদ্ধিবৃত্তির সুস্থবিকাশের পথে যে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে তা ভাবলে কষ্ট হয়। কিন্তু এর কোন প্রতিকার নেই, প্রতিবাদ নেই। সমস্ত দেশকেই অন্ধ করে' দিয়েছে ওরা"

গণপতি হেঁ হেঁ করিয়া একটু হাসিলেন। মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন। তাঁহার পর বলিলেন—"নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই, কিন্তু এটুকু আমি বলব যে আমি অন্তত অন্ধ হই নি। আমার গৃহিণীর অবশ্য দেব-দ্বিজে প্রবল ভক্তি, কিন্তু আমি যাকে তাকে ভক্তি করতে পারি না—কি রকম যেন পারিই না"

"তা না পারুন, কিন্তু যজ্ঞের বিরোধিতা করতে আপনি পারবেন কি? পারবেন না। এর সঙ্গে আপনার স্বার্থ জড়িত রয়েছে। যজ্ঞ বন্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘি বিক্রি বন্ধ হয়ে যাবে।"

গণপতি নীরবে দন্তগুলি বিকশিত করিয়া চার্ব্বাকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তা যাবে! উঃ, মাথা বটে আপনার। ঠিক

বলেছেন। যজ্ঞ বন্ধ হলে ঘিয়ের ব্যবসা তুলেই দিতে হবে আমাকে। তবে একটা কথা আছে মহর্ষি, এরকম ফলাও ব্যবসা আছে বলেই আমরা আপনাদের মতো সজ্জনকে ধারে ঘি খাওয়াতে পারি। তা না হলে কি পারতুম? আপনাদের কাছে দাম দু'চার ছ'মাস পড়ে' থাকলেও গায়ে লাগে না আমাদের"

চার্ব্বাক মৃদু হাসিয়া বলিল—"আপনি প্রসঙ্গান্তরে এসে হাজির হলেন। আমাকে ধারে ঘি খাওয়ান—এটা কি যজ্ঞের স্বপক্ষে একটা প্রবল যুক্তি হল?"

গুণপতি জিভ কাটিয়া বলিলেন—"ছি ছি, তা কি হয় কখনও! সে কথা আমি বলছি না। মন্দ জিনিসেরও যে একটা ভাল দিক থাকতে পারে সেই কথাটাই আমি বলছি শুধু। সুমন্ত্রও উঠেছে দেখছি—ওহে সুমন্ত্র, এদিকে শোন—মহর্ষি যজ্ঞের খবর জানতে চাইছেন, বল দিকি ওঁকে—সব যা জান"—তাহার পর চার্ব্বাকের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সুমন্ত্র অনেক খবর রাখে—"

চার্ব্বাক বুঝিল, চতুর গুণপতি কৌশলে আলোচনাটার মোড় ফিরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। যজ্ঞ-বিরোধী বিপজ্জনক আলোচনায় তিনি আর নিজেকে সম্ভবত লিপ্ত রাখিতে চান না, অথচ সে কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিতেছেন না। যজ্ঞের সংবাদ জানিবার কিছুমাত্র আগ্রহ চার্ব্বাকেরও ছিল না, কিন্তু সে কথা সে-ও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। প্রধান শকট-চালক দীর্ঘকায় সুমন্ত্র নিকটবর্ত্তী হইতেই গুণপতি বলিলেন—"চাঁদের আলোর ধমকে তোমারও ঘুম ভাঙল বুঝি"

সুমন্ত্র বলিল—"আমি ভাবছি—বেরিয়ে পড়ি চলুন, মাঠে আর সময় নষ্ট করে' কি হবে। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় এগিয়ে যাওয়াই ভাল"

"তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে আমার আর আপত্তি কি। আমারও ও-কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু আমি চুপটি করে' আছি। আমি বললেই তোমরা ভাববে—লোকটা দিক্‌পাল, রাত্রে ঘুমাতে পর্য্যন্ত দেয় না। ঠিক কি না আপনিই বলুন মহর্ষি। ওহে সুমন্ত্র, মহর্ষিকে যজ্ঞের খবর বল তো—যা জান"

সুমন্ত্রের দেহের আয়তন যে অনুপাতে বিশাল, কণ্ঠস্বর সেই অনুপাতেই উচ্চ। কথা কহিলে মনে হয় ধমক দিতেছে। চার্ব্বাকের দিকে একনজর চাহিয়া বলিল—"আপনি কি নিমন্ত্রিত হয়ে যাচ্ছেন?"

"না"

"তাহলে আপনাকে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে কি না সন্দেহ"

"কেন"

"লোকচক্ষুর আড়ালেই নাকি এ যজ্ঞ হবে। সেই জন্যেই কুমার গভীর অরণ্যের মাঝখানে যজ্ঞ-ভূমি নির্ম্মাণ করিয়েছেন—"

"এ রকম করার উদ্দেশ্য?"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে শুনছি!"

"নর-মেধ যজ্ঞ হবে!"

"দিকপাল তো তাই বললে"

"দিকপাল কে"

গুণপতি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"দিকপাল হচ্ছে গুপ্তচর। সুমন্ত্রর আপন ভগ্নীপতি। তার কাছ থেকেই সুমন্ত্র খবর জোগাড় করে"

চার্ব্বাক স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সহসা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—"কুমার সুন্দরানন্দকে এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে কে প্ররোচিত করলে! এ যে অবিশ্বাস্য, এ যে নরহত্যা—"

"ম্লেচ্ছ পণ্ডিত নীল-চক্ষু মির্মির কুমারকে এই যজ্ঞে উৎসাহিত করেছেন শুনেছি। তিনি শুধু পণ্ডিতই নন, শুনেছি তিনি একজন

বড় শিকারীও। নদীপথে সমুদ্রপথে তিনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ান। নর্ম্মদা তীরে কুমারের সঙ্গে না কি তাঁর প্রথম আলাপ হয়। সেই আলাপ এখন প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে এবং তার ফলেই এই যজ্ঞ হচ্ছে। অবশ্য আমি সুমন্ত্রর মুখে যেমন শুনেছি তেমনি বলছি। এর কতটা ঠিক কতটা বেঠিক—তা সুমন্ত্রই জানে। সুমন্ত্রকে সামনে সামনে ডেকে এনে তাই সব কথা আপনাকে ভেঙে বললাম এখন, আগে বলিনি, বলতে সাহস হয়নি”

গুণপতির চোখের দৃষ্টিতে একটা দুষ্ট চতুরতা ঝলমল করিতে লাগিল। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া গুণপতি পুনরায় বলিলেন—“সুমন্ত্রকেই জিজ্ঞাসা করুন এ খবর ঠিক কি না”

সুমন্ত্র যেন ধমকাইয়া উঠিল, “ঠিক”

চার্ব্বাক প্রশ্ন করিল—“অনিমন্ত্রিত কোনও লোককে যজ্ঞস্থলে যেতে দেবে না এ সংবাদও কি ঠিক ?”

“ঠিক”

“যজ্ঞটা হচ্ছে কোথায়”

গুণপতি বলিলেন—“শ্রোণী গ্রামের নিকট কোনও গভীর অরণ্যে, এইটুকু শুধু জানি। এর বেশী আমরা আর কিছু জানি না। জান না কি হে সুমন্ত্র! জান তো মহর্ষিকে বল না খবরটা”

“জানি না”

গুণপতি বলিলেন—“আমরা কেউ কিছু জানি না ; আমাদের উপর কেবল আদেশ হয়েছে ঘিয়ের কলসীগুলি নিরাপদে শ্রোণী গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে কুমার সুন্দরানন্দের সেনাপতি সসৈন্যে উপস্থিত থাকবেন। তাঁরই হাতে এই পাঁচ শত কলস ঘি আমাকে দিয়ে আসতে হবে”

“সেনাপতি মানে কুলিশপাণি ?”

"সম্ভবত। তিনিই তো এখন কুমারের দক্ষিণ হস্ত"।

"মন্ত্রী জিমূত্রকও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকবেন নিশ্চয়"

"থাকা ত উচিত—"

"এ যজ্ঞে কারা ঋত্বিক হয়ে যাচ্ছেন জান?"

সুমন্ত্র উত্তর দিল, "জানি। ব্রহ্মা হয়েছেন মহর্ষি পর্ব্বত, উদ্গাতা মহর্ষি ডম্বরু, অধ্বর্য্যু মহর্ষি চন্দ্রচূড়, আর হোতা হচ্ছেন স্বয়ং সুন্দরানন্দ"

"যে নরটিকে বলি দেওয়া হবে সেটি কোথা থেকে সংগৃহীত হয়েছে?"

"সে খবর কেউ জানে না। এমন কি দিকপালও না"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া চার্ব্বাক বলিল, "আমাকে তাহলে শ্রেণী থেকেই ফিরতে হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, শ্রেণী পর্য্যন্ত তো যাওয়া যাক, তারপর দেখা যাবে"

"কুলিশপাণি তো আপনাকে খুব খাতির করেন শুনেছি। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি হয়তো কোন ব্যবস্থা করে' দিতে পারবেন"

কুলিশপাণির আদেশেই যে চার্ব্বাককে দেশত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেকথা তাহার মনে পড়িল। নির্ব্বাক হইয়া জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতে লাগিল—যাহার আশায় আমি এই দুরূহ বিপদ-সঙ্কুল পথে পা বাড়াইয়াছি তাহার দেখা মিলিবার কোন সম্ভাবনাই তো নাই। সৈন্য-পরিবৃত যজ্ঞস্থলের নিকটবর্ত্তী হইবার সুযোগই পাওয়া যাইবে না। তবে যাইতেছি কেন? এখান হইতে ফিরিয়া যাওয়া উচিত। সহসা এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। চার্ব্বাক মনে মনে যেন পাখী হইয়া উড়িতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল—পুরাণের গরুড় পক্ষীর মতো বিশাল পক্ষ বিস্তার করিয়া সে যেন সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর বহু ঊর্দ্ধে উড়িয়া চলিয়াছে।

—সুরঙ্গমা যেন অলিন্দে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে এই বিরাট পক্ষীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিতেছে। বাজ বা চিল যেমন ছোঁ মারিয়া ক্ষুদ্রতর পশুপক্ষীকে তুলিয়া লয়, সে-ও যেন তেমনিভাবে সুরঙ্গমাকে ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। সুরঙ্গমা চীৎকার করিয়া উঠিল। ঠিক ইহার পরই চার্ব্বাকের কল্পনা-বিলাস ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। সুরঙ্গমার আর্ত্ত চীৎকার যেন একটা ওক্কারের শব্দে রূপান্তরিত হইয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। চার্ব্বাক ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—কিছুদূরে গুণপতি মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন। দুইটি অঙ্গুলি মুখ-বিবরে ঢুকাইয়া সম্ভবত তিনি জিহ্বা পরিষ্কার করিতেছেন, তাহাতেই ওক্কারের শব্দ হইতেছে। সুমন্ত্র বা অন্যান্য শকট-চালক কেহই কাছে নাই। ইহারা কখন যে চলিয়া গিয়াছে, চার্ব্বাক জানিতেও পারে নাই! চার্ব্বাক রীতিমত বিস্মিত হইল। সজ্ঞানে বসিয়া বসিয়া সে নিজের আজগুবি কল্পনায় এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে ইহারা কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা টেরও পায় নাই! নীলোৎপলার কথা মনে পড়িল। সে বলিয়াছিল যে বৈদ্যরাজ নীলকণ্ঠ যে সুরা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দিয়াছিলেন, সে সুরা-প্রভাবে দুরাকাঙ্ক্ষাও তৃপ্ত হয়। যে যাহা হইবার কামনা করে কিছুক্ষণের জন্য তাহা সে হইতে পারে। তাহার মনে হইল এখনই সে তো পাখী হইয়া উড়িতে চাহিতেছিল। ওই সকল অসম্ভব হাস্যকর কল্পনাও তাহা হইলে তাহার মনের কোনও স্তরে নিহিত আছে না কি। সুরাপ্রভাবে সে যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল তাহা কল্পনায় পুনরায় প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। তাহার মানসপটে ছায়াছবির ন্যায় সেই সুন্দরী মোহিনী, বিরাটকায় কৌতূহল, বিচিত্র সন্ধানলোক, মায়াবিনী নদী, পাতালনিবাসী কালকূট, বর্ণমালিনীর ক্ষুরধার জিহ্বা-নির্ম্মিত সাঁকো একে একে মূর্ত্ত হইয়া আবার একে একে অবলুপ্ত

হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল সে। পারি-পার্শ্বিক সম্বন্ধে তাহার মন আর সচেতন রহিল না। অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে তাহার দিশাহারা বুদ্ধি উপায় সন্ধান করিতে লাগিল। একথাও সে অনুভব করিল যে তাহার মন সম্ভব-অসম্ভবের সূক্ষ্ম বিচার করিতে আর প্রস্তুত নহে। দুই আর দুই যোগ করিয়া পাঁচ হয় একথাও সে মানিতে প্রস্তুত আছে—যদি তাহা মানিলে তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। যদি কেহ কোন মন্ত্রবলে সত্যই তাহাকে তীক্ষ্ণ নখচঞ্চু-সমন্বিত বিরাট পক্ষীতে রূপান্তরিত করিয়া দিতে পারে সে মন্ত্রে আস্থা স্থাপন করিতে হয়তো সে আর দ্বিধা করিবে না। সহসা তাহার সমস্ত অন্তর ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কেন সে নিজেকে এত অবনত করিতেছে? কেন? ধীরে ধীরে সুরঙ্গমার মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিল। হাস্য প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি যেন নীরব ভাষায় বলিল, 'আমার জন্য'। অন্তরীক্ষ হইতে যেন এক তরঙ্গিণীর কল্লোল-ধ্বনি কলস্বরে হাসিয়া উঠিল। সেই মায়া নদী যেন পুনরায় বলিল, "তুমি একটি রূপসী যুবতীরই মনোরঞ্জনের প্রয়াস পাচ্ছ। তোমার প্রকৃতি একটুও পরিবর্ত্তিত হয় নি চার্ব্বাক। তুমি নিত্য নব নব ঘৃত পান করবার জন্য নিত্য নব নব ঋণজালে জড়িত হচ্ছ—!"

চার্ব্বাকের সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সহসা সে স্থির করিয়া ফেলিল যে ঋণজাল যতই জটিল হোক না কেন, নিত্য নব নব ঘৃত পান করিবার বাসনা সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, করিতে পারিবে না, কারণ উহাই তাহার ধর্ম্ম। যত বিপদই হোক, সুরঙ্গমার সহিত দেখা করিতেই হইবে।

গুণপতির সহিত চার্ব্বাক পদব্রজেই পথ অতিবাহন করিতেছিল। শকটের শ্রেণী আগাইয়া গিয়াছিল। গুণপতির গাড়ীটি কেবল দেখা যাইতেছিল। পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে গাড়ীতে চড়িবেন এই

অভিপ্রায়ে গুণপতি গাড়ীটিকে বেশী আগাইয়া যাইতে দেন নাই। চার্ব্বাক যখন তাঁহাকে বলিল, "আপনার সঙ্গে গোপনে একটা পরামর্শ করতে চাই—" তখন তাঁহাকে বলিতে হইল—

"তাহলে হেঁটেই যাই চলুন কিছুদূর। আমার বিদ্যাধর গাড়োয়ান অবশ্য খুব বিশ্বাসী লোক, তবু কাজ কি, জ্যোৎস্নায় হাঁটতে ভালও লাগবে"

ঠিক কি ভাবে প্রসঙ্গটার অবতারণা করিবে চার্ব্বাক ভাবিয়া পাইতেছিল না। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চালিবার পর গুণপতি বলিলেন, "কি, ব্যাপারটা কি"

"ব্যাপারটা ঠিক কি ভাবে যে বআপনাকে বলব তা ভেবে পাচ্ছি না। আপনার কাছে হয় তো অদ্ভুত ঠেকবে"

"আরম্ভই করুন না শোনা যাক। আমার বিদ্যের দৌড় অবশ্য বেশীদূর নয়, আপনাদের মতো পণ্ডিতদের কথাবার্ত্তা আমার না বুঝতে পারারই কথা, তবু চেষ্টা করি, বলুন আপনি"

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "দেখুন, আমার কাছে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা মাত্র আছে। ওই আমার যথাসর্ব্বস্ব, কিন্তু তা-ও আমি আপনার হাতে সমর্পণ করব—বিনিময়ে আপনি যদি আমার একটি উপকার করেন"

"দেখুন মহর্ষি, আমি ব্যবসায়ী লোক তা ঠিক, আপনাদের তুলনায় মূর্খ লোকও বটে, কিন্তু উপকার আমি বিক্রয় করি না। যদি আপনার মতো একজন সদ্‌ব্রাহ্মণের উপকারে লাগতে পারি তাহলে আমি নিজেকে ধন্যই মনে করব। ব্যাপারটা কি খুলেই বলুন না।"

"আমি সুন্দরানন্দের যজ্ঞস্থলে যেতে চাই"

"যাবেন কি করে'! সুমন্ত্রের মুখে তো শুনলেন যে অনিমন্ত্রিত কোন লোককে সেখানে যেতে দেবে না। তবে শ্রেণীতে যদি

কুলিশপাণির সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে যায়, তিনি আপনাকে আহ্বান করেই নিয়ে যাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে"

"আমার নেই। কুলিশপাণির আদেশেই আমাকে কিছুদিন পূর্ব্বে সুন্দরানন্দের রাজত্ব ত্যাগ করতে হয়েছিল"

"বলেন কি!"

গুণপতি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"একথা তো অনেকেই জানে, আপনারও জানার কথা"

"আমি কিছুই জানি না। আপনার সঙ্গে এ রকম দুর্ব্যবহার করবার অর্থ কি তাও তো বুঝতে পারছি না"

"কারণ আমি জ্ঞান-মার্গের পথিক, ওঁরা অন্ধ বিশ্বাসী"

"বটে!"

উভয়ে আবার কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিলেন। কিছুকাল পরে গুণপতি বলিলেন, "ওঁদের সঙ্গে যখন আপনার মতেরই মিল নেই, তখন ওঁদের যজ্ঞস্থলে যেতেই বা চাইছেন কেন?"

"যে মানুষটিকে ওঁরা যজ্ঞের নামে খুন করতে চাইছেন তাকে বাঁচাতে চাই"

"বাঁচাতে চান? বলেন কি!"

গুণপতি সত্যই ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চার্ব্বাকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। "পারবেন?"

"আপনি যদি সাহায্য করেন, নিশ্চয়ই পারব"

"কি করতে হবে বলুন"

"আপনার ঘিয়ের জালাগুলি বেশ বড় বড়। আমি অনায়াসেই একটির মধ্যে ঢুকে বসে থাকতে পারি"

"একটা জালার ঘি তাহলে ফেলে দিতে বলছেন?"

"ফেলে দেবার দরকার কি। কাল ভোরে নূতন একটা জালা

কোথাও থেকে কিনুন, আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি এবং আপনি তার বাইরে ঘি মাখিয়ে সেটাকে ঘি বলে' চালান করে দিন। জালা কি পাওয়া যাবে না ?"

"পয়সা ফেললে কি না পাওয়া যায়"

"পয়সা দিতে তো আমি প্রস্তুত আছি। আপনি ব্যবস্থা করে' দিন"

"ব্যাপারটা কিন্তু বেশ বিপজ্জনক। ভেবে দেখুন"

"একটা জঘন্য নরহত্যা নিবারণ করবার জন্যে আমি যে কোনও বিপদকে বরণ করতে রাজি আছি"

গুণপতি মস্তকে একবার হাত বুলাইলেন, তাহার পর বলিলেন, "আপনি তো আছেন, কিন্তু বিপদ যদি হয় তাহলে আমিও যে জড়িয়ে পড়ব। আমরা ছাপোষা লোক, ব্যাপারটা ভাল করে' ভেবে দেখুন মহর্ষি"

"আপনার গায়ে যাতে আঁচড়টি না লাগে সে ব্যবস্থা আমি করব"

"কি করে ?"

"আমি যদি ধরা পড়ি তাহলে আপনার নাম করব না। বলব যে গুণপতি যখন নিদ্রিত ছিল তখন আমি একটি ঘিয়ের জালা সরিয়ে তার স্থানে একটি খালি জালা রেখেছিলাম এবং সেই জালার ভিতর ঢুকে বসেছিলাম। এর জন্য গুণপতি একেবারেই দায়ী নয়"

"এত বড় মিথ্যাভাষণটা আপনি করবেন ?"

"করব। মিথ্যাভাষণ করে' যদি একটা নিরীহ লোকের প্রাণ বাঁচান যায় তাহলে তা করতে আমার আপত্তি নেই। স্বার্থের জন্য মিথ্যাভাষণকে আপনি নিন্দা করতে পারেন কিন্তু পরার্থে মিথ্যাভাষণ নিন্দনীয় নয়"

"আমি মূর্খ মানুষ, স্বার্থটাই বুঝি। আমাকে যদি এতে জড়িয়ে

না ফেলেন তাহলে আপনার আদেশ পালন করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। বলব?"

"বলুন"

"আপনি মিথ্যাভাষণ করতে রাজি আছেন তা না হয় মানলাম, কিন্তু আপনার কথা মানা না মানা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা। আমরা যে ষড়যন্ত্র করে' এ কাণ্ড করতে পারি তা কল্পনা করা কুলিশপাণির পক্ষে অসম্ভব না-ও হতে পারে। লোকটা দেখতে একটু হোঁৎকাগোছের, কিন্তু অবসর পেলেই কবিতা লেখে শুনেছি..."

"মিথ্যাটা যাতে বিশ্বাসযোগ্য হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে"

"কি করে' হবে সেটা"

"ভেবে দেখি একটু"

"ভাল করে' ভাবুন। জীবন মরণ সমস্যা তো"

চার্ব্বাক কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে গুণপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখুন, আপনি যদি ভয় পান, তাহলে আপনাকে আমি অনুরোধ করব না আর। সত্যিই এটা জীবনমরণ সমস্যা। আমার এই প্রচেষ্টায় যদি আপনার অন্তরের সায় না থাকে তাহলে আপনাকে এতে জড়াইতেই চাই না। যজ্ঞের নামে দেশ জুড়ে এই যে অনাচার চলেছে—আমি বরাবর তার প্রতিবাদ করেছি, যতক্ষণ আমার দেহে প্রাণ থাকবে করব। আমার এই কাজে যদি আপনার আন্তরিক সমর্থন থাকে আসুন আমাকে সাহায্য করুন, যদি না থাকে আপনাকে জোর করব না। আমি নিজেই যেমন ক'রে পারি সেখানে গিয়ে হাজির হব"

এই কথায় গুণপতি এক মুখ হাসিয়া উত্তর দিলেন, "দেখুন মহর্ষি, আমি ভীতু মানুষ। আমার অন্তরের কথাও আমি নিজে জানি না ঠিক। সত্যি বলছি, মাত্র দুটি জিনিসই আমাকে চালিত

করেছে সারাজীবন। স্বার্থ আর ভয়। আপনি একজন তপস্বী লোক, আপনাকে চটাতেও ভরসা পাচ্ছি না। ভাবছি কি জানি মহর্ষির অন্তরে কষ্ট দিলে যদি কিছু অনিষ্ট হয়ে যায় শেষকালে। ব্রহ্মশাপে অনেক কিছু হতে পারে—”

“আমি আপনাকে শাপ দেব না, আর দিলেও যে তা ফলবে এ বিশ্বাস আমার নেই”

“আমার আছে। আমি ছাপোষা লোক পারতপক্ষে ব্রাহ্মণকে চটাতে চাই না। আপনি যদি আমাকে রক্ষা করতে পারেন, আমি আপনাকে সাহায্য করব”

কিছুক্ষণ চিন্তার পর চার্ব্বাক বলিল, “আপনার শকটচালক বিদ্যা-ধর কি বিশ্বাসী লোক?”

“খুব”

“আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করে' দেবে না তো?”

“না। প্রাণ গেলেও না। ওর সমস্ত পরিবারকে আমি পালন করি, আমার বিপদে ওরও বিপদ যে”

“বেশ, তাহলে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে শুনুন”

“কি বলুন”

“আপনি আপনার প্রধান শকটচালক সুমন্ত্রকে গিয়ে বলুন যে আপনি আরও জালা কিনে আরও ঘি কেনবার জন্যে পার্শ্ববর্তী গ্রামে যাচ্ছেন বিদ্যাধরকে নিয়ে। পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আপনি প্রকাণ্ড একটি জালা কিনে তার বাহিরেটা ঘৃত সিক্ত করে' ফেলুন, আমি তার ভিতর ঢুকে বসে থাকি। তারপর আপনি অজ্ঞান হয়ে যাবার ভাণ করে' শুয়ে পড়ুন। বিদ্যাধর আপনার অজ্ঞান দেহটাকে গাড়িতে তুলে ছুটতে ছুটতে এসে বাকী সকলকে খবর দিক যে আমি আপনাকে

অতর্কিতে আক্রমণ করে' টুঁটি টিপে হত্যা করবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু লোকজন এসে পড়াতে সফলকাম হইনি—ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেছি। তারপর আপনার জ্ঞান ফিরে আসুক। আপনি আমাকে নিয়ে শ্রোণী গ্রামে পৌঁছে দিয়ে আসুন। তারপর আমি নিজের পথ নিজে ঠিক করে নেব”

গুণপতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চার্ব্বাকের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, মাথা বটে আপনার। তাহলে তাই করি চলুন। কিছু অর্থ তাহলে দিন আমাকে। ঘি কিনতে হবে, জালা কিনতে হবে, বিদ্যাধরকেও দিতে হবে কিছু। বিদ্যাধর এমনি খুব বিশ্বাসী, তার উপর কিছু পুরস্কার দিলে, বুঝলেন না”

চার্ব্বাক স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া দিল।

শিংশপা বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক বিরাট সরোবরে নীল হংস-মিথুন ভাসিতেছিল। পাশাপাশি ভাসিতেছিল কেবল—এই ভাসাটাকেই তাহারা একাগ্র হইয়া উপভোগ করিতেছিল যেন। চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত—শিংশপা বৃক্ষের শাখায় আত্মগোপন করিয়া একটি পাপিয়া ধাপে ধাপে সুর চড়াইয়া ডাকিতেছিল। তাহার সহিত মিলিতেছিল ঝিল্লির ঝনৎকার। মনে হইতেছিল যেন কোন অদৃশ্য সেতারী এবং গায়ক এই জ্যোৎস্নালোকে মাতোয়ারা হইয়া উঠিয়াছে।

পিতামহ কথা কহিলেন।

“বাণী, মনে হচ্ছে ভাগ্যে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলাম তাইতো এত আনন্দ পেলাম। ভৃগুটা আমাকে দাম্ভিক বলে' উপহাস করেছিল, সে বুঝতে পারেনি আমাকে। আমার আনন্দের প্রকাশকে আত্মার স্বতোৎসারিত উচ্ছ্বাসকে সে দম্ভ বলে' ভুল করেছিল, করবেই তো, যত বড় তপস্বীই হোক, মানুষ তো—”

"চুপ করুন"

"ও, আচ্ছা"

আবার উভয়ে নীরবে ভাসিতে লাগিলেন।

"একঘেয়ে ভাসতে কিন্তু আর ভাল লাগছে না বাণী। এই বাধাহীন স্বাধীনতায় জীবনের স্বাদ হারিয়ে ফেলছি যেন। বন্দী সিংহটাকে আমার হিংসে হচ্ছে—"

বাণীর দৃষ্টিতে চাপা হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"শিখর সেনের গল্পটা বন্ধ থাক তাহলে"

"চল একটু মুখ বদলে আসা যাক। অনেকক্ষণ হাঁস হয়ে আছি"

"ক্রমাগতই তো মুখ বদলাচ্ছেন"

তুমি আমার কল্পনার ভাষা, তুমিও বুঝতে পারছ না কেন বদলাচ্ছি। সৃষ্টি মানেই পরিবর্ত্তনের লীলা যে। ওই লীলার আবেগেই কয়লা হীরে হয়, গাছে ফুল ফোটে, শিশু বড় হয়, বুড়োরা মরে। রূপ থেকে রূপান্তরই সৃষ্টি, চার্ব্বাক থেকে শিখর সেন। শিখর সেনের গল্প অনেকক্ষণ তৈরী হয়ে গেছে, যথাকালে সেটা তোমার কবির মনে সঞ্চারিত করা যাবে। এখন বেচারাকে ঘুমুতে দাও না একটু, পাশের ঘরে ওর বউটা একা ছটফট করছে।"

"কুমার সুন্দরানন্দ যে সিংহটাকে বন্দী করে রেখেছে আপনি ঠিক সেই রকম সিংহ হতে চান"

"হ্যাঁ। তোমাকে হতে হবে সেই সিংহের খাঁচা। নিজে কারগার হয়ে আমাকে বন্দী কর তুমি, আর আমি গর্জ্জন করব তার মধ্যে বসে। চমৎকার হবে! চল—"

"চলুন"

জ্যোৎস্নালোকে পক্ষ বিস্তার করিয়া হংসমিথুন উড়িয়া গেল। ক্ষণকাল পরে এক নিবিড় অরণ্যের পশু-পক্ষীকে সচকিত করিয়া

গর্জ্জন করিয়া উঠিল দুর্দ্দান্ত এক সিংহ। পশু-পক্ষীরা সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। তাহারা জানিতে পারিল না যে এ সিংহ বাণী-কারাগারে বন্দী, তাহারা বুঝিতে পারিল না যে এ গর্জ্জন নয়, আনন্দিত স্রষ্টার অট্টহাস্য।

শ্রোণী গ্রামে যথাসময়ে গুণপতির শকটশ্রেণী উপস্থিত হইল। স্বয়ং কুলিশপাণিই ঘৃত-কুম্ভগুলি লইতে আসিয়াছিলেন। জালার ভিতর বসিয়া চার্ব্বাক অনুমান করিতেছিল যে অনেক অশ্বারোহীও বোধহয় সঙ্গে আসিয়াছে। কারণ অশ্বের হ্রেষা এবং ক্ষুর-ধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইতেছিল। অনেকগুলি ঘণ্টার শব্দও পাওয়া যাইতেছিল। চার্ব্বাকের মনে হইল ওগুলি সম্ভবত গরুর গলার ঘণ্টা। কুলিশপাণি ঘৃত-কুম্ভগুলিকে লইবার জন্য বোধহয় নূতন শকট আনিয়াছেন। সহসা চার্ব্বাক শুনিতে পাইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতি কথা বলিতেছেন। সে যে জালাটির ভিতর বসিয়া আছে ঠিক তাহার পাশে দাঁড়াইয়াই বলিতেছেন। কথা-বার্ত্তার ধরণে মনে হইল কুলিশপাণির সহিত গুণপতির হৃদ্যতা আছে। থাকিবারই কথা, গুণপতির মতো উৎকৃষ্ট ঘৃতসরবরাহকারী ও অঞ্চলে আর নাই। ও প্রদেশের সমস্ত যজ্ঞের আজ্য গুণপতিই সরবরাহ করেন। চার্ব্বাকের মনে হইল হয় তো তাঁহাকে শুনাইবার জন্যই গুণপতি কুলিশপাণিকে এই জালাটির নিকট আনিয়াছেন এবং এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। চার্ব্বাক রুদ্ধশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া রহিল। গুণপতি কহিলেন—"আর্য্য, কুমার সুন্দরানন্দ আরও তো অনেকবার যজ্ঞ করেছেন, কিন্তু এমন গোপনতার আশ্রয় নিতে তাঁকে তো ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। সত্যি বলছি ব্যাপারটা জানবার জন্যে বড়ই কৌতূহলী হয়েছি"

"আপনাকে বলতে আপত্তি নেই এ যজ্ঞ একটু অসাধারণ যজ্ঞ"

হ'চ্ছে। প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হলে' দুর্ব্বল-চিত্ত লোকেদের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, তাই কুমার এটার অনুষ্ঠান লোক-চক্ষুর বাইরে করেছেন"

গুণপতির কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না।

"অসাধারণ যজ্ঞ মানে ?"

"এতে নরবলি হবে। ঠিক নর নয়, নারী"

"বলেন কি !"

"নারীটির নাম শুনলে আপনি আরও চমকে যাবেন"

"কি রকম ?"

"নারীটি অপর কেউ নয়, কুমার সুন্দরানন্দের প্রিয়তমা নর্ত্তকী সুরঙ্গমা"

জালার মধ্যে চার্ব্বাক শিহরিয়া উঠিল।

১৮

কবি পুনরায় লিখিতেছিলেন।

"শিখর সেনের যে ডায়েরিটা আমি চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেয়েছি, যার থেকে দু' একটি অংশ উদ্ধৃতও করেছি ইতিপূর্ব্বে সেই ডায়েরিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি আছে।

১৯-৮-৩৪

হেডমাষ্টার মশাইয়ের কাছে আজ বকুনি খেয়েছি। বকুনির জন্য তত দুঃখ হয়নি, 'হোম্‌টাস্‌ক' করে' না নিয়ে গেলে বকুনি তো খেতেই হবে, আমার দুঃখ হচ্ছে মিথ্যা কথা বলেছি বলে। আমি টাস্‌ক করতে পারিনি আমার মাথা ধরেছিল বলে' নয়, আমি টাস্‌ক করতে পারি নি অবুর জন্যে। আমার পড়ার ঘরের জানালায় ও রোজ

আসবে লুকিয়ে—আর খালি বকর বকর করে' সময় নষ্ট করে' দেবে আমার। আমি কাল বলেছিলাম, তুই এমনভাবে বকর বকর করলে আমি 'হোম্‌টাস্‌ক' করব কি করে'। তার উত্তরে ও বললে, 'তোমার জানালার নীচে তো একদল ছাতারে পাখীও সব সময় কচর-বচর করছে তাতে তো তোমার পড়ার বাধা হয় না। আমি কি ছাতারে পাখীরও অধম না কি! যাও আর আসব না।' ঠোঁট ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ফের এল একটু পরে। আমি জিগ্যেস করলাম, ফের আবার এলি যে? বললে, 'আমার কান্না পাচ্ছে। বল, তুমি আমার ওপর রাগ কর নি।' বলেই ফিক করে' হেসে ফেললে। এরকম জ্বালাতন করলে কি হোম্‌টাস্‌ক করা যায়?

এর থেকে মনে হয় ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার আগেই শিখর অবঞ্চনার প্রেমে পড়েছিল। ডায়েরির আরও দু'একটা জায়গা থেকে তা বেশ বোঝা যায়। আলেয়ার সঙ্গে আমার পরিচয়টা তখন নানাবর্ণে রঙীন হয়ে আমার সমস্ত চেতনাকে পরিপ্লুত করে' রেখেছিল বলে' আমি ব্যাপারটা টের পাই নি। অথচ প্রত্যহই তখন ওর সঙ্গে দেখা হ'ত! একটা কথা আমি আবিষ্কার করেছি সম্প্রতি। আমরা যখন চোখ খুলে থাকি তখন যদিও বহুবিধ জিনিস আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু আমাদের অন্তরনিবাসী দ্রষ্টা দর্শন করেন শুধু একটি জিনিসকেই। কারণ তিনি শুধু দর্শনই করেন না তিনি তন্ময়ও হয়ে যান। তিনি যখন যা দেখেন তখন তা তাঁর অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করে, তা যেন অশেষ হয়ে ওঠে, কিছুতেই তার মহিমা শেষ হ'তে চায় না, নব নব রূপে রূপান্বিত হয়ে, তা যেন অনন্ত রূপের আকর হয়ে ওঠে তাঁর দৃষ্টিতে। আমি তখন আলেয়ার নিত্য নূতন মহিমা প্রত্যক্ষ করছিলাম, যতটা প্রত্যক্ষ করছিলাম তার চেয়ে অনেক

বেশী কল্পনা করছিলাম, তাই শিখর সেনের ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করতে পারি নি। শিখর সেনের ডায়েরি থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে অবন্ধনা ছাড়া আর কাউকে ভাল বাসে নি। অন্য কোনও স্ত্রীলোকের সংস্পর্শেও আসে নি। এই ঘটনাটা আমার মনে হিংসার উদ্রেক করেছে মাঝে মাঝে। মনে হয়েছে তার প্রেম আমার প্রেমের চেয়ে পবিত্রতর, আবার বিয়ে করে' হয়তো আমি আমার প্রেমের মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করেছি। কিন্তু ক্ষুন্ন যে করি নি, তা আমার অন্তর্য্যামী জানেন। আলেয়াকে ভালবাসার পরও আমি অপর একজনকে বিয়ে করেছিলাম কেন—এ প্রশ্ন আমি নিজেকে করেছি অনেকবার। আগে করেছি, এখন আর করি না। এখন বুঝেছি, কিছু করবার বা না-করবার মালিক আমি নই। যে শক্তি পাহাড়কে সমুদ্রে রূপান্তরিত করে, কুসুমের কোমল হৃদয়ে কীটের সংস্থান করতে ইতস্তত করে না, দেবতাকে পিশাচ এবং পিশাচকে দেবতায় পরিণত করতে যার এতটুকু দ্বিধা নেই, যে শক্তি এক বৃন্তে একটি ফুল ফুটিয়ে রূপ-সৃষ্টি করে, একাধিক ফুল ফুটিয়েও রূপ সৃষ্টি করে, ফুলকে ফলে উত্তীর্ণ করে' বা অকালে ঝরিয়ে দিয়ে যে সমান কৃতিত্ব এবং রসবোধের পরিচয় দেয়—আমি সেই শক্তির হস্তে ক্রীড়নক মাত্র। তারই প্রেরণায় আমি আলেয়াকে ভালবেসেছি, বিয়েও করেছি, আর একজনকে। দুটো কাজই আমি করেছি, যদিও আপাতদৃষ্টিতে সজ্ঞানে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই করেছি, তবু কিন্তু কোনটার উপরই আমার হাত ছিল না যেন। গাছের শাখায় কুসুমের সূচনা যে স্রষ্টার খেয়ালে হয়, সেই স্রষ্টাই সেই কুসুমের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। কুসুমের হয়তো মনে হয় সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সজ্ঞানে ফুটছে। শাস্ত্রবিৎ জ্ঞানীরা যাকে অদৃষ্টবাদী বা ভগবৎবিশ্বাসী বলেন আমি ঠিক সে জাতীয় লোকও নই, কারণ জীবনের প্রতিপদক্ষেপে আমি নির্ভর

করেছি নিজের চেষ্টার এবং বুদ্ধির উপর। নিজের আচরণের স্বপক্ষে ওকালতি করবার জন্যও আমি এসব যুক্তির অবতারণা করছি না— সত্যি সত্যি আমার যা মনে হয়েছে তাই আমি বলছি। বিয়ে করেছিলাম আমি মায়ের অনুরোধে, মায়ের কথা রাখবার জন্য। বাবা আমার শৈশবেই মারা গিয়েছিলেন, আমি মানুষ হয়েছিলাম মায়ের কাছে। সুনন্দার মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের আলাপ হয়েছিল কাশীতে এবং আমার বয়স যখন দশ বছর এবং সুনন্দার তিন বছর তখনই মা সেই তীর্থস্থানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সুনন্দাকে পুত্রবধূ করবেন। মায়ের এ প্রতিশ্রুতির উপর আমার কোনও হাত ছিল না, এ প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে' শস্তা বিদ্রোহের নিশান ওড়াবার প্রবৃত্তিও আমার হয় নি। আলেয়া আমাকে মুগ্ধ করেছে বলে' মাকে অপমানের কালিমায় লাঞ্ছিত করতে হবে, এ যুক্তি আমার মনে স্থান পায় নি। মাকেও আমি কম ভালবাসতাম না। তা ছাড়া আর একটা কথাও তখন মনে হয়েছিল। আলেয়াকে বিয়ে করে' কাছে পাবার কোন আশাই আমার ছিল না, সুনন্দাকে বিয়ে না করলে আমাকে মায়ের মনস্তাপের কারণ হয়ে সারা জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে হত। সে শক্তি আমার ছিল না। তা ছাড়া আর একটা কথাও ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম—স্বপ্নলোকের প্রিয়াকে বাস্তবের ধূলিধূমের মধ্যে ঠিক মতো পাওয়া যায় না। স্বপ্নলোকের নিষ্কলুষ বর্ণ-বিচিত্রার মধ্যেই তাকে মানায় ভালো, তার সঙ্গে কল্পনা-বিহার করেই তৃপ্তি পেতে হবে, বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগই থাকবে না—এসব যদি মানতে হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মানতে হবে যে বাস্তবের জন্য বাস্তবিক-সঙ্গিনীও একজন চাই। যেমন আমার কোথাও যদি যাওয়ার প্রয়োজন হয় আর প্রথম শ্রেণীতে যাওয়ার সঙ্গতি বা উপায় যদি না থাকে, তাহলে নিজের সঙ্গতি-অনুযায়ী

অন্য কোনও শ্রেণীর টিকিট কিনিতে হয়। আমি যে টিকিট কিনেছি তা একেবারে তৃতীয় শ্রেণীরও নয়। সুনন্দাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্য্যায়ে ফেললে অন্যায় হবে না। আমি যদি আলেয়াকে না দেখতাম হয়তো তাকে প্রথম শ্রেণীতেই ফেলতাম। ভেবেছিলাম কোন বিরোধ বাধবে না। কল্পলোকে থাকবে আলেয়া, আর মর্ত্ত্যলোকে সুনন্দা। কেউ কারও আভাসটুকু পর্য্যন্ত জানতে পারবে না। ভুল ভেবেছিলাম। আজ এক নূতন দৃষ্টি লাভ করে অনুভব করছি যে মর্ত্ত্যলোক আর কল্পলোক অভিন্ন নয়। শতদল কমলের মূল যেমন আলোকহীন পঙ্কস্তরে, কল্পলোকের মূলও তেমনি মর্ত্ত্যের মৃত্তিকায়। শুধু তাই নয়, এক লোকের বার্ত্তা রহস্যময় বেতার-যোগে বাহিতও হয় অপরলোকে। সুনন্দা কেমন করে' জানি না টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমার মন তাকে নিয়েই কৃতার্থ নয়, অন্য কোথাও সে আশ্রয় খুঁজছে। লাটাইটা তার হাতে আছে বটে, কিন্তু ঘুড়িটা উড়ছে আকাশে। মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হ'ত সুতোটা যদি কেটে যায়! তার এই আশঙ্কা বাঙ্ময় হয়ে আমাকেও চঞ্চল করে' তুলত। আমি তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারি নি যে তার সন্দেহটা অলীক! তার বাঁকা হাসি, তির্য্যক চাহনি, তার নানাবিধ কুটিল প্রশ্ন আমাকে যেন একটা অদৃশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিত অহরহ। শেষে একদিন সে আমাকে বললে, "আলেয়া বুঝি মেয়েটির নাম?" আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম, মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—"তুমি কি করে' জানলে!" মুচকি হেসে সুনন্দা বললে, "কাল স্বপ্নে সোহাগ করছিলে যে তাকে। সব শুনেছি আমি!" আমার অন্তরাত্মা শিউরে উঠল ভয়ে নয়, আনন্দে। স্বপ্নের কথা আমার মনে ছিল না। স্বপ্নে যে আলেয়াকে আমি কাছে পেয়েছিলাম, আদর করেছিলাম—এর এ অকাট্য প্রমাণ পেয়ে আমার সমস্ত সত্তা আনন্দিত হয়ে উঠল।

সুনন্দাকে বোঝালাম যে আলেয়া সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম কিছুদিন আগে, তাই বোধহয় স্বপ্নের ঘোরে এলোমেলো কিছু বলে থাকব। তারপর মুচকি হেসে বললাম, "তোমাকেই বারবার মনে পড়ছিল প্রবন্ধটা পড়তে পড়তে। তোমার চাল-চলন, ধরণ-ধারণ আলেয়ারই মতন তো। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দাও না!—যদি সোহাগ করে থাকি, তোমাকেই করেছি!" মেয়েরা কত সহজে ভোলে! আমার এই কথায় সুনন্দার চোখে-মুখে হাসির আভাস ছড়িয়ে পড়ল।

"কোথায় পড়েছিলে প্রবন্ধটা আমাকে দেখিও তো"

"লাইব্রেরিতে। আচ্ছা, নিয়ে আসব আজ—"

কথাটা মিছে নয়। সত্যিই লাইব্রেরিতে একখানা মাসিকপত্র ওলটাতে ওলটাতে 'আলেয়া' শীর্ষক প্রবন্ধ একটা নজরে পড়েছিল একদিন। 'আলেয়া' নাম দেখে প্রবন্ধটা পড়েও ফেলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নি। সেই প্রবন্ধটা এনে দেখিয়ে দিলাম সুনন্দাকে। কিন্তু সুনন্দা এতে উচ্ছ্বসিত হল না, মুচকি হেসে চুপ করে' রইল। বুঝতে পারলাম যে এতবড় যোগ্য একটা প্রমাণের বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছে না যদিও সে, কিন্তু মনের অবিশ্বাস তার ঘোচে নি। যে প্রমাণ অন্তর্যামীর বিশ্বাস-যোগ্য, সে প্রমাণ আমি হাজির করতে পারি নে। এইভাবেই চলছিল। আমি সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকতাম পাছে স্বপ্নের ঘোরে আবার কিছু বেফাঁস বলে' ফেলি, মনে হচ্ছিল কোনও উপায়ে যদি সুনন্দার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারি তাহলে হয়তো এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। সুযোগ জুটে গেল হঠাৎ একটা। বাড়িতেই বসেছিলাম এতদিন, কোনও চাকরি কিম্বা ব্যবসাতে ঢুকতে পারি নি। ভাল চাকরি পাওয়ার মতো

ডিগ্রি বা মুরুব্বির জোর ছিল না, ব্যবসা করবার মতো টাকাও ছিল না। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করা, আর বন্ধু-বান্ধবদের কিছু একটা জোগাড় করে' দেবার জন্যে চিঠি লেখা ছাড়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য আর কোন সজ্ঞান চেষ্টা করি নি। প্রয়োজনও হয় নি, কারণ মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান ছিল বাড়িতে। হঠাৎ বাল্যবন্ধু চন্দ্রমোহনের চিঠি পেলাম একটা। আমার চিঠির উত্তরে সে লিখেছিল, 'ভাই কমল-কিশোর, তুমি যদি কলিকাতায় এসে থাক তাহলে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আমি নিজে যে ব্যবসাটা বছর কয়েক আগে ফেঁদেছিলাম সেটার উন্নতি হয়েছে কিছু। আমি একা আর সেটাকে সামলাতে পারছি না, আমাকে প্রায়ই বাইরে বেরুতে হয়। কোলকাতার কাজকর্ম্ম দেখবার জন্য আমি একজন বিশ্বাসযোগ্য লোক খুঁজছি। তুমি যদি এসে সে ভার নাও, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। দেনা-পাওনার কথা সাক্ষাতে আলোচনা করব। তুমি একবার পারত চলে এস।' আমি অবিলম্বে চলে গেলাম। চন্দ্রমোহন আমাকে মাসিক দেড়শ' টাকা বেতন দিয়ে কর্ম্মচারী বাহাল করতে চেয়েছিল। আমি তাতে রাজি হই নি। মনে হল—বন্ধুর অধীনে চাকরি করিলে বন্ধুত্বও থাকে না, চাকরিও থাকে না। আমি তাকে বললাম, তোমার ব্যবসা আমি যথাসাধ্য দেখব, কিন্তু তার জন্যে মাইনে নেব না। তুমি যদি আমাকে রোজগারের অন্য কোনও উপায় দেখিয়ে দিতে পার তাহলেই যথেষ্ট হবে। চন্দ্রমোহন তাতেই রাজি হ'ল, তারই সুপারিশে এবং চেষ্টায় অনেক দালালির কাজ পেয়েছি, ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির ইন্‌সপেক্টার হয়েছি। চন্দ্রমোহনই আমাকে বউবাজারের এই বাসাটা দেখে দিয়েছে। সুনন্দার সান্নিধ্য ত্যাগ করে' নিশ্চিন্ত হয়েছি। কিন্তু আর একটা জিনিস আবিষ্কার করে' বিস্মিতও হয়েছি

একটু। কোলকাতায় এসেই সুনন্দাকে লিখেছিলাম—"মানুষের প্রতিভাকে যদি সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে এই কোলকাতা শহরকে সেই ব্রহ্মার একটা সেরা সৃষ্টি বলতে হবে। সেই সেরা সৃষ্টির মাঝখানে বসে' সেই সৃষ্টিকর্ত্তাকে আমার অন্তরাত্মা যে প্রশ্ন করতে চাইছে তা যদি তোমাকে লিখে জানাই তুমি হেসে ঠিক উড়িয়ে দেবে। কিন্তু বিশ্বাস কর সত্যিই আমার বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—'আমার সুনন্দা কি রূপে গুণে কোনও নারীর চেয়ে কম? তা' যদি না হয় তাহলে তোমার সেরা সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী বলে' সে অভিনন্দিত হচ্ছে না কেন। কেন সে অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে?' সেই সৃষ্টি-কর্ত্তাকে যদি সামনে পেতাম ঠিক এই কথাই জিজ্ঞাসা করতাম তাকে। এই জন্যেই তার এই সেরা সৃষ্টিটির মধ্যে তাকেই আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি অহরহ। আমি উপার্জ্জন করার জন্যে এখানে এসেছি বটে, আপাতদৃষ্টিতে ওইটেই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু আসলে আমি সন্ধান করছি সেই স্রষ্টাকে—যিনি যোগ্যতমকে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা দেন নি। দেখা পেলে আমি তাঁর জবাবদিহি চাইব। একটা মুশকিলে পড়েছি কিন্তু। তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে বসেও সে সৃষ্টির মর্ম্মলোকে পৌঁছতে পারছি না আমি। একটা অদৃশ্য নদী এসে যেন উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করে' আমার পথরোধ করছে। আমি কিছুতেই ঠিক সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থানটিতে পৌঁছতে পারছি না, যেখানে পৌঁছলে আমার আশা আছে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার দেখা পাব। আধুনিক যুগে সৃষ্টিকর্ত্তা কারা জান? আধুনিক যুগের মনীষীরা। পৌরাণিক চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা এ যুগে লক্ষ-মুখ হয়ে বহুধা হয়েছেন। তাই এ যুগের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে যেতে হবে সেই সব মনীষীদের কাছে। কিন্তু আমি যেতে পারছি না। আমার দ্বিধা, আমার সঙ্কোচ, আমার

মানসিক দৈন্য, এক কথায় আমার সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য এক বিরাট নদী-রূপে এসে আমার পথরোধ করছে। আমি অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি সেই ভীষণ নদীর তীরে। জানি না কোন দিন নদী পার হ'তে পারব কি না...।" যে মনোভাব আমাকে এই চিঠি লিখতে প্রণোদিত করেছিল তা যদি কেউ প্রতারকের মনোভাব বলে' মনে করেন আমি আপত্তি করব না। তাঁকে শুধু একটি জিনিষ মনে রাখতে অনুরোধ করব যে পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু ও ভাব যেমন একাধিক উপাদানের সমন্বয়লীলা, আমার এই মনোভাবটিও তেমনি। আমি কথার পরে কথা গেঁথে সুনন্দাকে ঠকাতেই চাই নি কেবল, আমার অন্তরের একটা সত্য উপলব্ধিকেও রূপ দিতে চেষ্টা করেছি। বিচিত্র কোলকাতা শহরের বৃহত্ব আমাকে শুধু অভিভূতই করে নি, কৌতূহলীও করেছে, লজ্জিতও করেছে। কৌতূহলী হয়েছি এ যুগের স্রষ্টাদের—ব্রহ্মাদের—পরিচয় লাভ করবার জন্য। বারম্বার মনে হয়েছে এই শহরের বিশালত্বের মধ্যেই আছেন তাঁরা। আমার সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য-জনিত অযোগ্যতাই তফাত করে রেখেছে আমাকে তাঁদের সান্নিধ্য থেকে। আমি যেন একটা দুস্তর নদীর এক তীরে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছি অপর তীরের। পার হতে পারছি না! আমার এই সত্য মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ওই চিঠির ভাষায়। তবে এটাও নিঃসন্দেহে সত্য যে যদি কোন দিন আমি নদী পার হয়ে স্রষ্টাদের দেখা পাই তাহলে তাদের সুনন্দার কথা জিজ্ঞাসা করব না। আমি জিজ্ঞাসা করব, যাকে আমি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিলাম তাকে পেলাম না কেন? তোমাদের চক্রান্তেই কি এই নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে? এ অন্যায়ের সুবিচার কি কোথাও আছে? আমার আলেয়া কি চিরকালই অন্ধকারের বুক আলো করবে? সত্যের দিবালোকে পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠবার সুযোগ কি কোনদিনই

সে পাবে না ? হে আধুনিক যুগের সৃষ্টিকর্তারা, সত্যিই কি এর কোন প্রতিকার নেই ? তোমাদের যদি কোনও ক্ষমতা থাকে, আলেয়াকে আমার কাছে এনে দাও। এর জন্য যে কোনও কৃচ্ছ্র সাধন করতে প্রস্তুত আছি আমি…।

বিস্মিত হলাম যখন আমার শ্যালক শন্টু এসে হাজির হ'ল একদিন। বলল—"দিদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আপনাকে এই চিঠিটা আর এই পার্শ্বেলটা দিয়েছেন"

"পার্শ্বেলে কি আছে ?"

মুচকি হেসে শন্টু বললে—"কোন খাবার-টাবার করে' পাঠিয়েছেন বোধ হয়। আমি কোলকাতা থেকে কাশী যাব শুনে বললে তোর জামাইবাবুকে এটা দিয়ে যাস তাহলে। আমি আর দাঁড়াব না। আমার ট্রেন একটু পরেই"

শন্টু আর দাঁড়াল না।

চিঠিটা খুলে দেখলাম সুনন্দা লিখেছে—

শ্রীচরণেষু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কি লিখেছ, ভাল করে বুঝতে পারি নি সবটা। 'দারিদ্র্য' কথাটা অবশ্য বুঝেছি। আমার সোনার হারটা আর অনন্ত দুটো তাই পাঠালাম শন্টুর হাতে। ওসব পরবার শখ আমার মিটে গেছে। তোমার যদি উপকার হয় বিক্রি করে দিও…"

চিঠিটা পড়ে আর গয়নাগুলো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মনে হল সুনন্দা আমার চেয়ে অনেক বড়। মনে হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু তার গয়নাগুলো বিক্রি করেছি ; সেদিন যে অত টাকা দিয়ে দূরবীণটা কিনে আনলাম তা ওই গয়না বিক্রির টাকাতেই !

কল্পলোকের মানসী দূরবীক্ষণের কাঁচের মধ্যে এসে ধরা দিলে

অবশেষে। দূর এবং নিকটের একটা অদ্ভুত সম্মিলন আমাকে দার্শনিক করে তুলল যদি বলি, তাহলে কিন্তু আমার মানসিক অবস্থার ঠিক বর্ণনা দেওয়া হবে না। কারণ দার্শনিকরা তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যকে যে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করেন আমার তা ছিল না। আমি নিষ্ঠার সহিত প্রত্যক্ষ করছিলাম, কিন্তু অবিচলিত থাকতে পারছিলাম না। অধীর হয়ে পড়ছিলাম। আলেয়াকে নানারূপে নানাভঙ্গীতে সুখদুঃখের বেশ-বিন্যাসের নানা আবেষ্টনীতে রোজই দেখতাম, আর রোজই মনে হ'ত দূরবীণের মধ্যে দিয়ে যাকে পাচ্ছি সে তো আলেয়া নয়, সে তো আলেয়ার ছবি মাত্র, সিনেমার ছবির মতো আপাতদৃষ্টিতে জীবন্ত হলেও ওটা ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। একথা মনে হলেই কেমন যেন একটা অতৃপ্তি হ'ত। এই অতৃপ্তিতে হঠাৎ একদিন নূতন রঙ লাগল। মনে হ'ল আমার এই চোখ দুটোও তো দূরবীণের মতই যন্ত্র মাত্র, সেই যন্ত্রের মাধ্যমে এতদিন আলেয়ার যে রূপ দেখেছি সেটাও তো ছবি! চক্ষু-দৃষ্ট ছবিটা যদি আমাকে তৃপ্ত করে না থাকে দূরবীক্ষণদৃষ্ট ছবিটাই বা করবে কেন? হঠাৎ মনে হল সত্যিই কি আলেয়াকে দূর থেকে দেখে তৃপ্ত হয়েছিলাম? হই নি। আমি চেয়েছিলাম···যা চেয়েছিলাম তা এতই আদিম কামনা যে আধুনিক সমাজে তা উচ্চারণ করাও পাপ। দূরবীক্ষণ-দৃষ্ট আলেয়ার ছবিতে আমার এই কামনার রঙ লেগে, আমার অতৃপ্তির সঙ্গে আমার বাসনা যুক্ত হয়ে—আমার কল্পনা আমাকে যে জগতে উত্তীর্ণ করে' দিয়েছিল সেখানে বউবাজার স্ট্রীট ছিল না, ছিল আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ, ছিল সোনার-কাঠি রূপোর-কাঠি, ছিল স্বর্ণলঙ্কার যুদ্ধক্ষেত্রে সীতার জন্য রাম-রাবণের যুদ্ধ, আরও অনেক কিছু ছিল···।

সুতরাং শিখর সেনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কার

মুখে যেন শুনেছিলাম যে সে এম. এস-সি. পাশ করেছে। বাল্য-বন্ধুদের সম্বন্ধে এই ধরণের টুকরো-টাকরা খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অনেক সময়। শিখরের সম্বন্ধে কোনও কৌতূহলই ছিল না আমার। হঠাৎ চন্দ্রমোহন একদিন এসে বললে, "শিখরকে মনে আছে তোর ?"

"আছে বই কি"

"শুনছি তার মামা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে"

"তাই না কি"

হ্যাঁ। আমি গাঁয়ে গিয়েছিলাম একটা কাজে। গিয়ে দেখলাম, মোহন মুদির দোকানে কেমিষ্ট্রির ভাল ভাল বই সাজানো রয়েছে। অবাক হলাম একটু। জিগ্যেস্ করাতে মোহন মুদিই বলল যে, শিখরবাবুকে তার মামা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এই বইগুলো এবং আরও অনেক খাতাপত্র সব শিখরবাবুর। তাঁর মামা আমাকে পুরানো কাগজের দরে বিক্রি করে' দিয়েছেন এগুলো। শুনে আমার একটু কৌতূহল হল, আমি তার খাতাপত্র হাঁটকাতে হাঁটকাতে তার পুরানো ডায়েরি পেলাম একখানা। সেইটে নিয়ে এসেছি—"

"শিখরের মামা তাকে তাড়িয়ে দিলে কেন"

"এ কেন'র উত্তর ওই 'ডায়েরিতেই' পাবে। কাল দিয়ে যাব খাতাগুলো তোমাকে"

এর পরের অংশটুকু শিখরের জবানীতেই শুনুন।

তার ডায়েরির পাতা থেকে হুবহু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"বিজ্ঞানের ছাত্র আমি। যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিকেই আমি জীবন-যাত্রায় বাহন করেছি। পুরানো সেকালে নড়বড়ে কুসংস্কারের গো-শকটে চড়ে' যাঁরা অতি-আধুনিক মডেলের মোটরকারকে গাল পাড়েন, তাঁরাই কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়েছেন আমার জীবনপথের সঙ্গী। তাঁদের

গালাগালি স্মিতমুখে আমি সহ্য করে' যেতাম, কিন্তু হঠাৎ একদিন সব ভেঙ্গে পড়ল। অবন্ধনাকে আমি কেন ভালোবেসেছি এর কোন জবাব নেই। সকালে সূর্য্য ওঠে কেন, গাছে ফুল ফোটে কেন, সূর্য্য-ওঠা বা ফুল-ফোটা আমার মায়ের বা কয়েদী গাঙুলীর সম্মতি অনুসারে হচ্ছে না কেন, এসবেরও কোনও জবাব নেই। আশ্চর্য্যের বিষয়, ওই সব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোর অনিবার্য্য আবির্ভাব মা এবং কয়েদী গাঙুলী মেনে নিয়েছেন, আমার সঙ্গে অবন্ধনার প্রণয় ব্যাপারটা তাঁরা মানতে পারলেন না। যে অবন্ধনার সঙ্গে আমি এক সঙ্গে কুলগাছে উঠেছি, পুকুরে সাঁতার কেটেছি, খেয়েছি, শুয়েছি, ঝগড়া করেছি, ভাব করেছি, সেই অবন্ধনাকে আমি যখন বিয়ে করতে চাইলাম তখন আশ্চর্য্য হয়ে গেল সবাই। জাতের মিল নেই —বিয়ে হবে কি করে'। অবন্ধনার অবশ্য বদনামও ছিল অনেক। কোনও সুন্দরী মেয়ে যদি একটু পুরুষ-ঘেঁসা হয়, চটকদার শাড়ি পরে' ছিমছাম হয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়ায় তাহলে তার আর ক্ষমা নেই। অবন্ধনা সত্যিই কাউকে গ্রাহ্য করে না। অবলীলাক্রমে সে বেড়িয়ে বেড়ায় নবীন ছুলের সঙ্গে ঘাটে-মাঠে বনে-বাদাড়ে। আমি যখন ছুটিতে বাড়ি আসি, নিত্য নূতন শাড়ি পরে' ঘুরে বেড়ায় আমার চোখের সামনে। আমার শোওয়ার ঘরের কাছে যে বেলগাছটা আছে তার উপর চড়ে' গভীর রাত্রে আমার শোওয়ার ঘরে চলে আসতেও দ্বিধা করে নি সে কখনও। একদিন কানে দুটো চমৎকার দুল পরে এসে হাজির। হেসে বললে, "দুল পরে' আমাকে কেমন দেখাচ্ছে বল তো"

"চমৎকার। কে দিলে দুল—"

"কেউ দেয় নি। আমি পিসিমার দুল জোড়া চুরি করে' পরে এসেছি তোমাকে দেখাব বলে'। বেশ মানিয়েছে, না?"

"চমৎকার মানিয়েছে"

"কাল নব্‌নে পদ্মপাতার পাপড়ি দিয়ে সুন্দর একটা টায়রা করে' দিয়েছিল আমাকে। আবার করে' দেবে বলেছে, তুমিও এস না কালিন্দীতে, অজস্র পদ্ম ফুটেছে সেখানে, কাল দুপুরে যেও কেমন?"

"যাব—"

মাকে একদিন বললাম যে, আমি অবন্ধনাকে বিয়ে করতে চাই। সংবাদটা যে তাঁর কর্ণে মধুবর্ষণ করল না, তা তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারলাম।

বললেন—"ওই ভাবুনে মেয়েকে বিয়ে করবি! বলিহারী তোর পছন্দকে! তা ছাড়া ওরা বামুন—বিয়ে দেবে কেন ওরা!"

"সে আমি ওর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলে' ঠিক করে নেব। তুমি মত দাও"

মা স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। সে দৃষ্টিতে যা নীরব ভাষায় ব্যক্ত হল তা এই—এত কষ্ট করে' তোকে মানুষ করলাম' তুই শেষে আমার বুকে এত বড় শেল হানবি! মায়ের এ দৃষ্টি কিন্তু আমাকে নিরস্ত করতে পারল না। আমি কয়াধুনাথের কাছে গিয়ে হাজির হলাম একদিন। ভাবলাম, ওঁকে যদি রাজি করতে পারি, মা-ও রাজি হয়ে যাবেন শেষ পর্য্যন্ত।

আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে কথাটা শুনে কয়াধু বোমার মতো ফেটে পড়বেন। কিন্তু সে সব কিছুই করলেন না তিনি। আমার সমস্ত কথাগুলি ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' আগাগোড়া শুনলেন। তাঁর কটা গোঁফদাড়ির জঙ্গলে সামান্য একটু চাঞ্চল্য জাগল শুধু। তার পর ধীর-কণ্ঠে বললেন—"তোমার মতো সুপাত্রের হাতে ওকে দিতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তুমি অব্রাহ্মণ, অব্‌ কুলীন নীলাম্বর মুকুজ্যের মেয়ে। তোমাদের বিয়ে হওয়া তো সম্ভব নয়—"

বললাম—"আপনি তো অনেক শাস্ত্র পড়েছেন। শাস্ত্র ঘাঁটালে দেখতে পাবেন শাস্ত্রকাররা যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ সমর্থন করেছেন তাতে জাতকুলের বিচার নেই"

কয়েদী গাঙুলীর গোঁফ-দাড়িতে আর একবার ঢেউ খেলে গেল। বললেন—"আমরা গন্ধর্ব্ব নই, গন্ধর্ব্বলোকে বাসও করছি না, গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা ভাবতেই পারি না আমরা। যে সমাজে আমরা বাস করি সেই সমাজের আইন মেনে চলতে হবে আমাদের—শাস্ত্রের এই উপদেশ"

সবিনয়ে বললাম—"কিন্তু শাস্ত্রের চেয়ে কি মানুষ বড় নয়? আমি যখন অবুকে চাই, আর অবুও যখন আমাকে চায়—"

কয়াধু বাধা দিলেন এইখানে।

বললেন—"তুমি যে অবুকে চাও, তা তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি। কিন্তু অবু যে তোমাকে চায় একথা বুঝব কি করে?"

"অবু আমাকে বলেছে। আপনি তাকে জিগ্যেস্ করে' দেখতে পারেন—"

কয়াধুর ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হল, গোঁফ-দাড়িগুলো নড়ে উঠল আর একবার।

বললেন—"বেশ, ভেবে দেখব। তুমি যাও এখন—"

সেই দিনই গভীর রাত্রে অবু এসে হাজির আমার শোওয়ার ঘরে। রাত্রি তখন দেড়টা। দেখি তার শাড়ী ছিঁড়ে গেছে, গা ছড়ে' গেছে। সম্ভবতঃ বেলের কাঁটায়।

বললাম—"একি—!"

"পালাই চল"

"পালাব? তার মানে—"

"না পালালে পিসেমশাই মেরে ফেলবে আমাকে। এই দেখ—"

পিঠের কাপড় তুলে দেখালে সে। দেখলাম, কালো কালো দাগে সমস্ত পিঠটা ভরতি।

"কি এ?"

"বেত মেরেছে। কাল থেকে আমাকে ঘরে তালা দিয়ে রাখবে বলেছে। পালাই চল"

"কোথায় পালাব এখন"

"যেদিকে দু' চোখ যায়। চল, ওঠ, আর দেরী কোরো না—"

আমি চুপ করে, রইলাম।

"দেরী করছ কেন, ওঠ না"

"এরকম ভাবে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে। মানে—"

"আমি তাহলে চললুম"

পরমুহূর্ত্তেই বেরিয়ে গেল সে। পরদিন সকালে শোনা গেল নবীন দুলেও অন্তর্দ্ধান করেছে।

১২-৮-৪০

গ্রামে কলেরা লেগেছে। চারিদিকে লোক মরছে, মানুষ নয় যেন মাছি। নবীন দুলের মা বাবা ভাই বোন সব মরে গেল। কায়স্থ পাড়াতেও দু'জনের হয়েছে শুনলাম। আতঙ্কে থম থম করছে চারিদিক। ক্লয়েদী গাঙুলী শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন। বিলাসদের চণ্ডীমণ্ডপে অষ্টপ্রহরব্যাপী কীর্ত্তন শুরু হয়েছে। যেদিন মাকে অবুর সঙ্গে বিয়ের কথা বলেছিলাম সেদিন থেকে মা আর বাক্যালাপ করেন নি আমার সঙ্গে। কাল থেকে শয্যা নিয়েছেন। মাঝে মাঝে অস্ফুটকণ্ঠে কেবল বলছেন, 'মা রক্ষা কর,' 'মা রক্ষা কর'। আমি কি যে করব ভেবে পাচ্ছি না। অবু কোথায় গেল? নবীন দুলের সঙ্গে পালিয়ে গেল? মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে পালিয়ে গিয়ে ভালই

করেছে। যা কলেরা লেগেছে চারিদিকে…। কিন্তু গেল কোথায় সে! নবীন ঢুলের সঙ্গে…?

১৪-৮-৪০

কালরাত্রে মা মারা গেলেন। মনে হল, কলেরার হাতে ইচ্ছে করে' সঁপে দিলেন নিজেকে। নিজে হাতে আমি যে খাবার জল রোজ ফুটিয়ে রাখি সে জল একদিনও স্পর্শ করেন নি। পুকুরের জল খেতেন। মৃত্যুকালে তাঁর মুখে জল দিতে গেলাম, মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আশ্চর্য্য দেশে জন্মেছি। ভালবেসেছি—এই অপরাধে অস্পৃশ্য হয়ে গেলাম। ভালবাসার চেয়ে এখানে জাত বড়, জাতের পাঁচিল মা আর ছেলের মাঝখানেও দুর্লজ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করে। অথচ এই দেশের লোকই আবার রাধাকৃষ্ণের প্রেমে গদগদ। সত্যিই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে এ দেশে লেখাপড়া শেখা বৃথা, মনে হচ্ছে আমি এদেশের কেউ নই…

২০-৮-৪০

কাল রাত্রে মামা আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে জন্মের মত আমাকে চলে' যেতে হবে। তিনি আর আমাকে বাড়িতে স্থান দিতে পারবেন না। বলছেন, আমাদের অনাচারেই নাকি গ্রামে এই ভয়ঙ্কর মহামারি সুরু হয়েছে। এ বিধাতার অভিশাপ। অবু গেছে, আমি না গেলে রুষ্ট বিধাতা তুষ্ট হবেন না। আজ একটু পরেই চলে যাব। এখান থেকে কিছুই নিয়ে যাব না। এমন কি এই ডায়েরির খাতাখানা পর্য্যন্ত নয়। এ খাতা মামার পয়সায় কেনা। একটি জামা, একটি কাপড় এবং জুতো জোড়াটি পরে বেরিয়ে যাব শুধু। স্বোপার্জ্জিত অর্থে নিজের জামা-কাপড়-জুতো যখন

কিনতে পারব তখন ওগুলোও ফিরিয়ে দেব মামাকে। কোথায় যাব কোলকাতাতেই একমাত্র স্থান, যেখানে রোজকার করবার সম্ভাবনা অবুকেও খুঁজব। খুঁজে বার করতেই হবে তাকে। মাপ চাইতে হবে তার কাছে। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে সে যখন আমার সাহায্য চেয়েছিল আমি তাহাকে সাহায্য করি নি। ধিক্ আমার পৌরুষকে। অবুকে খুঁজে বার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য হবে এখন। ভাবছি—অবুর সন্ধানের সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের প্রচেষ্টাকে খাপ খাওয়াব কি করে'? পুলিশে চাকরির চেষ্টা করলে কেমন হয়! আমার এক সহপাঠীর দাদা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগে বড় চাকরি করেন। ভাবছি তার সঙ্গে গিয়েই দেখা করব।...

এইখানেই শিখরের ডায়েরি শেষ হয়েছে। কলেরার খবরটা জানতাম। কারণ কলেরা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমস্ত পরিবার কাশীতে চলে যায়। সুনন্দার বাপের বাড়ী কাশীতে। শিখরের খবর কিন্তু আর পাই নি। চেষ্টাও করিনি খবর নেবার। অথচ শিখরের সঙ্গে সত্যিই আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল, 'প্রগাঢ়' বিশেষণ দিয়ে বললেও অত্যুক্তি হবে না কথাটা। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার পর তার সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহটা কেমন ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মনের স্বভাব অতি বিচিত্র। কত তুচ্ছ জিনিস সে নিজের ভাণ্ডারে সযত্নে সঞ্চয় করে রাখে, আবার কত বৃহৎ জিনিসকেও ফেলে দেয়। যে মানদণ্ড দিয়ে সে বাছাই করে তা অতি সূক্ষ্ম। নিজেও সব সময়ে বুঝতে পারি না তার মর্ম্ম। আর একটা জিনিসও জীবনে লক্ষ্য করেছি। যাকে ভুলে গেছি সে অপ্রত্যাশিতভাবে মাঝে মাঝে আবার দেখা দেয়, তার আকস্মিক আবির্ভাবটা যেন মৌন ব্যঙ্গের সুরে নীরব ভাষায় বলতে থাকে, 'এর মধ্যেই সব ফুরিয়ে গেল!'...ফুরিয়ে যাওয়াটাই জীবনের ধর্ম্ম। একটা জিনিসকে নিয়ে

বেশীক্ষণ সে থাকতে চায় না ; কারণ যা সে চায় একটা জিনিসের মধ্যে তাকে পায় না, সে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে অনুসন্ধান করে বেড়ায় তার কাম্যকে, আমরণ চলে এই অনুসন্ধান, মরণের পরও হয়তো চলে। আলেয়াও ফুরিয়ে যাবে না কি একদিন? মনে হয়, যাবে না। কারণ আমার অনুসন্ধানের নাগালের মধ্যে সে ধরাই দেবে না কখনও। তার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল চির-উৎসুক থাকবে, সাধকের যেমন থাকে আরাধ্য দেবতার সম্বন্ধে। শিখরের ডায়েরিটা যেদিন চন্দ্রমোহনের কাছ থেকে পেলাম, সেদিন শিখরই যেন নবরূপে আবির্ভূত হল আবার। তার সঙ্গে একটা একাত্মতাও অনুভব করলাম যেন। মনে হল আমরা দু'জনেই একপথের পথিক। একটু লজ্জাও হল। শিখর প্রেমের জন্য গৃহহারা হয়েছে, মায়ের স্নেহ হারিয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছে অবন্ধনার খোঁজে···আমি কি করেছি! নিজেকে আমি বারম্বার বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে প্রয়োজন হলে আমি ওর চেয়েও বেশী ত্যাগ স্বীকার করতে পারতাম। প্রয়োজন হয় নি, তাই করি নি। কিন্তু আমার যুক্তি আমার কাছেই খেলো মনে হয়েছে বারম্বার। সুনন্দার মুখখানাও মানসপটে ফুটে উঠেছে, তার ভ্রূভঙ্গিতে চোখের চাহনিতে জেগেছে স-বিদ্রূপ প্রশ্ন—"সত্যিই কি পারতে?"···স্বীকার করতে হয়েছে পারতাম না। আমি সুবিধাবাদী ; শ্যাম এবং কুল দুইই বজায় রাখতে চেয়েছি।···আমি শিখর সেনকে এর পর থেকে কিছুদিন যে রূপে কল্পনা করেছি তা সন্ন্যাসীর রূপ। মনে হয়েছে মহাদেবের মতো অদৃশ্য সতীর শব বহন করে' সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ভারতবর্ষময়। শোকোন্মত্ত দেবতার বেদনায় ত্রিভুবন কেঁপে উঠেছিল, শিখর সেনের শোক কাউকে বিচলিত করবে না। অন্তর্হিতা সতীর দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে সৃষ্টি করেছে একান্ন পীঠস্থান, অসংখ্য পূজারী আজও অর্ঘ্য বহন

করে' নিয়ে চলেছে সতীর স্মৃতিপূত পুণ্যতীর্থে, তাদের প্রণয়-কাহিনী আজও ধ্বনিত হচ্ছে সাহিত্যে ধর্ম্মে, তর্পণের বিবিধ মন্ত্রগাথায়। অবঞ্চনাকে কিন্তু কেউ মনে করে' রাখবে না। বিস্মৃতির অতলে সে নিঃশেষ হয়ে যাবে, চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। সমাজেও তার স্থান হয় নি, মানুষের মনেও তার স্থান হবে না। তার আত্মীয়-স্বজনদের মনে একটা কুৎসিত ঘায়ের মতো সে দগদগ করবে কিছুদিন, লজ্জায় সেটাকে ঢেকে রাখবে সবাই, তারপর তা-ও আর থাকবে না। থাকবে শুধু একটা চিহ্ন, গৌরবের নয়, লজ্জার। শিখর সেনের মনের মন্দিরেই হয়তো তা জ্বলছে পবিত্র হোমশিখার মতো। গৃহহারা শিখর সেন কোথায় এখন···? শিখর সেনকে যতটুকু আমি দেখেছিলাম এবং তার সম্বন্ধে যতটুকু খবর আমি পেয়েছিলাম ততটুকুই আমার সম্বল ছিল। ওইটুকুকে কেন্দ্র ক'রেই আমার কল্পনা রঙীন হয়ে উঠেছিল। অপ্রত্যাশিত কিছু আমরা কল্পনা করতে পারি না। গুটি থেকে প্রজাপতির আবির্ভাব, বা ফুল থেকে ফলের পরিণতি কল্পনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হ'ত—যদি না আমরা তা প্রত্যক্ষ করতাম। যে শিখর সেনকে কল্পনায় শঙ্করের সঙ্গে তুলনা করেছিলাম তার খাকি হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা মূর্ত্তি দেখে তাই চমকে গেলাম একদিন। আমার এক পিসতুতো ভাই শৈল পুলিশের চাকরি করত, সেই একদিন পরিচয় করিয়ে দিলে রাস্তায় হঠাৎ। শিখর সেন পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি করছে। অবঞ্চনার প্রেমে উন্মাদ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে না! সত্যিই আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

নিবিড় অরণ্যের অন্ধকার আর সিংহ গর্জ্জনে কম্পিত হইতেছিল না। যে স্থানে বাণী-কারাগারে সিংহরূপী পিতামহ গর্জ্জন করিতেছিলেন, সে স্থান অসংখ্য খদ্যোত-আলোকে খচিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন স্রষ্টার অন্তরের অনন্ত আকুতি অসংখ্য কিরণ-কণিকায় স্পন্দিত হইতেছে, অনির্ব্বচনীয় বুঝি আলোকের ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সহসা সেই আলোক-বিন্দুগুলি বাঙ্ময় হইয়া উঠিল। পিতামহ কহিলেন—"বাণী তোমার অনুরোধ আমি বারবার লঙ্ঘন করে ফেলেছি। আমি কিছুতেই আমার পুরাতন সৃষ্টির প্রতি-মুহূর্ত্তের বিবর্ত্তনকে অনুসরণ করতে পারছি না। আমার কল্পনা কেবলই আমাকে অন্যমনস্ক করে' দিচ্ছে। সুন্দরানন্দ যে সিংহটিকে বন্দী করে' রেখেছে তাকে দেখে আমার হিংসা হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বন্দিত্বের বিরুদ্ধে তার যে প্রতিবাদ, তর্জ্জন-গর্জ্জনের মধ্যে তার প্রবুদ্ধ প্রাণশক্তির যে নিষ্ফল আক্রোশ তা নিজের মধ্যে অনুভব করলে বুঝি অভূতপূর্ব্ব কিছু একটা পাব। কিন্তু কিছুই পেলাম না, মনে হচ্ছে সময় নষ্ট হল খালি। কেন এরকম হ'ল বল তো?"

কেহ কোনও উত্তর দিল না।

"বাণী, তুমি কোথা গেলে"

নিবিড় অরণ্যের বনস্পতিকুল যেন জাগিয়া উঠিল। তাহাদের শাখায়-পল্লবে পত্রে-কিশলয়ে মৃদু মর্ম্মরধ্বনিও শোনা গেল। বাণী বাঙ্ময়ী হইলেন।

"কোথাও যাইনি"

"আমি যা বললাম শুনেছ?"

"শুনেছি"

"উত্তরে কিছু বললে না যে!"

"আসল সিংহের নিদারুণ বন্দিত্ব—আর নকল সিংহের বন্দিত্বের অভিনয় কি এক হতে পারে কখনও! আপনি খেলা করছিলেন। এ খেলার শখ যদি মিটে থাকে, চলুন আর একটা খেলায় মাতা যাক"

"মনে হচ্ছে চটেছ! কিন্তু আমি বন্দী-সিংহ সাজতে চেয়েছিলাম কেন তা বোধহয় বুঝতে পারনি! স্বৈরচর সৃষ্টি করবার কল্পনাটা এখনও মাঝে মাঝে উতলা করছে আমাকে। মনে হচ্ছিল ওই সিংহটার যদি মশা হবার ক্ষমতা থাকত, তাহলে কি ওকে কেউ বন্দী করে' রাখতে পারে? সিংহ সেজে অনুভব করবার চেষ্টা করছিলাম, সত্যি সত্যি কতটা কষ্ট ও ভোগ করছে। কিন্তু কিছুই তো অনুভব করতে পারলাম না। আমার বরং বেশ মজা লাগছিল"

"তা তো লাগবেই। আপনি যে অভিনয় করছিলেন। তা ছাড়া আপনার মনও কি এখানে ছিল সব সময়? আপনি শিখর সেনের গল্পটা কেমন লেখা হচ্ছে তা জানবার জন্য বারবার চলে যাচ্ছিলেন যে—"

"তুমি টের পেয়েছ সেটা তাহলে—"

"পাব না? আমিও যে যাচ্ছিলাম"

"সত্যি কথা বলব তাহলে? শুধু কবির মনে নয়, বহু স্থানে গিয়েছিলাম আমি। কিশলয়-কোরকে, ফুলের কুঁড়িতে, ফলের সম্ভাবনায়, শিল্পীর স্বপ্নে—যেখানে যত সৃষ্টির স্বপ্ন মূর্ত্ত হচ্ছে সেখানেই গিয়েছিলাম আমি"

"সব জানি"

"তুমি জানবে না? অথচ ধমকাচ্ছ আমাকে, কি অশ্চর্য্য!"

অরণ্যের মর্ম্মরধ্বনি সহসা থামিয়া গেল। অরণ্যের প্রান্তে অন্ধ-

কারের বুকে একটি মনোহর আলেয়া মূর্ত্ত হইল সহসা। অরণ্যপ্রান্ত হইতে ক্রমশ তাহা সরিয়া যাইতে লাগিল। খদ্যোতকুল আকুল হইয়া উঠিল।

"তুমি কোথায় চলেছ বাণী"

"চলুন সুন্দরানন্দের আসল সিংহটাকে দেখে আসা যাক। চার্ব্বাকের খবরটাও পাওয়া যাবে"

"সে তো জালার ভিতর বসে' আছে। জালা থেকে বেরুক আগে"

"এখনি বেরুবে"

"চল তাহলে"

সুন্দরানন্দ যে অরণ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন সেখানে কোনও প্রাসাদ তো ছিলই না—সুরক্ষিত কোনও গৃহও ছিল না। প্রথমে অরণ্যের কিছু অংশ পরিষ্কৃত করাইয়া মৃগয়ার জন্য কয়েকটি শিবির ফেলা হইয়াছিল মাত্র। বহুকাল পূর্ব্বে যে বিদেশী রাজকুমারের সঙ্গে নর্ম্মদাতীরে সুন্দরানন্দের সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, কুম্ভীর শিকারে যাঁহার অদ্ভুত লক্ষ্যভেদের পরিচয় পাইয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি যে সিংহের সন্ধানে মধ্যপ্রদেশের অরণ্যে অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং পুনরায় যে তাঁহার সহিত দেখা হইয়া যাইবে তাহা সুন্দরানন্দ প্রত্যাশা করেন নাই। গ্রীস দেশের সেই রাজপুত্র যে কিরাতের বেশে একটি হরিণ ভিক্ষা করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ইহা সত্যই তাঁহার কল্পনাতীত ছিল। কিরাতের দলে কিরাতের বেশে মিম্মিরকে প্রথমে তিনি চিনিতেই পারেন নাই। একটি বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় কিরাতের অস্বাভাবিক গৌরবর্ণ এবং নীলচক্ষু তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিতেছিল মাত্র, বিস্মৃতির

কুয়াশা কাটে নাই। সহসা মিশ্মির যখন পালক-নির্মিত উষ্ণীষ খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যখন তাঁহার কুঞ্চিত তাম্রবর্ণ কেশদাম ললাটে স্কন্ধদেশে আলুলায়িত হইয়া পড়িল, সকৌতুক হাসিতে যখন তাঁহার চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন সুন্দরানন্দ মিশ্মিরকে চিনিতে পারিলেন।

"বিদেশী আপনি এখানে হঠাৎ!"

"হঠাৎ নয়, অনেক দিন হল এসেছি এক সিংহের সন্ধানে"

"সিংহের সন্ধানে?"

"হ্যাঁ। রাজপুতানার মরুভূমিতে প্রথমে তাকে দেখি, তারপর থেকে তার অনুসরণ করছি, কিন্তু কিছুতেই নাগাল পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে—সে যেন আমার অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছে—"

"এই অরণ্যে এসেছে সে সিংহ?"

"হ্যাঁ—"

"আপনার লক্ষ্য তো অব্যর্থ। এখনও তাকে আপনি মারতে পারেন নি?"

"আমি তাকে মারতে চাই না, বন্দী করতে চাই"

"ও"

সুন্দরানন্দ কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"সিংহ পোষবার সখ আছে না কি"

"আমি আর কখনও সিংহ পুষি নি। এই প্রথম সখ হয়েছে পোষবার। শুধু পোষবার নয়, তাকে নিয়ে অবসর-বিনোদন করবার। আমার জীবনে অবসর প্রচুর, সে অবসরটাকে আনন্দময় করাটাই আমার জীবনের প্রধান সমস্যা। আগে অনেক কিছু করেছি, এবার নতুন কিছু করে দেখি। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন কুমার। আপনার সাহায্য না পেলে এ সিংহকে আমি ধরতে পারব না।"

"কি করতে হবে বলুন"

"এই কিরাতদের সঙ্গে কিছুদিন থেকে বাস করছি। তাদের মুখেই শুনলাম তারা আপনাকে কয়েকটি হরিণ ধরে' দিয়েছে। আমার অনুরোধ—অন্তত একটি হরিণ আমাকে দিন"

"হরিণ নিয়ে কি করবেন?"

"টোপ স্বরূপ ব্যবহার করব"

"বেশ তো, সে আর বেশী কথা কি। আজই নেবেন। আর একটা কথা, আমি যখন এসে গেছি তখন আপনি আর কিরাতদের মধ্যেই বা থাকবেন কেন, আমারই আতিথ্য গ্রহণ করে' আমাকে কৃতার্থ করুন"

"কিরাতদের মধ্যে আমি আনন্দেই আছি কুমার। তবে আপনার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই"

মিম্মির সেইদিনই আসিয়া কুমার সুন্দরানন্দের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুমারের শিকার-শিবিরে সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা ছাড়া উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি আর কেহ ছিল না, সুতরাং সুরঙ্গমার সহিত মিম্মিরের আলাপ হইতে বিলম্ব হইল না। আলাপটা কুমারই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া করাইয়া দিয়াছিলেন।

"ইনি আমার অবসর বিনোদনের উপলক্ষ। মানুষের রুচি বিভিন্ন, আপনার পছন্দ সিংহ, আমার পছন্দ অপ্সরী—"

"আমারও অপ্সরী ছিল কুমার। এখনও সে আছে, কিন্তু বাইরে নেই। ইন্দ্রিয়লোক থেকে তাকে আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি"

"বিসর্জ্জন দিয়েছেন? মানে?"

"ত্যাগ করেছি"

"ও"

সুরঙ্গমার নয়নে একটি অর্থপূর্ণ হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

সুন্দরানন্দের অধরেও মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। যে সুবিদিত কারণে নারীকে পুরুষেরা সাধারণতঃ ত্যাগ করে তাহাই উভয়ের চিত্তকে প্রভাবিত করিতেছে দেখিয়া মিম্মির কহিলেন—"আমার অপ্সরীকে আমি কেন ত্যাগ করেছি তার ইতিহাস আপনাদের আর একদিন শোনাব। এখন নয়। একদিন গভীর রাত্রে সে কথা বলব। গভীর রাত্রেই আমরা ত্যাগের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝতে পারি। দিবসের দৃশ্যমান জগৎ তাকে আবৃত করে' রাখে, দিবালোকে নিখিলের মর্ম্মবাণী আমাদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে যায়, আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে, তোলে, তখন আমাদের মনে হয় যে আহরণই বুঝি পরমার্থ, আমরা তখন ভুলে যাই যে ত্যাগ মানেই আহরণ। তাই এখন সে কথা বলব না, বলব গভীর রাত্রে"

মিম্মিরের জ্ঞান-গম্ভীর কথা শুনিয়া সুরঙ্গমা ও সুন্দরানন্দ শুধু বিস্মিত নয়, অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"বেশ, তাই হবে। এখন আপনার সিংহ ধরবার জন্য কি কি আয়োজন করতে হবে বলুন"

"সিংহটা কোন অঞ্চলে আছে তাই প্রথমে নির্ণয় করতে হবে"

"তা তো ঠিকই। কি করে' নির্ণয় হবে সেটা"

"গর্জ্জন শুনে"

"আমরা তো কোনও গর্জ্জন শুনিনি কোনও দিন"

"আমি শুনেছি। গভীর রাত্রে মেঘ গর্জ্জনের মতো সে গর্জ্জন। একদিন মাত্র শুনেছিলাম, তাই কোন অঞ্চলে সে আছে ঠিক করতে পারি নি। ঠিক করতে দেরী হবে না। ফাঁদটা আর খাঁচাটা আগে তৈরী হয়ে যাক, তারপর তাকে ডেকে আনব এখানে"

'ডেকে আনবেন?"

"হ্যাঁ। সিংহের ডাক ডাকতে পারি আমি। সিংহিনীর ডাক ডাকতে হবে, তাহলেই সে ছুটে আসবে"

মিস্মিরের মুখমণ্ডল হাস্যমণ্ডিত হইয়া গেল।

সুরঙ্গমা সলজ্জ দৃষ্টিতে সুন্দরানন্দের দিকে চাহিতেই সুন্দরানন্দ বলিলেন—"মানুষই প্রিয়ার ডাকে আসে জানি, সিংহও আসে না"

"সিংহই আসে, মানুষই বরং না আসতে পারে। সিংহের না এসে উপায় নেই, তাকে আসতেই হবে"

"কেন"

"কারণ সে পশু। স্বাধীনভাবে চলবার তার শক্তি নেই। ভয়ঙ্কর কিছু দেখলে তাকে ভয় পেতেই হবে, ক্ষুধিত হলে সে খাদ্য অন্বেষণ করবেই, ঘুমোবার সময় তাকে ঘুমোতেই হবে, জাগবার সময় তাকে জাগতেই হবে, সিংহিনীর প্রণয়-আহ্বান শুনলে তাকে আসতেই হবে ছুটে। মানুষের মতো যা খুশী করবার ক্ষমতা নেই তার। মানুষের সঙ্গে পশুর ওইখানেই তো তফাত"

সুরঙ্গমা বলিলেন—"মানুষ সব সময় যুক্তি মেনে চলে বলছেন?"

"কেউ যুক্তি মেনে চলে, কেউ আবার খেয়াল অনুসারেও চলে। পশুর মতো বাঁধাধরা একই পথে সবাই চলে না"

"চলে বই কি। তা না হলে সমাজ টিকে আছে কি করে'। সবাই নিজের-মতে চললে কি সমাজ টিকিত?"

"এটা ঠিক বলেছেন আপনি, কিন্তু তবু আপনাকে মানতে হবে যে মানুষই যা খুশী করতে পারে, পশু পারে না। মানুষের সামাজিক নিয়ম বদলাচ্ছে বারবার, কারণ নিয়ম বদলাবার ক্ষমতা মানুষেরই আছে, পশুর নেই"

"কিন্তু সে ক্ষমতার ব্যবহার কি মানুষ করে? আমি—যা-খুশী—করছি, এই ধারণার মোহই তাকে অন্ধ করে' ফেলে না কি?"

মিস্মির মুগ্ধদৃষ্টিতে সুরঙ্গমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সুন্দরানন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ইনি শুধু দেহে নন, মনেও

রূপসী। অনেক ফুলের রূপ থাকে কিন্তু সুগন্ধ থাকে না, আবার রূপ নেই সৌরভ আছে এমন ফুলও বিরল নয়। কিন্তু রূপে গুণে সমান এমন ফুল দুর্লভ। দেবতার নির্মাল্য হবার উপযুক্ত এ ফুল। কুমার সুন্দরানন্দ আপনি ভাগ্যবান"

কুমার সুন্দরানন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন ক্ষণকাল, তাহার পর বলিলেন—"নিজেকে আরও ভাগ্যবান মনে করছি আপনার মতো একজন রসিকের সান্নিধ্যলাভ করে'। আচ্ছা, একটা কথা জানতে ইচ্ছে করছে, আপনার 'মির্ম্মির' নামটা কি আপনার স্বদেশী নাম?"

"না। আমার স্বদেশী নাম হেরোডোটাস। মির্ম্মির নামটা আমি নিজে গ্রহণ করেছি সব দেশে ঘুরে বেড়াবার সুবিধা হবে বলে"

"ওটা কি সংস্কৃত শব্দ?"

"কোনও ভাষা থেকে শব্দটা আমি বাছি নি। হয় তো ওর কোন মানেই নেই। কথাটা নিজেই আমি বানিয়েছি।"

"হঠাৎ আমার নামের কথাটা আপনার মনে জাগল কেন কুমার?"

"শব্দটার কোনও অর্থবোধ হচ্ছিল না বলে' মনে হল, হয় তো ওটা বিদেশী শব্দ"

মির্ম্মির হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"না, ওটা কোন ভাষারই শব্দ নয়। ও শব্দ আমারই সৃষ্টি এবং ওর অর্থ আমি। কিন্তু বাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। ফাঁদটা তৈরী করবার ব্যবস্থা করতে হবে। বিলম্ব হলে সিংহ পালাবে"

"কি করব বলুন—"

"প্রকাণ্ড গভীর একটা গর্ত্ত খুঁড়তে হবে। আর সেই গর্ত্তটাকে ঘিরতে হবে মোটা মোটা গাছের গুঁড়ি দিয়ে, বেশ মজবুত করে'।

তারপর সেটার উপর লতাপাতা খড় দিয়ে চাল তৈরী করতে হবে একটা। দরজাও থাকবে। অর্থাৎ দূর থেকে মনে হবে যেন একটা ঘর। ঘরই হবে সেটা, কেবল তার মেঝেটা হবে প্রকাণ্ড গহ্বর। আর সেই গহ্বরের তলায় থাকবে মোটা দড়ির তৈরী জাল একটা। জালের খুঁটগুলো থাকবে উপরে অর্থাৎ আমাদের আয়ত্তাধীন। হরিণটাকে ঘরের ভিতরে একটা দেওয়ালে এমন ভাবে আমরা বাঁধব যেন মনে হবে সেটা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার শিং, পা, আর পিঠ সবই বাঁধতে হবে দেওয়ালের সঙ্গে। এমন জায়গায় বাঁধতে হবে যেন হরিণটাকে দরজার ভিতর দিয়ে দেখা যায় বাইরে থেকে। দরজার একটা কপাটও থাকবে, আর সেটা ঝুলে থাকবে ওপর থেকে, যে দড়ি থেকে ঝুলে থাক্‌বে সেটাও থাকবে বাইরে অর্থাৎ আমাদের নাগালের মধ্যে। সিংহ ঘরের ভিতর ঢুকলেই দড়িটা কেটে দেব আমরা—আর কপাটটা বন্ধ হয়ে যাবে !"

"সিংহটা ঢুকবে হরিণের লোভে ?"

"নিশ্চয়। আর আসবে সিংহিনীর ডাক শুনে। অর্থাৎ লোভ আর কাম এই দুই রিপুই তাকে বন্দী করবে, আমরা উপলক্ষ মাত্র—"

মিস্মিরের চক্ষু দুইটি হাস্যপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং সে দৃষ্টি তিনি সুরঙ্গমার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন।

সুন্দরানন্দ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"বেশ, কাল থেকেই লোক লাগাচ্ছি। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ফাঁদ তৈরী হয়ে যাবে"

কুমার সুন্দরানন্দের আদেশে এবং মিস্মিরের তত্ত্বাবধানে কয়েকদিনের মধ্যেই সিংহের ফাঁদ প্রস্তুত হইয়া গেল। তাহার পর

প্রায় প্রতি রাত্রেই মিম্মির গভীর রাত্রে বাহির হইয়া যাইতেন এবং কিছুক্ষণ পরেই চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া সিংহিনীর ডাক ডাকিতেন। সত্যই মনে হইত যেন একটা আকুল কামনা নিবিড় অরণ্যের অন্ধকারে গভীর নিশীথিনীর বুক চিরিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া প্রতি রাত্রেই মিম্মির ফিরিয়া আসিতেন এবং উৎকর্ণ হইয়া শুনিবার চেষ্টা করিতেন, প্রত্যুত্তরে সিংহের ডাক শোনা যায় কি না। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি কিছুই শোনা গেল না।

সেদিন গভীর রাত্রে মিম্মির উৎকর্ণ হইয়া বসিয়াছিলেন। সমস্ত অরণ্য মুখরিত করিয়া ঝিল্লী ধ্বনি ঝঙ্কৃত হইতেছিল। মাঝে মাঝে বন্য-পেচকের কর্কশ চীৎকার, আকাশচারী দ্রুতগামী হংসদলের সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত কলকণ্ঠ নিনাদ, জম্বুকণ্ঠের ক্ষণস্থায়ী ঐক্যতন ঝিল্লী ঝঙ্কারকে মাঝে মাঝে বিঘ্নিত করিতেছিল বটে, কিন্তু বিঘ্নিত করিয়াই যেন তাহাকে আরও স্পষ্ট আরও জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিল, উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত তরঙ্গিনীর ন্যায় তাহা যেন আরও উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। এই ঝিল্লী ঝঙ্কারের সহিত মিশিতেছিল মৃদু বীণার ঝঙ্কার। পাশের ঘরে বসিয়া সুরঙ্গমা মালকোষ আলাপ করিতেছিল। মিম্মির মনে মনে উৎকর্ণ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার আবিষ্ট নয়নের দৃষ্টি দেখিয়া তাহা মনে হইতেছিল না। মনে হইতেছিল তিনি আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। কুমার সুন্দরানন্দ সকৌতুকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অবশেষে তিনি প্রশ্ন করিলেন—"কুমার মিম্মির, আপনি কি সিংহ গর্জ্জন শোনবার জন্যই অতটা একাগ্র হয়েছেন?"

মিম্মির হাসিয়া বলিলেন—"না। সিংহ গর্জ্জন এত স্থূল যে তা শোনবার জন্য একাগ্র হতে হয় না। সে গর্জ্জন বিরাট হাতুড়ির

মতো এসে চৈতনার উপর আঘাত করবে। আমি ঝঙ্কারময়ী নিশীথিনীর অন্তরের ভাষা শুনছিলাম”

“ও! কি রকম সে ভাষা! আমি একটু জানতে পারি কি”

“আত্মসমর্পণের ভাষা। সমস্ত পৃথিবী থেকে অহোরাত্র এই ভাষা উঠছে আকাশের দিকে। দিনের বেলা সেটা ভাল বুঝতে পারি না। গভীর রাত্রিতে একটু চেষ্টা করলে সেটা বোঝা যায়”

“ও, আপনি একদিন বলেছিলেন বটে এই ধরণের একটা কথা। আপনার অপ্সরীকে কোথায় কেন ত্যাগ করেছিলেন সে কাহিনীও শোনাবেন বলেছিলেন একদিন গভীর নিশীথে। শোনাবেন না কি এখন—”

“তা শোনাতে পারি। কিন্তু তার আগে মনটাকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। না নিলে এর মাধুর্য্য এর মহিমা ঠিক বোঝা যাবে না”

“আপনিই মনটাকে প্রস্তুত করে' দিন। সুরঙ্গমাকে ডাকব?”

“ডাকুন—”

বীণাহস্তে সুরঙ্গমা দ্বারপ্রান্তে দেখা দিতেই মিস্মির বলিলেন—“আপনি কুমারের পাশে বসে বীণায় মৃদু মৃদু ঝঙ্কার দিন। তাহলে আমার বক্তব্যের পটভূমিকাটা আরও মনোরম হবে”

কুমার সুন্দরানন্দের মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হইল, সুরঙ্গমাও হাসিমুখে তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন।

মিস্মির বলিতেছিলেন—“তাঁর নাম ছিল তানে। আমার ভৃত্য আবাস তাকে কিনে এনেছিল সিরিয়ার হাট থেকে। আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা থিওনি মারা যাবার পর একটি পরিচারিকার প্রয়োজন হয়ে পড়ল, আবাসকে তাই সিরিয়ার হাটে পাঠিয়েছিলাম। পঞ্চদশী তানেকে কিনে নিয়ে এল সে। রজনীগন্ধার শুভ্রতা, সৌরভ আর তনিমার সঙ্গে রক্ত-গোলাপের মদিরতা মেশালে যা হয় তানে তাই

ছিল। দেখে আমি রোমাঞ্চিত হলাম, মনে হ'ল ওলিম্পাসের কোনও দেবী বুঝি ছলনা করতে এসেছেন আমাকে, হয় তো আফ্রোদিতে নিজেই এসেছেন। আবাসকে বললাম—তোমার রসবোধের উপর আমার আস্থা ছিল, তুমি যে ঘর ঝাড়ু দেবার জন্য রজনীগন্ধার ডাল নিয়ে আসবে তা কল্পনা করিনি। আবাস বললে—ওকে দেখে ভাল লাগল তাই নিয়ে এসেছি। কাফ্রী ওথাকেও এনেছি, সেই পরিচারিকার কাজ করবে। প্রশ্ন করলাম—তানে করবে কি? আবাস মৃদু হেসে বললে—ও বিশেষ কিছু করবে না, ও আশে-পাশে থাকবে খালি, যদি আদেশ করেন গান করতে পারে মাঝে মাঝে। তানের রূপ দেখে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম, গান শুনে আত্মহারা হলাম। তারপর একবছর, দু'বছর, তিন বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল স্বপ্নের মতো। মনে হল ডুবে যাচ্ছি ক্রমশ, হারিয়ে ফেলছি নিজেকে, তারপর আবার সহসা একদিন অনুভব করলাম অবসাদ এসেছে। আবিষ্কার করলাম, তানের পদশব্দ শোনবার জন্যে আর আমি উৎকর্ণ নই, তার তন্বী দেহকে আলিঙ্গন পাশে বাঁধবার আগ্রহ আর আমার নেই। অপস্রিয়মান রঙীন মেঘের মতো তানে ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তানেও সেটা অনুভব করেছিল সম্ভবত। সে একদিন বললে এসে—আমি কিছুদিনের জন্য ছুটি চাই। মাকে অনেকদিন দেখি নি, দেখে আসি। তানের মা-বাবা আছেন কিনা, কোথায় তাঁদের বাড়ি, যে মেয়েকে তাঁরা হাটে বিক্রি করে' দিয়েছেন তার প্রতি তাঁদের স্নেহ অটুট আছে কি নেই—এসব কোনও প্রশ্নই আমি করলাম না। তাকে ছুটি দিলাম। সে যখন চলে গেল তখনই যেন তাকে আবার পেলাম, তার স্বপ্ন, তার অভাব, তার অনবদ্য রূপের শত সহস্র প্রকাশ আমার চিত্তকে আকুল করে তুলল। মনে হ'তে লাগল সে যখন কাছে ছিল তখন তাকে এমনভাবে পাই নি।

সেই সময় ঠিক আর একটা জিনিসও আমার চোখে পড়ল। চোখের সামনে সেটা চিরকালই ঘটছিল, কিন্তু দেখতে পাই নি..."

মিস্মির নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন, মনে হইল তিনি যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা নবদৃষ্টিলাভ করিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন যেন মনে মনে তাহাই আবার প্রত্যক্ষ করিতেছেন। অন্ধকার অরণ্যের ঝিল্লীকুল আকুল ঝঙ্কারে যেন সেই দর্শনের পটভূমিকা সৃজন করিতেছে।

কৌতূহলী সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল—"কি চোখে পড়ল আপনার"

"শেফালী ফুলের গাছ একটা। আমি যে ঘরে বসতাম সেই ঘরের জানালা দিয়ে সম্পূর্ণ গাছটা দেখা যেত। হঠাৎ একদিন সকালে লক্ষ্য করলাম গাছের তলায় অজস্র ফুল পড়ে রয়েছে। রোজই পড়ে থাকে, কিন্তু সেদিন তাদের নূতন দৃষ্টিতে দেখলাম। মনে হল ওই শেফালী তরুটি যে ফুলগুলিকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত শত শত বৃন্ত বন্ধনে সাগ্রহে বেঁধে রেখেছিল সেগুলিকে কত সহজে ত্যাগ করেছে। এই যে ওর এতগুলি সন্ততির শবদেহ ওর পদপ্রান্তে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে এর জন্য ওকে তো শোকাকুল মনে হচ্ছে না, ওর শাখাপত্রগুলি তো অবনমিত হয় নি। বাতাসের হিল্লোলে ও আগেও যেমন আনন্দিত ছিল, এখনও তেমনি আছে। তারপরই লক্ষ্য করলাম ওর শাখায় শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি রয়েছে, একটু পরেই সেগুলি ফুল হয়ে ফুটবে। মনে হল রহস্যটা যেন বুঝলাম একটু। ত্যাগ করতে পারে বলেই গাছ নূতন ফুলের স্বপ্নে আকুল হ'তে পারে। পুরাতন ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে পারত না। যে ফুলগুলোকে ও ত্যাগ করতে পেরেছে তারাই আবার ফিরে আসছে ওর নবমুকুলের স্বপ্নে, নবকুসুমের বিকাশে। পুরোনো ফুলগুলোকে আঁকড়ে থাকলে এসব হত কি? বিচ্ছেদ না থাকলে

কি মিলন মধুর হয়? ত্যাগ না করলে কি ভোগের আনন্দ পাওয়া যায়! শেফালী তরুর ভিতর আমি সেদিন যে সত্যের ইঙ্গিত পেলাম তা নিজের মধ্যেই আমি স্পষ্টতররূপে উপলব্ধি করছিলাম তানের বিরহ-বেদনার নিগূঢ়-নিবিড় অনুভূতিতে। বুঝতে পারছিলাম তানে দূরে চলে গেছে বলেই আরও নিকটে পেয়েছি তাকে।...”

পুনরায় মিস্মির নীরব হইলেন। ঝিল্লী-ঝনৎকার সহসা যেন বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল অন্ধকারের নিবিড়তাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একদল উন্মত্ত সুর আকুলভাবে কিসের যেন সন্ধান করিতেছে, যাহা খুঁজিতেছে তাহা না পাইলে বুঝি তাহাদের জীবনান্ত ঘটিবে। সুন্দরানন্দ ও সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিলেন, মিস্মিরের নয়ন দুইটি ক্রমশ নিমীলিত হইতেছে। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিমীলিত নয়নে তিনিও আকুল ঝিল্লীঝঙ্কারের মধ্যে কি যেন সন্ধান করিতেছেন। তাঁহারা সোৎসুকে মিস্মিরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া মিস্মির অবশেষে অস্ফুটকণ্ঠে বলিলেন, “সেদিনকার রাত্রিও এমনি ঝিল্লী-মুখরিত ছিল...”

“কি ঘটেছিল সে রাত্রে”—সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

“একবাহু ঋষির দেখা পেয়েছিলাম। গোড়া থেকে ঘটনাটা বলতে হবে। তানের বিচ্ছেদে যখন আমি অধীর হয়ে উঠেছি তখন সে হঠাৎ ফিরে এল একদিন, আরও মনোহারিণী হয়ে ফিরে এল। মনে হতে লাগল অপূর্ব্ব স্ফটিক পাত্রটি এতকাল শূন্য ছিল এবার পূর্ণ হয়েছে, সুরায় না অমৃতে, তা প্রথমে বুঝতে পারি নি। প্রথমে মনে হয়েছিল সুরায়, কিন্তু পরে সে ভুল ভেঙেছিল। পরে বুঝেছিলাম তানে মানবী নয়, দেবী। তার উৎফুল্ল যৌবন যে মাধুর্য্যরসে কানায় কানায় ভরে' উঠেছিল তা মদিরা নয়, অমৃত। তানে আসবার কিছুদিন পরেই আমি দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম তাকে নিয়ে।

বাল্যকাল থেকেই দেশভ্রমণ করা আমার নেশা। আর তোমাদের দেশ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে আমাকে বাল্যকাল থেকে। অশ্ববাহিত রথে বেরিয়ে পড়লাম আমরা দু'জনে। স্থলপথ শেষ হয়ে গেল, সুরু হল জলপথ। সমুদ্রতীরে কিছুকাল অপেক্ষা করবার পর অর্ণবপোত পাওয়া গেল একটা। শুনলাম সেটা সিরিয়া যাবে ভূমধ্যসাগর পার হয়ে। তাতেই চড়ে বসলাম। তানে বললে, সিরিয়া থেকে একটা স্থলপথ পারস্য অভিমুখে গেছে। সে পথে ইচ্ছা করলে আমরা পারস্যে যেতে পারি। পারস্য থেকে গান্ধার হয়ে আর্য্যাবর্ত্তে যাওয়া যাবে। তাই হল। পথে যে কত কি দেখলাম, কত কি অনুভব করলাম, কত বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে যে নিজেকে আর তানেকে আবিষ্কার করলাম তার বিশদ বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য নেই আমার। সে চেষ্টাও করব না, কারণ আমার মানসকাননে যে সব স্মৃতি অপূর্ব্ব ফুলের মতো ফুটে আছে সেখান থেকে তাদের তুলে এনে বাইরে ঘাঁটাঘাঁটি করবার প্রবৃত্তি নেই। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, কখনও পদব্রজে, কখনও অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও শকটে, কখনও দোলায়, কখনও উষ্ট্রবাহিত হয়ে' কখনও নৌকায়, পথে-প্রান্তরে-মরুভূমিতে, অরণ্যে-কাননে নদীতে-সমুদ্রে আমরা দু'জনে যে অমৃত অন্বেষণ করেছিলাম তার ভাণ্ডার আজও অক্ষয় হয়ে আছে, কখনও নিঃশেষ হবে না। শেফালী গাছের শাখায় শাখায় রূপের স্বপ্ন যেমন নিঃশেষ হয় না…"

মির্শ্মির আবার নীরব হইলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর সহসা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"অবশেষে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হলাম আমরা। হিমালয়ের এক উপত্যকাতেই শবর সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আমার। তখন থেকেই আমি ভালবেসেছি এই বন্য ব্যাধদের। তাদের সরল

সাহস, অকপট আতিথেয়তায় আমি আজও মুগ্ধ হয়ে আছি। এখানে এসে তাই ওদেরই আতিথ্যগ্রহণ করেছিলাম। হিমালয়ের বনাকীর্ণ উপত্যকায় পশু চর্ম্মে আর পাখীর পালকে দেহ আবৃত করে' ধনুর্ব্বাণ দিয়ে পশুপক্ষী শিকার করে' পাহাড়ি ঝরণায় স্নান করে', শিখর থেকে শিখরান্তরে ভ্রমণ করে' আমি আর তানে যে উদ্দাম বন্যজীবন যাপন করছিলাম তাতে সহসা একদিন ছেদ পড়ল অপ্রত্যাশিতভাবে। একটা বাঘের সন্ধান করছিলাম, আমরা— আমি আর তানে। আমার হাতে ছিল ভল্ল, তানের হাতে ছিল ধনুর্ব্বাণ। তানেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন দেবী আরটেমিস সশরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন—"

"আরটেমিস কি ধরণের দেবী?"—উৎসুককণ্ঠে সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"আরটেমিস? ঠিক ও ধরণের দেবী আপনাদের মধ্যে আছে কিনা জানি না। আরটেমিস জীব হনন করেন, জীব পালনও করেন। তিনি রূপসী, তাঁকে দেখে তাঁর প্রণয়ে পড়ে' অনেকে বিপন্ন হয়েছেন, কিন্তু তিনি নিজে কখনও প্রণয়-পাশে বাঁধা পড়েন নি। কেউ কেউ বলে—তিনি ঘুমন্ত এন্‌ডিমিয়নকে ভালবেসেছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। আমারও মনে হয় ওটা ঠিক নয়। আরটেমিস, চিরযৌবনা, চিরকুমারী, চিরপ্রদীপ্তা, কানন-কান্তারের বিজয়িনী অধিষ্ঠাত্রী দেবী—এইরূপেই তাঁকে কল্পনা করতে ভাল লাগে। তানেকে দেখে আমার মাঝে মাঝে আরটেমিসের কথা মনে হ'ত। কিন্তু সেটা আমার ভুল, তানে নিজেকে উৎসর্গ করে' দিয়েছিল আমার কাছে।..."

পুনরায় মিশ্মির নীরব হইলেন। সুন্দরানন্দ কিন্তু তাঁহাকে বেশীক্ষণ নীরব থাকিতে দিলেন না।

"তারপর কি হল। বাঘের অনুসরণ করতে করতে কোথায় গিয়ে পড়লেন আপনারা—?"

"অনুসরণ ঠিক নয়, সন্ধান করছিলাম আমরা বাঘটার। একটা ঝরণার ধারে একটা বিরাট বন্য মহিষকে মেরেছিল বাঘটা। আমরা আশা করেছিলাম সে আশে-পাশে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। আমরা দু'জনে কাছাকাছি এমন একটা আশ্রয় খুঁজছিলাম যেখান থেকে মৃত মহিষটাকে দেখা যাবে। কিছুদূরে একটা টিলার শীর্ষদেশে সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ দেখতে পেলাম, সেইটার উপরই চড়ে' বাঘের প্রতীক্ষা করব এই ঠিক করে সেই দিকেই এগিয়ে গিয়ে তার উপরই আরোহণ করলাম আমরা। জ্যোৎস্না-রাত্রি ছিল, গাছের উপর থেকেও মৃত মহিষটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু গাছের উপর চড়ে' এমন আর একটা জিনিস দেখতে পেলাম যা শুধু বিস্ময়কর নয়, আতঙ্ক-জনকও।..."

মিস্মির চুপ করিলেন।

"কি দেখলেন?"

"দেখলাম, যা তা অদ্ভুত। আমরা যে ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শিখরে বৃক্ষশাখায় বসেছিলাম ঠিক তার অপর পার্শ্বে ছিল আর একটা উপত্যকা। সেই উপত্যকার অন্যপ্রান্ত থেকে আবার পর্ব্বতশ্রেণী উঠেছিল। উপত্যকাটি ছোট, তাই আমরা দেখতে পেলাম একটি গুহার সম্মুখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আর তার সামনে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক দীর্ঘকায় পুরুষ বসে' আছেন। তাঁর একটি বাহু নেই, অবশিষ্ট বাহুটিও তিনি আগুনের শিখার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছেন, যে ভাবে আমরা উনুনে কাঠ দিই। সেই ভাবে! মাঝে মাঝে আবার বার করেও নিচ্ছেন হাতটা। আবার খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বসে' থেকে আবার সেটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন আগুনের মধ্যে।

তানে বললে লোকটা হয়তো পাগল, কিম্বা কোনও তান্ত্রিক যাদুকর। চল দেখে আসি ব্যাপারটা কি। গেলাম দু'জনে। কাছে গিয়ে দেখলাম লোকটি সত্যই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। গোঁফ দাড়ি আর অবিন্যস্ত কেশভারে মুখমণ্ডল পরিপূর্ণ। চোখ দুটি অঙ্গারের মতো জ্বলছে। কিন্তু সে দীপ্তিতে দাহ নেই, প্রশান্তির স্নিগ্ধ-জ্যোতি যেন বিকীর্ণ হচ্ছে তার থেকে। আমাদের দিকে ক্ষণকাল সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তারপর একটু হেসে সংস্কৃত ভাষায় বললেন—স্বাগতম্। আমি আর তানে একটু একটু সংস্কৃত শিখেছিলাম, আলাপ করতে খুব বেশী অসুবিধা হ'ল না। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ কি করছেন আপনি। তিনি বললেন, যজ্ঞ করছি। আর্যাবর্ত্তে খুব যজ্ঞ হয় একথা শুনেছিলাম, কিন্তু তা যে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার তা কল্পনা করিনি। আমাদের দেশেও দেবতার উদ্দেশ্যে একরকম যজ্ঞ প্রচলিত ছিল, তাতে পশুমাংস অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হত। আমাদের চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের আভাস দেখে তিনি আর একটু হেসে বললেন—যজ্ঞ মানে দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ। দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক। আমার প্রিয়তম ছিল হাত দুটি, সেই দুটিই দেবতাকে দেব। একটি দিয়েছি, আর একটি দিচ্ছি। আমাদের মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। আমাদের দিকে আরও ক্ষণকাল চেয়ে থেকে তিনি বললেন—আপনাদের দৃষ্টি থেকে অনুকম্পা ক্ষরিত হচ্ছে। অনুকম্পার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও আনন্দিত হোন। তানে বললে—হাত দুটিই আপনার সবচেয়ে প্রিয়? ঋষি উত্তর দিলেন—সবচেয়ে প্রিয়। এই হাত দিয়ে আমি না করেছি কি? শিকার করেছি, বীণা বাজিয়েছি, ফুল তুলেছি, মূর্ত্তি গড়েছি, ছবি এঁকেছি, কবিতা

লিখেছি, দেবতার জন্য নির্ম্মাল্য রচনা করেছি। আমার হাতের কিছু কীর্ত্তি এখনও আমার গুহার মধ্যে সঞ্চিত আছে। যদি কৌতূহল হয়, কাল সকালে এসে দেখে যাবেন। এখন আপনারা যান। আপনারা থাকলে আমার আরাধনা বিঘ্নিত হবে। কাল সকালে আসবেন ওই গুহায় আমি থাকব। সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র নয়নে আমরা দু'জনে সেই দেবদারু বৃক্ষশীর্ষে পাশাপাশি বসে' রইলাম। কারও মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না। পারিপার্শ্বিক আর পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠেছিল যে কথা বলবার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম না কেউ। একদিকে সেই বন্য মহিষের শবটা পড়েছিল, আর একদিকে দেখা যাচ্ছিল অদ্ভুত সেই যাজ্ঞিককে, মাঝে মাঝে হাতটা তুলে অগ্নিশিখার ভিতর দিচ্ছেন আবার বার করে' নিচ্ছেন। চতুর্দ্দিকে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে পর্ব্বতমালা, উদ্দাম ঝিল্লীধ্বনি মন্থর হয়ে এসেছে অরণ্যের জটিলতায়, নিষ্ঠুর শার্দ্দুলের আগমন প্রতীক্ষায় থম থম করছে চারিদিক, আকাশের জ্যোৎস্নাও যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে পর্ব্বতের সানুদেশে, উপত্যকার নৈশ রহস্য ঘনতর হচ্ছে। আমরাও দু'জনে ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। তানে বসেছিল আমার বাম উরুর উপর, আমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে। সে কি ভাবছিল, তখন আমি জানতে পারি নি, পরে জেনেছিলাম। আমি ভাবছিলাম ওই অদ্ভুত যাজ্ঞিকের কথা। 'দেবতার উদ্দেশ্যে যিনি নিজের প্রিয় জিনিস ত্যাগ করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক···আমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমি আনন্দিত। আমার আনন্দে আপনারাও আনন্দিত হোন ···!'—তাঁর এই কথাগুলো আমার কানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কেবল, সমস্ত মনকে পরিপূর্ণ করছিল এক অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির অদ্ভুত রসে। সেই শেফালী গাছটার ছবি ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হচ্ছিল চোখের সামনে···অজস্র ফুল ফোটাচ্ছে আর

ঝরাচ্ছে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই ওর সাধনা। আমি কি করছি? আমার চোখের ঠিক সামনেই দেবদারুর একটা বক্র শাখা ছিল, সেটা মৃদু হাওয়ায় দুলতে লাগল, আমার মনে হল আমার প্রশ্নটাই বুঝি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে ওই কুটিল কৃষ্ণ শাখায়, যেন দুলে দুলে আমাকে প্রশ্ন করছে, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ, তুমি কি করছ···হঠাৎ তানে বললে—মহিষটা তো আর দেখতে পাচ্ছি না। দেখলাম সত্যিই মহিষটা নেই। বাঘ যে কখন নিঃশব্দে এসে সেটাকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তা আমরা টের পাই নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করলাম—পূর্ব্বাকাশ উষারাগরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। মনে হল এবার গাছ থেকে নেমে শবর-পল্লীতে ফিরে যাওয়াই উচিত। যন্ত্রচালিতবৎ নামলাম, যন্ত্রচালিতবৎ চলতে লাগলাম। কারও মুখ দিয়ে কথা বেরুল না একটিও, অথচ···ঠিক আপনারাও বুঝতে পারছেন কি না জানি না—আমার সমস্ত সত্তা তখন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে পরিপূর্ণ, সে ভাবের ঘোরে আমি এমনি বিভোর যে তা প্রকাশ করে' বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলাম না, করলেও ভাষা খুঁজে পেতাম কি না সন্দেহ। পোষাক পরিবর্ত্তন করে' শবর-পল্লী থেকে যখন ফিরছি তখন তানে হঠাৎ প্রশ্ন করলে—"তোমার জীবনে সবচেয়ে প্রিয় কে"

"তুমি"।

কথাটা শুনে নীরব হয়ে গেল সে। তার দিকে চেয়ে দেখলাম অপূর্ব্ব একটা জ্যোতি ঝলমল করছে তার চোখের দৃষ্টিতে। আমিও আর কোনও প্রশ্ন করলাম না। নীরবে একটা খাড়াই অতিক্রম করতে লাগলাম দু'জনে। খাড়াইটার পর ছিল একটা উৎরাই—তারপর উপত্যকা, উপত্যকার অপর প্রান্তে আবার পাহাড় উঠেছে, সেই পাহাড়ে সন্ন্যাসীর গুহা। গুহায় পৌঁছে দেখলাম, সন্ন্যাসী

তাঁর অর্দ্ধদগ্ধ বাহুতে পনীর মাখাচ্ছেন। আমাদের দেখে বললেন—আপনারা দু'জনেই কি কাল রাত্রিতে এসেছিলেন ? উত্তর দিলাম, হাঁ, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার আচরণে এবং আলাপে যা পেয়েছি তাতে কৌতূহল কমে নি, বেড়েছে। সন্ন্যাসী কিছু না বলে দগ্ধ ক্ষতস্থানগুলিতে পনীর লেপন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর একটু হেসে বললেন—'গুহার ভিতর প্রবেশ করে' আমার দক্ষিণ হস্তের কীর্ত্তিগুলি যদি দেখেন তাহলে আরও আশ্চর্য্য হবেন!' গুহায় প্রবেশ করলাম। সত্যিই বিস্ময়ের সীমা রইল না। ভাস্কর্য্য এবং চিত্রাঙ্কনের এমন নিদর্শন আর কখনও দেখি নি। বেরিয়ে আসতেই সন্ন্যাসী বললেন—'ওগুলো সৃষ্টি করেছিলাম আনন্দের প্রেরণায়, এখন যে প্রেরণায় হাত দুটোকে বিসর্জ্জন দিচ্ছি তা আরও মহৎ, আরও সূক্ষ্ম—'. তাঁর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, সসম্ভ্রমে চুপ করে' রইলাম, প্রশ্ন করতে সাহস হল না। আমার মনের কথা কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—'আমার হাত দুটো আমার প্রিয় ছিল, কারণ আমার অহঙ্কারকে ওরা তৃপ্ত করত। এরকম অহঙ্কারে একটা আনন্দ আছে সত্য, কিন্তু মাদকতাও আছে। সমস্ত মাদক জিনিসের মতো এই অহঙ্কারের আনন্দও মনকে অবশেষে অবসন্ন করে। নূতন খোরাক না পাওয়া পর্য্যন্ত অবসন্ন হয়েই থাকে সমস্ত চিত্ত। আর নিত্য নূতন খোরাকের সন্ধান করতে করতে শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়। কারণ খোরাকের সন্ধান করাটাই মুখ্য হয়ে পড়ে, তখন আনন্দটা হয়ে যায় গৌণ। একদিন গভীর রাত্রে এই সত্যের উপলব্ধি হল। বুঝলাম কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে' থাকবার চেষ্টা করলেই দুঃখ। কারণ চিরকাল কোনও কিছুকে আঁকড়ে ধরে' থাকা যায় না। জরা মরণ কাউকে খাতির করে

না। নিজের প্রিয় বস্তুকে স্বেচ্ছায় দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করলেই নির্ম্মল আনন্দ পাওয়া যায়, কারণ দেব-চরণে সমর্পিত বস্তু অমরত্ব লাভ করে কল্পলোকে, নব নব রূপে তা বিকশিত হয় অবস্তু লোকের অমরায়, জরা মরণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। মনে পড়ল উপনিষদের বাণী—যতশ্চোদতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি—যাঁর ভিতর থেকে সূর্য্য উদিত হয়, যাঁর ভিতরে আবার সূর্য্য অস্ত যায় তাঁর মধ্যেই আমার প্রিয় বস্তুকে সমর্পণ করলে তা নিরাপদ থাকবে কারণ সেই স্থানই জন্ম-মরণবিহীন স্থান। এই উপলব্ধি হবার পর থেকে আমি যজ্ঞের আয়োজন করে' আমার হাত দুটিকে দেবতার চরণে সমর্পণ করছি—"

প্রশ্ন করলাম—"কে আপনার দেবতা ?"

"চরাচরে প্রত্যক্ষে-কল্পনায় যিনি প্রকট, তিনিই আমার দেবতা। তিনি সত্য-অসত্য সুখ-অসুখ জ্ঞান-অজ্ঞান বাস্তব-অবাস্তব সবই। কোনও একটি সংজ্ঞায় তাঁকে বোঝান যাবে না। তিনি নানারূপে প্রকাশিত, নানা আলোকে প্রদীপ্ত। অগ্নি তাঁর হুতবহ—"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার প্রশ্ন করলাম—বস্তুত প্রশ্ন করা ছাড়া আর কি-ই বা করবার ছিল আমার। প্রশ্ন করলাম—"ক্ষতস্থানে পনীর লেপন করেছেন কেন ? জ্বালা করছে ?

তিনি উত্তর দিলেন—"জ্বালা আবশ্যক করছে। কিন্তু সেটাকে আমি আমোল দিচ্ছি না। আমি এতে পনীর লাগাচ্ছি, পনীর অগ্নির প্রিয় খাদ্য বলে'। আমার এই হাত শুষ্ক মাংসমেদ-হীন, বিস্বাদ পনীর লাগিয়ে সেটাকে একটু সুস্বাদু করবার চেষ্টা করছি—"

তাঁর সমস্ত মুখ হাসিতে ভরে' গেল।

আমি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলাম—"আচ্ছা, ইচ্ছে করলে যে কোনও লোকই কি যজ্ঞ করতে পারে?"

"প্রত্যেক লোকই যজ্ঞ করছে, কিন্তু সে কথা তারা জানে না। দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ মানেই যজ্ঞ, তার সদ্য ফল আনন্দ। প্রত্যেক মানুষই আনন্দলাভের জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ করছে। কারণ ত্যাগ না করলে সত্যিকার আনন্দ পাওয়া যায় না। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—কথাটা মিথ্যে নয়। আপনারা সবাই যজ্ঞ করছেন, কিন্তু জানেন না সে কথা"—তারপর আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—"আপনিও করছেন। কিন্তু খুব ভালভাবে করছেন না। মন যেদিন বৃহৎ আনন্দের দাবী করবে, ভূমা যখন সীমার প্রান্ত-রেখার পরপারে আভাসিত হবে, তখন আপনিও তার মূল্য দেবার জন্য প্রস্তুত হবেন, প্রিয়তমকে যজ্ঞের বলি করতে আপনিও তখন আর ইতস্তত করবেন না, বুঝতে পারবেন যে প্রিয়তমকে চিরন্তন করতে হলে তাকে ত্যাগ করতে হয়"—আর একটু থেমে তানের দিকে চেয়ে বললেন—"ইনি আপনার কে হন—"

"আমার প্রিয়তমা"

"হয় তো এঁকেই তা হলে যজ্ঞের বলি হতে হবে একদিন"

আমি আর তানে পরস্পরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মিম্মির পুনরায় নীরব হইয়া গেলেন। আরণ্য স্তব্ধতাকে বিচলিত করিয়া অসংখ্য প্রকার ধ্বনি অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা সহসা সুন্দরানন্দের কর্ণে বেদমন্ত্রের মতো ধ্বনিত হইল। মনে হইল অসংখ্য অদৃশ্য উদ্গাতা যেন সামবেদ গান করিতেছেন। তিনি একাধিক বার যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন কিন্তু এরূপ অনুভূতি তাঁহার আর কখনও হয় নাই। তাঁহার এই অনুভূতি রহস্যময়-মিম্মিরের অন্তরেও সঞ্চারিত হইল। তিনি বলিলেন—"শুনছেন

কুমার, বসুন্ধরার আত্মনিবেদনের ভাষা ? সমস্ত নিখিল বিশ্ব জুড়ে যজ্ঞ চলছে, সবাই দিতে চাইছে, সবাই ক্ষণভঙ্গুর স্বার্থের ক্ষণিক খোলস ছেড়ে শাশ্বত লোকে যেতে চাইছে। তানেও চেয়েছিল। সবাইকে চাইতে হবে একদিন—"

"তানের কি হল তারপর ?" সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল।

"তানে হঠাৎ একদিন গভীর রাত্রে উঠে আমাকে বললে, শুনছ হেরোডোটাস ? শুনতে পাচ্ছ কিছু ?"

সেদিন এমনি ঝিল্লীধ্বনি দিগদিগন্ত ঝঙ্কৃত করছিল। ঝিল্লীধ্বনি ছাড়া আমি আর কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। সে কথা বললাম তাকে।

তানে বললে—"কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা ?"

"কই না—"

"ভাল করে' শোন—"

শুনতে পেলাম না কিছু।

তখন তানে বললে—"কচি ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছ না একটা ?"

"কচি ছেলের কান্না ? কই না"

"আমি পাচ্ছি"

তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে সে নিজেও কাঁদতে লাগল। আমি বুঝতে পারছিলাম না কিছু, অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ কেঁদে তানে বললে—"একটা কথা তোমাকে এতদিন বলি নি, আজ বলছি। তোমার কাছে আসবার আগে আমার একটি ছেলে হয়েছিল। সে কিন্তু বেশী দিন বাঁচে নি। তারই কান্না আজ ক'দিন থেকে শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে সে কোথাও যেন আছে, কোথাও যেন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। দেহের খাঁচায় বন্দী হয়ে আছি বলে যেতে পারছি না আমি তার কাছে। খাঁচাটা আমার ভেঙে দাও

তুমি।" শুধু সেদিন নয়, প্রতি রাত্রেই সে ধড়মড় করে' বিছানায় উঠে বসত, উৎকর্ণ হয়ে কি যেন শুনত খানিকক্ষণ, তারপর বলত—"ওই সন্ন্যাসীর মতো তুমিও যজ্ঞের আয়োজন কর, আর সে যজ্ঞে বলি দাও আমাকে। আমিই তো তোমার প্রিয়তমা, আমাকেই উপহার দাও, দেবতার উদ্দেশে আমাকেই উৎসর্গ কর অগ্নিমুখে…"

মিম্মির চুপ করিলেন।

"তারপর ?"—

"তাই করতে হল অবশেষে।…"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-গর্জ্জনে নৈশ নীরবতা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মিম্মির সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িলেন এবং বাহিরে গিয়া অনুরূপ আর একটা গর্জ্জন করিলেন। নিবিড় অন্ধকার হইতে সিংহের প্রত্যুত্তর আসিল। মিম্মির তাহার উত্তরে এমন একটা শব্দ করিলেন—যাহা আদেশ, অনুনয় এবং গর্জ্জনের অদ্ভুত সমন্বয়—তাহা যেন ক্ষুধার বাঙ্ময়ী রূপ…। পরমুহূর্ত্তেই খুব কাছেই সিংহটা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল। মিম্মির ভিতরে আসিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন-করত সকলকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, আলোটা নিবাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গর্জ্জন।

মিম্মির হাসিয়া বলিলেন—"সিংহ বন্দী হল—"

তারপর সহসা সুন্দরানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কুমার, আপনি একটা যজ্ঞের আয়োজন করুন। যে পশু-শক্তির উন্মাদনায় আমরা অহঙ্কৃত, অথচ যে শক্তি সামান্য কামের বা সামান্য লোভের ছলনায় তুচ্ছ হয়ে যায়—সেই পশু-শক্তির প্রতীক এই পশুরাজকে সেই যজ্ঞে বলি দিন"

সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন—"আপনিই তো এখনি বললেন যা প্রিয়তম, তাই দেবতার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করতে হয়। সিংহ আমার প্রিয়তম নয়। আপনার তানের মতো আমার যদি কেউ থাকত তাহলে করতাম—"

"আপনারও তো আছে"

মিম্মির সুরঙ্গমার দিকে চাহিলেন।

সুন্দরানন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন—"তানের মতো সুরঙ্গমা কি আত্ম-বিসর্জ্জন দিতে রাজি হবে; ওর এখন ভরা যৌবন—"

অপ্রত্যাশিতভাবে সুরঙ্গমা বলিয়া উঠিল—"নিশ্চয় রাজি হব, করুন আপনি যজ্ঞের আয়োজন। জীবনে অনেক ভোগ করেছি, এখন আর মরতে আপত্তি নেই। সুখের সাগরে ভাসতে ভাসতে ডুবে যাওয়াই তো ভাল, দুঃখ কখন কি মূর্ত্তিতে দেখা দেবে জানি না তো। আপনি যজ্ঞের আয়োজন করুন। আমি সানন্দে সেই যজ্ঞের বলি হ'ব"

"চমৎকার—চমৎকার—"

মিম্মির সহর্ষে হাততালি দিয়া লাফাইয়া উঠিলেন।

কুমার সুন্দরানন্দের মুখভাবে যদিও বিষাদের ছায়া পড়িল কিন্তু তাঁহাকে বলিতে হইল—"বেশ তো—"

বিদেশী মিম্মিরের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হওয়া কি চলে? সুন্দরানন্দের মনে হইল নিজের দুর্ব্বলতার জন্য আর্য্যাবর্ত্তের সম্মান ক্ষুণ্ণ করিবারও অধিকার তাঁহার নাই। সত্য সত্যই যজ্ঞের আয়োজন শুরু হইয়া গেল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল, ইহা যেন পুরাতন চাঁদ নয়। মনে হইতেছিল বিধাতার গোপন শিল্প-নিকেতন হইতে ইহা যেন সদ্য বাহির হইয়া আসিয়াছে বিনিদ্র নিশাচর নিশাচরীদের

নয়নে নূতন স্বপ্ন সৃজন করিবে বলিয়া। নিস্তব্ধ গভীর রজনীর মর্ম্ম-লোকে সত্যই নূতন স্বপ্ন অপরূপ মহিমায় মূর্ত্ত হইতেছিল, কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত নিবিয়া গেল। দুই দিক হইতে দুইটি কালো মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিল।

প্রথম মেঘ অধীরভাবে বলিল—"ভাল করে একটু তলিয়ে ভেবে দেখতে চাই, তাই আলোটা নিবিয়ে দিলাম। অন্ধকার না হলে ভাবা যায় না ভাল করে'—"

দ্বিতীয় মেঘ প্রশ্ন করিল—"কি ভাবিতে চান—"

"ভাবতে চাই যে আমরা দুজনে সেই অনাদিকাল থেকে করছি কি"

"খেলা"

"খেলাটাও কি সত্য? না ওটাও ছলনা"

"কাকে আমরা ছলনা করব বলুন"

"নিজেদের"

"নিজেদের ছলনা করতে যাব কেন"

"আমরা যে কিছু করছি না এই সত্যটাকে নিজেদের কাছ থেকেই যথাসম্ভব সরিয়ে রাখবার জন্য"

"তাই বা করবার দরকার কি আমাদের"

"সত্যটা যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। আমি কিছু করছি না এই ধারণাটা কতক্ষণ বরদাস্ত করা যায় বল। তোমার কি বিশ্বাস আমরা সত্যি খেলাই করছি?"

"আমি যা উত্তর দেব, তা তো আপনার মনেই আছে। ভাষায় সেটা শুনতে চান?"

প্রথম মেঘের সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরিত হইল। পরমুহূর্ত্তে বজ্রগর্জ্জনে ধ্বনিত হইল—"চাই। আমার মনের অতলে কি যে আছে তা জানি না। তাকে ভাষা দাও—"

"আপনি অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজেকেই খুঁজছেন"

"অন্ধকারটাই বা কি, আমিই বা কে—"

"অন্ধকার অনিশ্চয়তা, আপনি জিজ্ঞাসা। অন্ধকার পতিত ভূমি, আপনি হলায়ুধ কৃষক। আপনি যাচাই করছেন নিজের শক্তিকে, রূপ দিতে চাইছেন অনন্ত কল্পনাকে। সংক্ষেপে নিজেকেই খুঁজছেন আপনি আপনার সৃষ্টির মধ্যে—"

"চার্ব্বাকদের বিরুদ্ধে আমার রাগটা তাহলে মেকি বল!"

"আপনার রাগ অনুরাগ বিরাগ কিছু নেই। আপনি নির্ব্বিকার স্রষ্টা। নিজেকে নিয়ে খেলাই করছেন কেবল অনাদিকাল থেকে। খেলনাগুলো আপনার খেলার উপলক্ষমাত্র, কখনও সেগুলো সাজাচ্ছেন, কখনও আবার অবহেলাভরে ফেলে দিচ্ছেন। কখনও গড়ছেন, কখনও ভাঙছেন—"

"কিন্তু সত্যই কি কিছু গড়ে' উঠছে, না ওটাও আমার কল্পনার ফাঁকি—"

"কোনটা ফাঁকি, কোনটা ফাঁকি নয়—কোনটা বাস্তব, কোনটা অবাস্তব তা নিয়ে মাথা ঘামাক অ-কবিরা। আপনি যা করছেন তাই করুন—"

যে মেঘ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুৎগর্ভ ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা জ্যোৎস্না-মণ্ডিত মনোহর হইয়া উঠিল। ক্রমশ তাহারা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইল। অনাবৃত চন্দ্র-কিরণে যখন দিগদিগন্ত প্লাবিত হইয়া যাইতেছে তখন দেখা গেল দুইটি পক্ষী দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালন করিয়া দিগ্বলয়ের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়াছে। তাহারা উচ্চ-কাকলীতে যাহা বলিতেছিল তাহা পক্ষী-ভাষায় হয়তো অন্য অর্থ বহন করে, কিন্তু মনে হইতেছিল যেন তাহারা বলিতেছে—'তাই-করি-চল, তাই-করি-চল, তাই-করি-চল'।

জালার ভিতর হইতে চার্ব্বাক যখন সন্তর্পণে বাহির হইল তখনও চন্দ্রকিরণে চতুর্দ্দিক স্বপ্নাচ্ছন্ন। চার্ব্বাকের সমস্ত অন্তরও স্বপ্নাচ্ছন্ন। নীলোৎপলার সুরা-পান করিয়া সে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহাই যেন নূতনরূপে তাহাকে অভিভূত করিল। স্বপ্নে যে সুন্দরীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া সে রূপকথালোকে প্রবেশ করিয়াছিল সে সুন্দরী সুরঙ্গমারূপে যেন তাহার নব-স্বপ্নলোকে আসিয়া তাহাকে বলিতেছিল—"মন থেকে অবিশ্বাস দূর করতে হবে। অবিশ্বাস জিনিসটা ধোঁয়ার মতো, দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট করে' দেয়। তাহার নাস্তিক্যবুদ্ধি তর্ক করিতে উদ্যত হইলে সুরঙ্গমা ভ্রূভঙ্গী-সহকারে তাহাকে শাসন করিতেছিল। বলিতেছিল, "তুমিই ভণ্ড কালকূট। বর্ণমালিনী তোমারই চাকচিক্যময়ী প্রতিভা, তাহার ভয়ে তুমি ত্রস্ত, তাহাকে তুমি তুষ্ট রাখিতে চাও। অথচ তাহারই সহায়তায় তুমি লাভ করিতে চাও অসম্ভবা মেঘমালতীকে, মেঘরাগ এবং মালতী ফুলের সম্মিলনে যে মূর্ত্ত হয়ে আছে কবির কল্পনালোকে, তোমার নাগালের বাইরে। তাকেই পাবার জন্যে তুমি উদ্বাহু হয়ে আছ। তোমার কামনা নদীরূপ ধারণ করে' তোমাকে যা বলেছিল তাই তোমার সত্য পরিচয়। তুমি যুক্তিবাদী, কিন্তু কামনার প্ররোচনায় তুমি তোমার যুক্তিকেও লঙ্ঘন করতে ইতস্তত কর না। যুক্তিবাদ তোমার জীবন-দর্শন নয় তোমার কামনা-উপভোগের একটা ওজুহাত মাত্র, প্রয়োজন হলে এ ওজুহাত পরিত্যাগ করতে তোমার আপত্তি নেই।" কল্পনায় সুরঙ্গমার ভ্রূভঙ্গী-মনোহর মুখের দিকে চার্ব্বাক চাহিয়াছিল, সিংহগর্জ্জনে সহসা চমকাইয়া উঠিল। কিসের গর্জ্জন এ? এদিক ওদিক চাহিয়া প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইল না। তাহার পর কিছুদূরে বিরাট পিঞ্জরটা তাহার চোখে পড়িল। ভীত-বিস্মিত-চিত্তে গাছের ছায়ায় ছায়ায় সেদিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিল। গহ্বর হইতে জালবদ্ধ

সিংহকে তুলিয়া মিম্মির তাহাকে একটি সুদৃঢ় লৌহপিঞ্জরে বন্দী করিয়াছিলেন। চার্ব্বাক সেই পিঞ্জরের সমীপবর্ত্তী হইয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল। সত্যই বিরাটকায় একটা সিংহ পিঞ্জরের মধ্যে পদচারণ করিতেছে! সহসা সিংহটা পিঞ্জরের অন্ধকার দিকটায় গর্জ্জন করিয়া আগাইয়া গেল এবং সেইখানেই থাবা গাড়িয়া বসিল। একটা বৃহৎ বৃক্ষের ছায়া পড়িয়া সে দিকটা অন্ধকার হইয়াছিল তবু কিন্তু চার্ব্বাক দেখিতে পাইল, সেই অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্ত্তির মতো কে একজন দাঁড়াইয়া আছে। চার্ব্বাকের ভয় হইল। যদি কেহ তাহাকে দেখিয়া ফেলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চার্ব্বাক সরিয়া যাইতেছিল কিন্তু আর একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটাতে তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। ছায়ামূর্ত্তি মধুরকণ্ঠে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়া উঠিল। মনে হইল সিংহকে গান শোনাইবার জন্যই যেন সে এই গভীর রাত্রে গভীর অন্ধকারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চার্ব্বাক উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর আর সন্দেহ রহিল না। ওই ছায়ামূর্ত্তি সুরঙ্গমা ছাড়া আর কেহ নয়। অমন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কি আর কাহারও হইতে পারে? চার্ব্বাক ছায়া-মূর্ত্তির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"সুরঙ্গমা"

"কে"

"আমি চার্ব্বাক"

"মহর্ষি চার্ব্বাক! আপনি এখানে!"

"তোমার জন্য এসেছি"

"আমার জন্য? কেন!"

চার্ব্বাকের ইচ্ছা হইল উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে প্রণয় নিবেদন করে, কিন্তু

পারিল না। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সংযতকণ্ঠে বলিল—"তোমাকে বাঁচাতে। সুন্দরানন্দের যজ্ঞের কথা আমি শুনেছি। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড আমি হ'তে দেব না—"

সিংহটা গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"এ সিংহ কোথা থেকে এল"

"আমরা ফাঁদ পেতে ধরেছি"

"কেন"

"সুন্দরানন্দের একজন বন্ধু এসেছেন, তাঁর সখ হয়েছে সিংহ ধরার"

ক্ষণকাল নীরবতার পর সুরঙ্গমা বলিল—"আপনি কি করে' এখানে এলেন"

"লুকিয়ে—"

"লুকিয়েই চলে' যান তাহলে। আপনার এখানে থাকা নিরাপদ নয়"

"কেন—"

"মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গে তাঁর কন্যা ধারামতী এখানে এসেছে। সে অন্তঃসত্ত্বা। ধারামতী সুন্দরানন্দের কাছে যা ব্যক্ত করেছে তা আপনার পক্ষে সম্মানজনক নয়। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন, আপনাকে বন্দী করে' আনতে। বিচারে যদি দোষী প্রমাণিত হন, তাহলে আপনার কঠোর শাস্তি হবে। মহর্ষি পর্ব্বতের কন্যার সতীত্ব নষ্ট করা সামান্য অপরাধ নয়। আপনি অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করুন। আমি আপনার আগমন বার্ত্তা কারো কাছে প্রকাশ করব না।"

"কিন্তু আমি তোমাকে নিতে এসেছি। তোমাকে না নিয়ে আমি যাব না। কতকগুলো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভ্রান্ত পশু যে যজ্ঞের নামে তোমাকে হত্যা করবে, এ আমি সহ্য করতে পারব না"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি ফুটিল।

"কি করবেন আপনি? ওরা আপনার চেয়ে বেশী শক্তিমান। ওদের সঙ্গে কি পারবেন"

"ওরা আমার চেয়ে বেশী শক্তিমান হতে পারে, কিন্তু বেশী বুদ্ধিমান নয়। বলে না পারি, ছলে বা কৌশলে আমি তোমাকে উদ্ধার করব এ বিশ্বাস আছে বলেই এত কষ্ট করে' এখানে এসেছি—"

এমন সময় অরণ্যের অন্ধকারে একটা খস খস শব্দ পাওয়া গেল।

"কেউ আসছে এদিকে। আপনি সরে' যান এখন এখান থেকে—"

"আমি এই অরণ্যেই লুকিয়ে থাকব। কাল রাত্রে আবার আসব তোমার দেখা যেন পাই"

"আচ্ছা—"

চার্ব্বাক অরণ্যের অন্ধকারে অন্তর্দ্ধান করিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পদশব্দও থামিয়া গেল। সুরঙ্গমা কয়েক মুহূর্ত্ত উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর সে-ও চলিয়া গেল। সিংহটা থাবা পাতিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল এইবার সে গর গরর্, গর গরর্ শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল আবার, মনে হইল তাহার হৃদয় বুঝি শতখণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। বিদীর্ণ হইবারই কথা, কারণ তাহার খাঁচার ঠিক বাহিরেই এক শশক-দম্পতি আসিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল এবং স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। পশুরাজের পক্ষে এ ধৃষ্টতা সহ্য করা অসম্ভব।

সুরঙ্গমা অরণ্যের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া মির্ম্মিরের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। মির্ম্মির চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়াছিলেন, সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই চক্ষু উন্মীলিত হইল, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন —"গান শুনে সিংহ শান্ত হল—একটু—?"

"হচ্ছিল, কিন্তু আমি থাকতে পারলাম না ওখানে, বড় মশা আর দুর্গন্ধ—"

"গান সাপকে মুগ্ধ করে জানি, সিংহকেও করে কি না জানবার কৌতূহল ছিল···আচ্ছা, কাল আবার একবার চেষ্টা করবেন। ঘুমুবেন না কি এখনই—"

"ঘুম পাচ্ছে, কিন্তু···"

সুরঙ্গমা ন-যযৌ ন-তস্থৌ অবস্থায় ইতস্তত করিতে লাগিল। তাহার পর সহসা মুচকি হাসিয়া বলিল—"আচ্ছা আজ রাতটা যদি আপনার শয়নকক্ষে কাটাই আপনি আপত্তি করবেন ?"

মিম্মির হাসিয়া বলিলেন—"ব্যক্তিগতভাবে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, যদি কুমারের আপত্তি না থাকে—"

"আপনারই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে কুমার আমাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করেছেন। যে মুহূর্ত্তে স্থির হয়ে গেছে যে আমি যজ্ঞে বলি হব, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তিনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েছেন। আপনি তো জানেন তিনি আমার গানও আর শোনেন নি, আমাকে আর নৃত্য করতেও আদেশ দেন নি। আপনিই অনেকদিন পরে আজ বললেন সিংহকে গান শোনাতে। সেটাও আপনার এক বিশেষ কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে। আপনারা দুজনেই আমাকে ব্যবহার করে' নিজ নিজ তৃপ্তি সন্ধান করছেন, করুন, তাতে আমার আপত্তি নেই। পুরুষদের খেয়ালের স্রোতে গা ভাসিয়েই সারাটা জীবন কেটেছে আমার। নিজেরও নানারকম খেয়াল নানারকম কৌতূহল জীবনে মিটিয়েছি আমি। এখন হঠাৎ ইচ্ছে হচ্ছে মরবার আগে আপনার স্বরূপটা ভাল করে' দেখে যাব। আপনি অনুমতি দেন আজ আপনার সঙ্গেই রাতটা কাটাই"

মিম্মির হাসিয়া উঠিলেন।

বলিলেন—"আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি আমার স্বরূপ জানতে পারবে?"

সুরঙ্গমার নয়নের দৃষ্টিতে সহসা যেন আগুন ধরিয়া গেল। কিন্তু শান্তকণ্ঠে মধুর হাসিয়া সে বলিল—"পারব। পুরুষের স্বরূপ জানতে মেয়েদের দেরী হয় না"

"অধিকাংশ পুরুষের বললে কথাটা ঠিক হত হয়তো। যে পথ দিয়ে তোমরা সাধারণত পুরুষের স্বরূপ সন্ধান কর আমার সে পথ আমি তানের মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে' দিয়েছি। তানের দেহ যখন যজ্ঞাগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল আমিও তখন উপবেশন করেছিলাম জ্বলন্ত অঙ্গার স্তূপের উপর। পৌরুষের শারীরিক চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে গেছে আমার।

সুরঙ্গমার নয়ন আনত হইল। অধরে চাপা একটি হাসি স্ফুরণোন্মুখ হইয়া উঠিল। মিম্মিরের দিকে অপাঙ্গে একবার চাহিয়া সে বলিল—"আপনার শরীর সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই, আমার আগ্রহ আপনার মনের স্বরূপ জানবার—"

"আমার সঙ্গে রাত্রিবাস করলেই কি তা জানতে পারবে?"

"বিশ্বাস আছে পারব। আপনিই তো সেদিন বলেছিলেন রাত্রির নিবিড়তায় এমন অনেক সত্য জানা যায় যা দিনের আলোয় জানা সম্ভব নয়"

মিম্মিরের নয়নদ্বয় আবার নিমীলিত হইল। মনে হইল অন্তরের অন্তঃস্থলে তিনি কি যেন সন্ধান করিতেছেন। সহসা চক্ষু খুলিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না, তানে মানা করছে"

"তানে? সে কোথায়—"

"এইখানে"

মির্ম্মির নিজের বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া বলিলেন—"তাকে সম্পূর্ণ-রূপে ত্যাগ করেছি বলেই সম্পূর্ণরূপে পেয়েছি"

সুরঙ্গমা মুহূর্ত্তকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকিয়া মন স্থির করিয়া ফেলিল। বলিল—"কুমারও বোধহয় তাহলে আমাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছেন সম্পূর্ণরূপে পাবেন বলে'—? আহা, আমারও যদি উপায় থাকত"

"উপায় আছে বই কি"

"আমি সামান্যা নর্ত্তকী। আমাকে কুমার অনায়াসে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করে' ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন কিন্তু আমি কি কুমারকে যজ্ঞাগ্নিতে সমর্পণ করবার কথা ভাবতেও পারি।"

"ইচ্ছে করলে তুমি কুমারকে এই মুহূর্ত্তে চিরকালের মতো ত্যাগ করে' যেতে পার। সে স্বাধীনতা তোমার আছে বই কি"

"কিন্তু আমি যে স্বেচ্ছায় কথা দিয়েছি যে কুমারের যজ্ঞে আত্মবলি দেব। সামান্যা নর্ত্তকী হলেও আমার কথার মূল্য আছে"

"মহর্ষি পর্ব্বত কাল বলছিলেন শাস্ত্রে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ তোমার বদলে আর কাউকে বলি দিলে শাস্ত্রমতে কোনও অন্যায় হবে না। কুমার পশু না দিয়ে মানুষও যদি দিতে চান তাও কিনতে পাওয়া যাবে"

"মহর্ষি পর্ব্বত এ নিয়ে হঠাৎ মাথা ঘামাচ্ছেন কেন"

"তোমার সম্বন্ধে তাঁর কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে লক্ষ্য করেছি। তিনি বলছিলেন সুরঙ্গমার মতো অমন একজন অনবদ্যা রূপসীকে পুড়িয়ে মারার কোনও প্রয়োজন নেই। তার বদলে অন্য মানুষ দিলেও চলে—"

"কুমার শুনেছেন ?"

"শুনেছেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করেন নি"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর মিস্মিয়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সিংহের পিঞ্জরের সম্মুখে যে শশকদম্পতী উবু হইয়া বসিয়া সম্মুখের পদযুগল দ্বারা গুম্ফ-পরিচর্য্যায় নিরত ছিল সহসা তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল।

প্রথম শশক দ্বিতীয় শশককে সম্বোধন করিয়া বলিল—"খুব জমেছে, কি বল"

"খুব"

"সুরঙ্গমা কি করবে বলতো—"

"তা তো আমার চেয়ে আপনি ভালো জানেন"

"জানি, কিন্তু ঠিক ধরতে পারছি না। ওরা মানুষ কি না, ওদের একটা স্বাধীন বুদ্ধি দিয়েছি, ওদের সেই স্বাধীন বুদ্ধি যে কখন কি করে বসে বলা শক্ত! সেইজন্যেই তো স্বৈরচর করবার কল্পনা আপাতত ত্যাগ করেছি। মানুষ স্বৈরচর হলে' তচনচ করে' ফেলবে সব। মানে নিজেরই কল্পনাসমুদ্রে নিজেকেই তখন হাবুডুবু খেতে হবে, নাকানি চোকানির আর শেষ থাকবে না। কথা বলছ না যে"

শশকী গোঁফ-চোমরানো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিয়া বলিল—"বলবার কিছু নেই বলেই চুপ করে' আছি। তাছাড়া আমার মনটা পড়ে আছে কবির কলমের ডগায়"

"কোন কবির"

"যিনি শিখর সেনের কাহিনী লিখছেন"

"কেমন লাগছে গল্পটা"

শশকী পুনরায় গোঁফে মন দিল।

"উত্তর দিচ্ছ না যে"

"আমি কি উত্তর দেব! আপনিই বরং বলুন আপনার সৃষ্টিকে আমি ঠিক ভাষা দিতে পারছি কি না"

পুনরায় গোঁফে মন দিল।

সিংহ-গর্জ্জনে আর একবার চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইল। "ভারী হাল্লা করছে সিংহটা। চল কবির কাছেই যাওয়া যাক। তার বাতির উপরকার ঢাকনাটি চমৎকার। সেইখানেই বসি চল খানিক-ক্ষণ। এদের গল্পটা ততক্ষণ জমুক খানিকটা—

শশক দম্পতী অন্তর্হিত হইল। ক্ষণকাল পরে দুইটি ছোট ছোট পতঙ্গ আসিয়া কবির কক্ষে বিদ্যুৎ বর্ত্তিকার নীল আবরণের উপর বসিল। কবির মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হইল না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

২০

কবি সত্যই তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"পুলিশের কর্ম্মচারী শিখরের দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম আমি। আমার চোখের দৃষ্টিতে সে বিস্ময় অশোভন রূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল নিশ্চয়। কারণ আমার চোখের দিকে চেয়ে শিখর মৃদু হেসে বললে—"অমন করে' দেখছিস্ কি ?"

"তোকে! তুই যে শেষটা পুলিশের লোক হয়ে উঠবি তা ভাবতেই পারি নি। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোকে সত্যি"

শিখর একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। সেই কয়েক সেকেণ্ডেই আমি তাকে আবার ফিরে পেলাম যেন, সেই কিশোর শিখরকে, যার চোখের চাহনিতে অবাক বিস্ময় আভাসিত

হ'ত মাঝে মাঝে, মর্ত্ত্যলোক ছেড়ে সহসা স্বপ্নলোকে পাড়ি দিতে পারত যে এক নিমেষে। আবার ফিরে আসত, মুখে অপ্রস্তুতভাব ফুটে উঠত, মুচকি হেসে আড়চোখে চেয়ে দেখত তার এই আকস্মিক স্বপ্ন-প্রয়াস আমরা লক্ষ্য করেছি কি না।

আমার কথার উত্তরে সে হেসে বললে—"বাইরে হয়তো অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে আমি বদলাই নি। যা ছিলাম ঠিক তাই আছি—"

"আমাদের কারবার বাইরেটা নিয়েই। সেইটে বদলেছে বলেই অদ্ভুত লাগছে। তোর ভিতরের একটা খবর অবশ্য পেয়েছিলাম—"

কথাটা শেষ করলাম মুচকি হেসে।

"সে খবরটাও অবশ্য খবর কিন্তু আসল খবর নয়"

"আসল খবরটা কি তাহলে"

"আসল খবঁর আমি উৎসুক, আমি কৌতূহলী!—"

বলেই গম্ভীর হয়ে গেল সে।

"ওরে বাবা, ঘোর দার্শনিক হয়ে উঠেছিস্ দেখছি। পুলিশের কোন ডিপার্টমেন্টে তুই আছিস"

"আই. বি."

"আমাদের অঞ্চলে আগমন কোনও ফেরারীর উদ্দেশ্যে না কি"

"একটা কালোবাজারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি"

আমার বাসার সামনে যে বিরাট বোর্ডিং হাউসটা ছিল সেইটের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করে' সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—"আমার পরিচয় কিন্তু কাউকে বোলো না যেন। আমাকে যে চেন তা-ও প্রকাশ কোরো না কারো কাছে। ওই বোর্ডিংয়ের তিনতলায় একটা রুম নিয়ে আমি থাকব ভাবছি। এখানে আমার নাম হবে—এস. কে. দাস, হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট। যদি আমাকে

কোনও কারণে প্রয়োজন হয় ওই নামেই আমার খোঁজ কোরো। আসল কথাটা ঘুণাক্ষরে যেন প্রকাশ না পায়''—কত সামান্য কারণে মানুষের মনে আঘাত লাগে। শিখরের এই কথায় কেমন যেন আহত হলাম একটু। মনে হল যেন ওর কথায় একটা পুলিশী মনোভাব ব্যক্ত হল, একটা আদেশ যেন অনুরোধের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করল। ব্যাপারটা ভাল করে, বিশ্লেষণ করে, এখন বুঝছি ওটা মজ্জাগত ঈর্ষ্যারই একটা ছদ্মবেশ। শিখর যে জীবনে উন্নতি করেছে সহসা সেটা আবিষ্কার করে' আমার অনুন্নত সত্তাটা ক্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল এবং বেদনাতুর করেছিল মনকে, শিখরের ব্যবহারে কোন দোষ ছিল না।

...দিন কয়েক পরেই দেখলাম ত্রিতলের একটি ঘরে শিখর এসে আড্ডা গেড়েছে। শিখরের কাছে যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই ছিল না আমার, দূর থেকেই আমি তার গতিবিধির সব খবর রাখতাম। আমার কাছে দূরবীণ ছিল।...

...ভক্ত যেমন নিয়মিতভাবে তার আরাধ্য দেবতাকে ধ্যান করে, আমি ঠিক তেমনি ভাবে রোজ দেখতাম আলেয়াকে। ওটা আমার নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। যখনই হাতে কাজ থাকত না তখনই আমি দূরবীণটি নিয়ে জানলার কাছে বসতাম। এমন ভাবে বসতাম যাতে আশেপাশের বাড়িতে কারও মনে সন্দেহ না জাগে। আমি যে দূরবীণ নিয়ে জানলার ধারে বসে আছি তা দেখতেই পেত না কেউ বাইরে থেকে। জানলার কপাট দুটো প্রায় বন্ধ থাকত, সামান্য একটু ফাঁক রাখতাম দূরবীণটির জন্য শুধু। বাইরে থেকে বোঝা যেত না কিচ্ছু। আলেয়াকে অবশ্য রোজ দেখতে পেতাম না। এমন অনেক দিন গেছে যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকে দেখতে পাই নি। এর ফাঁকে ফাঁকে শিখর সেনকেও দেখতাম। দিনের বেলা

প্রায়ই দেখা যেত না তাকে। প্রায়ই চোখে পড়ত তালা ঝুলছে তার ঘরের সামনে। একদিন দেখতে পেলাম দোতলার একটা কোণের ঘর থেকে ছিমছাম ফিটফাট একটি মেয়ে বেরুচ্ছে। মেয়েটি শুধু রূপসী নয়, তার চোখে মুখে এমন একটা সাধারণ ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট যা দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। পরদাপ্রথা উঠে গেছে আজকাল। পথে ঘাটে আজকাল অনেক রূপসী দেখা যায়, মনে হয় চেষ্টা করলে তাদের নাগালও হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এ মেয়েটিকে দেখে তা মনে হয় না। মনে হয় ও যেন উল্কা, ওকে কোনও দিন হাতের মুঠোয় ধরা যাবে না। মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে গটগট করে' নেবে এল দেখলাম। তারপরই দেখতে পেলাম বেশ দামী একটা মোটর তার জন্যে অপেক্ষা করছিল, সে এসে চড়তেই গাড়িটা চলে গেল। মেয়েটি যে ঘর থেকে বেরুল সেই ঘরের বদ্ধদ্বারের উপর দূরবীক্ষণের দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম তার পর। দেখলাম দ্বারের পাশেই একটা নাম লেখা প্লেট, বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে মিস এ মুখার্জ্জি-নার্স। এই এ মুখার্জ্জি যে অবন্ধনা মুখার্জ্জি তা কল্পনা করতে পারি নি। পারলে যে আনন্দ আমি সে কদিন উপভোগ করেছিলাম তার তীব্রতাটা যে অনেক কমে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কয়েকদিন পরেই লক্ষ্য করেছিলাম যে, শিখর মেয়েটির সঙ্গে বেশ মেলামেশা শুরু করেছে। রাত্রে প্রায় ওর ঘরে গিয়ে বসে, অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করে দু'জনে। দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল। একনিষ্ঠ প্রেমিক শিখরের সঙ্গে নিজের তুলনা করে' মনে মনে বড় কুণ্ঠিত ছিলাম আমি। মনে হত বিয়ে করে' আমি যেন অনেক নেমে গেছি, আলেয়ার প্রতি অবিচার করেছি। প্রেমের জন্য গৃহত্যাগী শিখরের একনিষ্ঠতার কাহিনী আমাকে মুগ্ধ করত, পীড়িতও করত। সেই শিখরকে এখন নিজের দলে দেখে ভারী আনন্দ হ'ল সত্যি। মিস এ.

মুখার্জ্জি যে অবন্ধনা এ খবর পেলে আমার আনন্দ অনেকটা কমে' যেত। অবন্ধনাকে আমি চিনতে পারি নি, কারণ তাকে আমি দেখি নি কখনও। এই বোর্ডিংএ শিখরের সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাতের বিবরণটা আমি জেনেছি অনেক পরে। তার ডায়েরি থেকে। চন্দ্রমোহন যে ডায়েরি দিয়েছিল, সে ডায়েরি থেকে নয়। এই দ্বিতীয় ডায়েরিটা আমি পেয়েছিলাম উমেশ মামার কাছ থেকে। উমেশ মামা শিখর সেনের সহকর্ম্মী, তিনিই তার জীবনের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যটি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর তিনিই ডায়েরিটা দিয়েছিলেন আমাকে। সেই ডায়েরি থেকে প্রথম সাক্ষাতের বর্ণনাটি উদ্ধৃত করছি।

"দৈব এবং পুরুষকার নিয়ে আমাদের দেশের দার্শনিক সমাজে অনেক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। একদল বলেন অমোঘ দৈবের কাছে পুরুষকার নিষ্প্রভ। অদৃষ্টে যা আছে তাই হয়, শত চেষ্টা করেও মানুষ নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করতে পারে না। আর একদলের মতে যা আমরা দৈব বলে' মনে করি তা আমাদের কল্পনা বিলাস মাত্র, পুরুষকার দ্বারাই মানুষ নিজের ভাগ্য গঠন করে। আমরা যে অপ্রত্যাশিত সুখ বা দুঃখ ভোগ করি তার কারণ অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না সত্য। কিন্তু তার জন্য দায়ী আমাদের বুদ্ধির এবং দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা, এর জন্যে একটা কাল্পনিক দৈবশক্তিকে খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। আমার সুখদুঃখ সম্পুর্ণরূপে আমার পুরুষকারেরও ফলাফল নয়, আরও অনেকের কর্ম্মধারা আমার সুখদুঃখকে প্রভাবিত করছে। অর্থাৎ আরও অনেক লোকের পুরুষকার আমার পুরুষকারকে কখনও আমার জ্ঞাতসারে কখনও আমার অজ্ঞাতসারে সফল বা ব্যর্থ করে দিচ্ছে। আমাদের জীবনের

অপ্রত্যাশিত সুখদুঃখের এ-ও একটা কারণ। এর জন্য দৈব নামক একটা অযৌক্তিক ব্যাপারকে আনবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তৃতীয় আর একদল বলেন পুরুষকারই সব। এজন্মে যেটা আমরা দৈব বলে' মনে করছি সেটা পূর্ব্বজন্মের পুরুষকারের ফল। বীজ বপন করবামাত্র যেমন সঙ্গে সঙ্গে ফলফুল শোভিত গাছ জন্মে না, তেমনি কোনও সুকর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্ম করবার সঙ্গে সঙ্গেই তার ফল পাওয়া যায় না। অনেক সময় পরজন্ম পর্য্যন্ত তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়। এইটেকেই আমরা দৈব বলে' মনে করি।

উপরোক্ত তত্ত্ব আমার নিজের জীবনে প্রয়োগ করে' বিস্ময়ে কল্পনায় অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনাকে আমি ভালো বেসেছিলাম, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে চেয়েছিলাম তাকে. কিন্তু সে ভালবাসার যথার্থ মূল্য দেবার শক্তি ছিল না আমার। নির্য্যাতিত হয়ে প্রাণের ভয়ে সে যখন আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল আমি সভয়ে সরে' দাঁড়িয়েছিলাম। বীর্য্যবান প্রেমিকের মতো তাকে বলতে পারি নি—ভয় নেই, আমার পাশে এসে দাঁড়াও তুমি। তাই সে চলে গিয়েছিল আমার কাছ থেকে। আমার ভীরুতার ফলভোগ করেছিলাম সঙ্গে সঙ্গে। আগুনে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে যেমন হাত পুড়ে যায়, অনেকটা তেমনি। কিন্তু আমি যে তাকে চেয়েছিলাম, তার জন্যে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছিলাম, অনেক বিনিদ্র রজনী যাপন করেছিলাম—তার ফল কি এতদিনে ফলল? যেটাকে দৈবাৎ বলে' মনে হচ্ছে সেটা কি আমার পুরুষকারেরই ফল!

গভর্ণমেণ্টের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার ঘুষ খেয়ে অনেক অন্যায় কাজ করছেন। যাঁরা তাঁকে ঘুষ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে একজন না কি এই বোর্ডিংয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করেন। তাঁরই গতিবিধি লক্ষ্য করবার জন্যে এখানে এসে বাসা বেঁধেছি আমি। এখানে অবন্ধনার

দেখা পাব তা আমার সুদূরতম কল্পনারও বাইরে ছিল। তিনতলায় একটা ঘরে আছি আমি। স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে দোতলায় একটা ঘরে অবন্ধনা আছে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ একদিন সিঁড়িতে। আমি নাবছিলাম, সে উঠছিল। আমি প্রথমে চিনতেই পারি নি। সেই দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে।

"শিখরদা! তুমি এখানে হঠাৎ?"

"অবু?"

স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে। চিনতে পারলাম তাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি যে অবন্ধনাকে চিনতাম এ ঠিক সে নয়। এর শাড়ীর পারিপাট্যে, ফাঁপানো চুলের কায়দায়, এর গালের রঙে, চোখের কাজলে, এর ভ্যানিটি ব্যাগে আর সৌখীন স্যাণ্ডালে যে পরিচয় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে পাড়াগেঁয়ে দুরন্ত দামাল সেই কিশোরী অবন্ধনার কোনও মিল নেই। কিন্তু অমিলটাই আমাকে যেন পুলকিত করে' তুলেছিল ক্ষণিকের জন্য। মনে হয়েছিল সেই পাড়াগাঁয়ে দুরন্ত মেয়েটা আমার নাগালের বাইরে ছিল, এই কেতাদুরস্ত তরুণীটিকে আয়ত্তের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব হবে না। ওর পোষাক-পরিচ্ছদে, ওর প্রসাধনে, ওর দৃষ্টিতে একটা প্রচ্ছন্ন আমন্ত্রণ আভাসিত হচ্ছে যেন। তখন বুঝতে পারি নি যে অবন্ধনা চিরকালের মতো আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে। আমার প্রশ্নে একটা শাণিত দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবন্ধনার চোখে। "হ্যাঁ, আমি অবু। ঠিক অবু নই, মিস. এ. মুখার্জ্জি"

"কি রকম?"

"তুমি এখানে এলে কি করে!"

"আমি তেতলার একটা ঘরে থাকি যে"

অবন্ধনা বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল ক্ষণকাল।

"এই বোর্ডিংএর তেতলার ঘরে?"

"হ্যাঁ—"

"কোন নম্বরে"

"বাইশ। সমস্ত ঘরটাই আমি নিয়েছি"

"কোলকাতায় কি করছ"

"চাকরি। তুমি কি করছ এখানে"

"আমিও এখানে থাকি। দোতলায় সাত নম্বরে। একেবারে কোণের ঘরটা—"

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম খানিকক্ষণ।

"তুমি এখানে কেন—"

"আমি নার্স হয়েছি। মিডওয়াইফারিতে প্র্যাকটিস করি।"

"ও। তা এই বোর্ডিংএ কেন।"

"অন্য কোথাও ভাল বাসা পাই নি। এখানে ভালই আছি। তুমি ক'দিন এসেছ এখানে"

"পরশু"

"কি করছ এখানে"

"চাকরি"

"কি চাকরি"

আমি যে পুলিশের লোক তা প্রকাশ করা সমীচীন মনে হল না। বললাম—"মার্চেন্ট আপিসে কেরাণীগিরি করি"

"আমার ঘরে যাবে? এস না"

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল এখন ওর সঙ্গে ওর ঘর গেলে ছদ্ম আবরণটা খুলে পড়বে। নিজেকে সামলাতে পারব না হয় তো।

"একটু দরকারি কাজে বেরুচ্ছি। পরে আসব এখন। দোতলায় সাত নম্বর তো ?"

"সন্ধ্যের পর এস তাহলে"

"আচ্ছা—"

সেই বোর্ডিংএ শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এই প্রথম সাক্ষাৎ ক্রমশ যে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠছিল তা আমি স্বচক্ষে দেখছিলাম রোজ! বস্তুত রাত্রি দশটার পর ওই আমার একমাত্র কাজ ছিল। শিখরেরও বোধহয় একমাত্র কাজ ছিল, রাত্রি দশটার পর ওর ঘরে গিয়ে গল্প করা। গল্পটা যে নিছক প্রেমালাপ ছাড়া আর কিছু নয় এই মনে করে' আমি পুলকিত হতাম। আগেই বলেছি মেয়েটি অবন্ধনা জানলে পুলকের বদলে আমার মনে ঈর্ষাই জাগত। কিন্তু ওদের আলাপের সুর যে ঠিক কি ছিল তা আগে টের পাইনি, এখন পাচ্ছি শিখরের ডায়েরি থেকে।

শিখর লিখছে—"এতদিন পরে অবন্ধনাকে যে আবার ফিরে পাব সত্যিই তা আমার কল্পনাতীত ছিল। তাকে স্বচক্ষে দেখেও কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সেই দিনই রাত্রে গেলাম তার ঘরে। গিয়ে দেখি সে খুব ডগমগে রঙের একটা নাইট গাউন পরে নিবিষ্টচিত্তে একটা বিলিতি সিনেমা-মাসিক পত্রের পাতা ওলটাচ্ছে। সামনের টেবিলে একটা 'অ্যাশ ট্রে'তে সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে কয়েকটা। তাকে নার্সের বেশে দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম, এই বেশে দেখে বিস্ময় সীমা অতিক্রম করল। খানিকক্ষণ আমি কথাই বলতে পারলাম না। আমাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে, আমার চোখের দিকে চেয়ে হেসে ফেললে।"

"খুব অবাক লাগছে, না ? সত্যি আমি অনেক বদলে গেছি শিখরদা।"

"সত্যি বদলেছ। তুমি নিজের পরিচয় না দিলে তোমাকে চিনতেই পারতাম না বোধহয়, এত বদলেছ"

"আমার মুখটাও খুব বদলেছে কি। দেখ তো ভাল করে'। আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না। দেখ তো—"

মুখটা উঁচু করে' স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল সে। দেখলাম মুখটা সত্যি বেশী বদলায় নি। অনেক দিন পরে চিবুকের পাশের ছোট কালো তিলটি চোখে পড়ল আবার। আর একটা কথাও মনে হল, মুখের গড়নটা বদলায় নি বটে কিন্তু রূপটা বদলেছে। তরলমতি কিশোরী সে আর নেই, পরিণতি লাভ করেছে আত্মসচেতন যুবতীতে।

"না, মুখটা বেশী বদলায় নি। মুখের দিকে ভাল করে' চেয়ে দেখলে চিনতে পারতাম"

"বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন"

চেয়ারটা টেনে বসলাম। অ্যাশ ট্রেটা দেখিয়ে বললাম, "সিগারেট খায় কে। তোমার বন্ধুরা বুঝি"

"আমিই খাই। বন্ধুদের মধ্যেও খায় দু' একজন। খাবে তুমি ?"

দামী কারুকরা একটা রূপোর সিগারেট কেস সে এগিয়ে ধরল আমার দিকে। স্প্রিংটা টিপতেই ডালাটা লাফিয়ে উঠল। মনে হল একটা সাপ ফণা তুলল যেন।

"তুমি সিগারেট খাও ?" মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল আমার।

"আমি এখন অনেক কিছুই করি। ওই দেখ"

ঘরের যে অংশটি তার প্রসাধনের জন্য ব্যবহৃত হত সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে সে। প্রকাণ্ড একটা দামী আয়নার আশে-পাশে ছোট বড় কয়েকটা শেলফে নানা আকৃতির সুদৃশ্য শিশি আর কৌটো সাজানো রয়েছে দেখলাম।

"কি ওগুলো"

"স্নো, পাউডার, লোশন, লিপ্‌স্টিক, কাজল, ডেপিলেটরি, এসেন্স, আতর—কত কি। যে অবু আমগাছে উঠত, পুকুরে ঝাঁপাই ঝুড়ত, তোমার পড়ার ঘরে জানালার ধারে উঁকি দিত সে মরেছে। তার দেহটার ভিতর বাস করছে এখন অন্য লোক, একে চিনতে তোমার দেরী হবে। হয়ত পারবেই না"

"ভিতরের আসল মানুষটা বদলায় না অত সহজে"

"বিদ্বান লোকেরা তাই বলেন শুনেছি। কিন্তু বাইরের পোষাক পরিচ্ছদে মানুষ এমনভাবে আত্মগোপন করে যে তাকে আর খুঁজেও পাওয়া যায় না"

অবন্ধনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। একজন পাকা দার্শনিকও বোধহয় এমন করে' গুছিয়ে মানুষের আপাত-পরিবর্ত্তনের রহস্য বর্ণনা করতে পারত না। একথা অবশ্য বললাম না তাকে।

বললাম—"তোমাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করতে পারব। সে ভরসা আমার আছে—"

"আমার নেই"

অবন্ধনার চোখে মুখে হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল,, কিন্তু গম্ভীর হয়েই রইল সে। গম্ভীরভাবে সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বার করে' নিপুণভাবে ধরালে সেটা।

"নেই? কেন!"

"পিসেমশায়ের হাতে নির্য্যাতিত হয়ে যখন তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম, যখন আমার বাইরের সব আবরণ ছিঁড়ে গিয়েছিল তখন তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে পারনি। তার মানে আমার আসল মানুষটাকে তুমি চিনতে পারনি, পারলে নিশ্চয়ই দিতে"

অবন্ধনার কথার বাঁধুনি দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

"চিনতে পেরেছিলাম। কিন্তু তোমাকে আশ্রয় দেওয়ার বাধা ছিল অনেক। তাই একটু ভেবে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার তর সইল না। নবীন ঢুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেলে। আচ্ছা, নবীন ঢুলের সঙ্গে গেলে কেন"

"কারণ ওই ঠিক আমাকে চিনেছিল"

নির্নিমেষে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললে—"নবীন ঢুলের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে খুব কুৎসা রটিয়েছ বোধহয় তোমরা"

"কুৎসা তো রটবেই"

"তোমার কি মনে হয়েছিল?"

চুপ করে' রইলাম। বড় কঠিন প্রশ্ন। অবঞ্চনার চোখের পাতা পড়ছিল না, মনে হচ্ছিল ওর সমস্ত সত্তা যেন উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে আমার উত্তরটা শোনবার জন্য।

"আমার? নবীন ঢুলের সঙ্গে তুমি পালিয়ে গেছ এটা আমি বিশ্বাস করতে পারি নি প্রথমে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে হল"

"বিশ্বাস করলে আমি নবীন ঢুলের প্রণয়িনী হয়েছি?"

চুপ করে' রইলাম। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল অবঞ্চনা।

"আশ্চর্য্য তোমাদের বুদ্ধি। আমি বিপদে পড়ে' যদি একা একটা নৌকো করে' নদী পার হয়ে যেতাম, তাহলেও তোমরা বোধহয় ভাবতে যে নৌকোটার সঙ্গেই আমার নিশ্চয় কিছু ঘটেছে গোপনে গোপনে!"

আমি চুপ করেই রইলাম। অবঞ্চনার হাসিটাও থেমে গেল হঠাৎ। তার সমস্ত মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সহসা অন্য কথা পাড়লে সে।

"একটু চা খাবে ?"

"দোকানের চা ?"

"না, আমি নিজে করে' দেব। সব ব্যবস্থা আছে আমার।"

ঘরের আর এক কোণে দেখলাম ছোট একটি টেবিলে সত্যিই সব ব্যবস্থা রয়েছে, এমন কি ছোট একটি ইলেকট্রিক স্টোভ পর্যন্ত।

অবন্ধনা চা করতে লাগল। আমি খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার দিকে। তারপর উঠে তার বিছানার ধারে যে বইয়ের শেলফটা ছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম ইংরেজি বইই বেশী।

"ইরেজি পড়তে শিখেছ নাকি"

"আমি প্রাইভেটে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি"

"ও। এত সব করলে কোথায়"

"বম্বেতে। সেখানে গিয়েই প্রথমে বুঝলাম যে স্বাধীনভাবে নিজের ভরণপোষণ করবার যোগ্যতা না হলে আত্মসম্মান থাকে না, এমন কি বিয়ে করেও না। সেদিন ভাগ্যিস তুমি আমাকে আশ্রয় দাও নি শিখরদা। দিলে পরের মুখ-ঝামটা খেতে খেতেই সারা জীবনটা কাটত—"

আমি শেলফের ধারে দাঁড়িয়ে বইগুলো নাবিয়ে নাবিয়ে দেখছিলাম--কি ধরণের বই অবন্ধনা পড়ে। দেখলাম শস্তা প্রেমের উপন্যাস আর ডিটেকটিভের গল্পই বেশী রয়েছে। নার্সিংয়ের বইও আছে দু' একখানা। বইগুলোর পিছন থেকে ছোট একটা শিশি বেরিয়ে পড়ল হঠাৎ। লেবেলে লেখা রয়েছে দেখলাম—পোটেশিয়াম সায়ানাইড। ভীষণ বিষ! এ জিনিস এখানে কেন!

"পোটেশিয়াম সায়ানাইড রেখেছ কেন—"

"ওটা বার করলে কোথা থেকে"

"এই বইগুলোর পিছনে ছিল"

"একজন রোগীর জন্য দরকার ওটা। বাজারে পায় নি সে, তাই আনিয়ে রেখেছি আমি"

"রোগীর জন্যে? এ তো ভয়ানক বিষ। কোন অসুখে লাগে সায়ানাইড"

"ডাক্তার হলে বুঝতে। ডক্টর সেন প্রেসক্রাইব করেছেন একটা ক্যানসার রোগীর জন্যে। দাও—"

আমার হাত থেকে কেড়ে নিলে শিশিটা। রোগীর কথাটা যে মিথ্যে তা তার চোখ মুখ থেকেই বুঝতে পারছিলাম। দেখলাম শিশিটা নিয়ে আবার বইগুলোর পিছনেই রেখে দিলে সেটা। সায়ানাইড রেখেছে কেন? প্রশ্নটা কাঁটার মত বিঁধে রইল মনে। কিন্তু তখন তা নিয়ে আর আলোচনা করা হল না, আলোচনা করবার অবসরই দিলে না অবন্ধনা।

"চা'টা খেয়ে দেখ দিকি কেমন হল। আমি কড়া চা পছন্দ করি। তুমি?"

"আমিও"

"তাহলে ভালই লাগবে বোধ হয়। চিনি-দুধ ঠিক হয়েছে কি না দেখ"

এক চুমুক খেয়ে বললাম—"চমৎকার হয়েছে—"

সত্যিই চমৎকার হয়েছিল। অবন্ধনা নিজের জন্যও বানিয়েছিল এক পেয়ালা। একটা ছোট টুলে বসে' আমার দিকে চেয়ে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে লাগল সে। চোখ দুটি থেকে অদ্ভুত একটা হাসি উপ্‌চে পড়তে লাগল।

"শিখরদা, কোথায় কি চাকরি কর তুমি"

"আমি দালালি করি। ঠিক চাকরি নয়, সেদিন মিছে কথা বলেছিলাম"

"কিসের দালালি ?"

"নানারকম জিনিসের। বাড়ি গাড়ি থেকে আরম্ভ করে দেশলাই ছুঁচ পর্য্যন্ত"

মিথ্যা কথাটা অবলীলাক্রমে বলে গেলাম। আমি যে পুলিশের গুপ্তচর এ কথাটা অবঙ্কনার কাছে বলতে পারলাম না। মনে হল কথাটা শুনলে আমার প্রতি ওর বিতৃষ্ণা আসবে একটা। 'স্পাই'কে সবাই ঘৃণা করে এটা কুসংস্কার হতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্যি।

"দালালিতে রোজকার হয় বেশ ?"

"চলে' যাচ্ছে"

"বিয়ে করেছ ?"

"না"

"করবে না ?"

"একদিন ঠিক করেছিলাম করব না। কিন্তু এখন ভাবছি করলেও হয়"

অবঙ্কনার চোখ থেকে যে হাসির আলোটা উপ্‌চে পড়ছিল সেটা নিবে গেল হঠাৎ।

"কনে' ঠিক হয়ে আছে না কি"

"অনেক আগে থেকেই"

"কেমন মেয়েটি, কোথায় বাড়ি ?"

"দেখতে ইচ্ছে করছে না কি"

"করবে না ?"

"আয়নার সামনে দাঁড়াও গিয়ে তাহলে"

অবঙ্কনার চোখের আলো নিবে গিয়েছিল, মুখটাও ফ্যাকাশে হয়ে গেল আবার। কিন্তু জোর করে' হেসে সে বললে—

"তা আর হয় না শিখরদা"

"কি হয় না"

"আমি আর তোমাকে বিয়ে করতে পারি না"

"কেন"

"লগ্ন বয়ে গেছে"

"পাঁজিতে বিয়ের লগ্ন কি একটাই থাকে ?"

"পাঁজিতে যত লগ্নই থাক, আমার বিয়ের লগ্ন একবারই এসেছিল —আর আসবে না"

"কবে এসেছিল—"

"মনে নেই ? বহুদিন আগে রাত দুপুরে ? তুমি তো তখন আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলে"

"আমার সে অপরাধের কি ক্ষমা নেই ? তখন আমার মা বেঁচে ছিলেন, তাছাড়া ছিলেন তোমার পিসেমশাই। এসব কারণেই আমি চট্ করে' মত দিতে পারি নি তখন—"

"আমি তা জানি। আমি রাগও করছি না, কিন্তু লগ্ন ব'য়ে গেছে। তখন যা হতে পারত এখন তা আর হয় না।"

"হয় না কেন। তুমি আমি দুজনেই এখন স্বাধীন, আমাদের বাধা দেবার আর কেউ নেই তো"

"আছে বই কি"

"কে"

"আমার বিবেক"

কথাটা শুনে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম ক্ষণকালের জন্য। নবীন দুলের ঘটনাটা পরমুহূর্ত্তে মনে পড়ল।

বললাম—"নবীন দুলের সঙ্গে তোমার কি ঘটেছিল জানি না, কিন্তু এটা বিশ্বাস কর তার জন্যে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই—"

"তোমাকেও একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি। করবে কি—"

সিংহিনীর মতো গ্রীবাভঙ্গী করে' সে চেয়ে রইল আমার দিকে।

"কি বল"

"আজ পর্য্যন্ত যত পুরুষের সংস্রবে এসেছি আমি তার মধ্যে সবচেয়ে নির্ম্মল নিষ্পাপ চরিত্র মাত্র একটি লোককেই দেখেছি সে হচ্ছে ওই নবীন দুলে। সে ইচ্ছে করলে আমাকে নষ্ট করতে পারত কিন্তু করে নি। তোমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত মন হয়তো কথাটা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু কথাটা সত্যি।"

"বিশ্বাস করলাম। নবীন দুলে কোথা এখন"

"জাহাজের খালাসী হয়ে সে চলে' গেছে"

"কবে"

"আমরা যখন বম্বে পৌঁছলাম তার মাসখানেক পরে"

"তোমাকে একা ফেলে রেখে চলে' গেল"

"আমারও একটা চাকরি জুটিয়ে দিয়ে গেল"

"কোথায়"

"এক ডাক্তারবাবুর বাড়িতে"

"কি করতে সেখানে"

"দাসীবৃত্তি"

"তারপর ?"

"তারপর ডাক্তারবাবুর সুনজরে পড়লাম। তিনি আবিষ্কার করলেন একদিন যে 'নহি আমি সামান্যা রমণী'। তাঁরই অনুগ্রহে লেখাপড়া শিখলাম, নার্সগিরি শিখলাম"

অবঞ্চনার চোখে মুখে অদৃশ্য একটা আগুনের শিখা লেলিহান হয়ে উঠল যেন।

"লেখাপড়া তিনিই শেখালেন ?"

একজন প্রাইভেট টিউটার নিযুক্ত করে দিলেন। অনেক কিছু করেছিলেন ভদ্রলোক আমার জন্যে। আমাকে বিয়ে পর্য্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি রাজি হ'তে পারলুম না"

"ভদ্রলোক অবিবাহিত ছিলেন না কি"

"স্ত্রী তাঁর আত্মহত্যা করেছিলেন"

"কেন"

"আমারই জন্য"

মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। মনে হল যেন নিজের একটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে আমার প্রশংসা শোনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে।

"তবু বিয়ে করলে না ভদ্রলোককে !"

"সেই জন্যেই করলাম না। আমাকে যত বোকা তোমরা ভেবেছ তত বোকা আমি নই। ততটা হৃদয়হীনও নই"

"আমি তোমাকে কোনদিনই বোকা ভাবি নি। তবে তুমি হৃদয়হীন কি না তা জানতে বাকী আছে এখনও আমার। তার পর কি হ'ল। তোমার জীবন-কাহিনী বেশ লাগছে—"

"বেশ লাগছে ? খেলো উপন্যাসের মতো ?"

"ভাল উপন্যাসের মতো"

"আশ্চর্য্য তো"

"আশ্চর্য্য হবার কি আছে"

"উপন্যাসে যা তোমাদের ভাল লাগে, বাস্তব জীবনে তা কি তোমরা সইতে পার ? কুন্দনন্দিনী, কিরণময়ীদের তোমরা তো দূর করে' দিয়েছ। তারা হয় মরেছে না হয় আশ্রয় নিয়েছে বেশ্যা পল্লীতে গিয়ে। আজকাল অবশ্য সিনেমা-আকাশে তারকা হয়ে

জলছে অনেকে। আমিও হয়তো জলতাম, ঠিক দামটা দিতে পারলাম না”

“কিসের দাম”

“তারকা হতে হলে যে দাম দিতে হয়”

আবার চুপ করে' গেল সে। মুচকি হেসে নির্নিমেষে চেয়ে রইল আমার দিকে। আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। সে-ই কথা কইলে আবার।

“আচ্ছা, শিখরদা তুমি বরাবর সৎপথে চলে' ঠিক আগেকার মতো ভালো ছেলে আছ?”

উত্তরে আমিও মুচকি হেসে চাইলাম তার দিকে। তারপর বললাম—“নিজের প্রশংসা নিজের মুখে করতে নেই। আমার জীবনে একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে আমি প্রতীক্ষা করছি”

“কার—”

“তোমার”

অবঞ্চনা একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে—“এই সিগারেটখোর মেয়েটার? মিছে কথা বলো না শিখরদা। তোমাকে সত্যবাদী বলে' শ্রদ্ধা করে' এসেছি বরাবর”

“সিগারেট খেয়ে বা রং মেখে আমার চোখ এড়িয়ে যাবে এটা যদি তুমি ভেবে থাক, তাহলে আমাকে চেন নি তুমি”

হঠাৎ অবঞ্চনা খিল খিল করে হেসে লুটিয়ে পড়ল। সিগারেটটা পড়ে গেল তার ঠোঁট থেকে।

“চিনি নি? পুরুষদের চিনতে বাকী থাকে নাকি কোন মেয়ের?”

সিগারেটটা তুলে আবার টানতে লাগল।

অনেক রাত পর্য্যন্ত অবঞ্চনার সঙ্গে গল্প করলাম। কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া দিল না সে। 'প্রহেলিকা' কথাটা দিয়েও ঠিক বর্ণনা করা

যায় না তাকে। তাকে যে আমি বুঝতে পারছিলাম না একথা ঠিক নয়। সে যে ভাবে নিজেকে বোঝাতে চাইছিল আমি সে ভাবে বুঝতে চাইছিলাম না। সেদিন তার কাছ থেকে এসে অনেক রাত অবধি ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করতে হ'ল অস্বস্তিপূর্ণ মন নিয়ে। কোনও অতি-পরিচিত লোকের নাম মনে না পড়লে যে ধরণের অস্বস্তি হয় এ অনেকটা সেই ধরণের অস্বস্তি। অবন্ধনাকে আমি চিনেও চিনতে পারছিলাম না! বুঝতে পারছিলাম সে বদলেছে, নীতিবিদরা যা অধঃপতন বলে' অভিহিত করেন তা-ও হয়তো তার ঘটেছে, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম না তবু তার সম্বন্ধে আমি মোহ-মুক্ত হতে পারছি না কেন। তাকে কলঙ্কিত বলে' সন্দেহ হচ্ছে, তার আচারে ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় যা বিকীর্ণ হচ্ছে তা মোটেই ভদ্র নয় কিন্তু তবু বিশ্বাস করতে পারছি না কেন যে সে সত্যিই মন্দ। মনে হচ্ছে তাকে বিয়ে করতে পারলে শুধু যে, সুখী হব তা নয় কৃতার্থ হয়ে যাব। এই অনুভূতি আমার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার বিবাহের প্রস্তাব অবন্ধনা বারম্বার হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, রূঢ় ভাষায় অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু আমার অন্তরের অন্তস্তলে আমি উপলব্ধি করছি অবন্ধনা আমাকে চায়। তার এই প্রত্যাখ্যান মৌখিক, নিগূঢ় অভিমানের বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র। অনুভব করছি সে আমাকে চায় বলেই না-চাওয়ার ভাণ করছে। ওটা ভাণ মাত্র। কিন্তু এ ভাণ কেন? নারীর ছলনা? কিন্তু যে সত্য নির্ণয় করবার জন্যে নারীরা সাধারণত ছলনার আশ্রয় নেয় সে সত্য কি এখনও অজ্ঞাত আছে অবন্ধনার? সে কি জানে না যে আমি তাকেই সারাজীবন চেয়েছি, তাকেই সারাজীবন চাইব? না, কোথায় যেন কি একটা রহস্য আছে। অবন্ধনাকে চিনতে পারছি না…"

শিখর সেনের ডায়েরির খানিকটা অংশ লিখিয়া কবি লেখনী-সম্বরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন এবার কি লিখিবেন।

ছোট ছোট পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে উড়িয়া গেল। কিছুদূর উড়িয়া গিয়া তাহারা যুবক যুবতীতে রূপান্তরিত হইল; একেবারে আধুনিক যুগের যুবতী। যুবতীর দিকে চাহিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া বলিল—"তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে ঝ্ণী! আমাকে?"

"বেশ, চমৎকার"

"চল একটা নদীর ধারে গিয়ে বসা যাক। একটা সমস্যা উদয় হয়েছে মনে—"

"চলুন। নদী এখান থেকে কতদূরে?"

"ঠিক জানিনা। খুঁজে দেখি চল। আছেই নিশ্চয় কাছে পিঠে কোনও নদী…"

উভয়ে পাশাপাশি হাঁটিতে লাগিল। তাহাদের ঘিরিয়া নৈশ অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইল। ঘন কৃষ্ণ গগনমণ্ডলে নক্ষত্রকুলের উজ্জ্বলতা বাড়িয়া গেল, সঞ্চরমাণ শ্বাপদকুল গতিবেগ রুদ্ধ করিয়া সবিস্ময়ে এই যুগলযাত্রীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, ঝিল্লীকণ্ঠে নূতন রাগিণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, পেচকদম্পতী বিশ্রম্ভালাপ স্থগিত রাখিয়া বিস্ফারিত-নয়নে এই সহসা আবির্ভূত অপরূপ মানবদম্পতীকে কি ভাষায় অভিনন্দিত করিবে ভাবিতে লাগিল।

অনেকদূর হাঁটিয়াও কিন্তু নদীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

"কই নদী তেদেখতে পাচ্ছি না কোথাও"

"সামনে ওটা কি—"

"প্রকাণ্ড মাঠ একটা"

মাঠ? ঠিক দেখতে পাচ্ছ তুমি? বড্ড অন্ধকার, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না”

যুবক উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে চাহিল। মধ্যগগনে বীণা-মণ্ডলে অভিজিৎ নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। পিতামহের দৃষ্টিপাতে তাহা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার পর এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। অনন্ত শিখার ন্যায় প্রদীপ্ত এক আলোক-রেখা অভিজিৎ নক্ষত্র হইতে নির্গত হইয়া মর্ত্ত্যের দিকে অবতরণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা সেই দিগন্ত বিস্তৃত অন্ধকার প্রান্তরে নামিয়া আসিয়া প্রান্তরকে আলোকিত করিয়া তুলিল। সেই অম্বরাগত দিব্য নক্ষত্র-আলোকে দেখা গেল প্রান্তরের অপর-প্রান্তে এক খরস্রোতা কল্লোলিনী প্রবাহিত হইতেছে।

“ওই তো নদী! চল ওরই পাড়ে গিয়ে বসা যাক”

বাণী হাসিয়া বলিল—“এত কাছে যে নদী ছিল তা' তো বুঝতে পারি নি—”

“মনুষ্যের রূপ ধারণ করেছি কি না, বুদ্ধিটা তাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে আলো না এলে অধিকাংশ ব্যাপারই বোঝা যাবে না এখন”

“ওই নদীটা এখানে ছিল অথচ আমরা বুঝতে পারি নি?”

“ছিল কি ছিল না এ সবই আপেক্ষিক কাণ্ড। ওর মধ্যে ঢুকো না। যখন নদী পাওয়া গেছে, চল ওর পাড়ে গিয়ে বসা যাক, আর যে কথাটা মনে হয়েছে তাই নিয়ে একটু সময় কাটানো যাক। আমরা অমর, আমাদের কাছে সময় কাটানোটাই একটা বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে কি না—”

পিতামহ ও বাণী নদীতীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল নদীতীরে একটি সুদৃশ্য মর্ম্মর-বেদীও রহিয়াছে। বেদীর উপর উভয়ে

উপবেশন করিলেন। আকাশে চন্দ্রোদয় হইল। নদীর তরঙ্গমালায় জ্যোৎস্না প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

বাণী প্রশ্ন করিলেন—"কি আলোচনা করবার জন্যে এত কাণ্ড করলেন"

"যে কাণ্ডটা করলাম সেটা তোমার ভাল লাগল কিনা"

"লাগল বই কি"

"এটা কিন্তু সেকেলে রূপকথার কাণ্ড। এর তুলনায় ভবিষ্যযুগের কবি যা লিখে যাচ্ছে সেটা খুব খেলো হচ্ছে না?"

"আপনিই তো তাকে লেখাচ্ছেন—"

"তা লেখাচ্ছি কিন্তু লিখিয়ে খুব আনন্দ পাচ্ছি না। সত্যি সত্যি যা ঘটে সেইটেই ইনিয়ে বিনিয়ে লেখার মধ্যে আর বাহাদুরিটা কি? দুটো ছোঁড়া প্রেমে পড়ে ছটফট করে মরছে আর কাতরাচ্ছে এই ঘটনাটা হুবহু নকল করে' দেওয়াটা কি সৃষ্টির পর্য্যায়ে যাবে? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আমি যখন কেঁচো কৃমি প্রভৃতি সৃষ্টি করেছিলাম তখনও তাতে অনন্যতা ছিল, ঢের বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম তাতে। আমার কালকূটের কল্পনাটাও নিতান্ত খারাপ হয়নি। নিজের স্ত্রীর জিবের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে লোকটা প্রণয়িনীর সন্ধানে—অ্যাঁ কি বল!"

বাণী মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"এরাও অনন্য। এঁদের জোড়াও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্ত্রীর গয়না-বেচা টাকায় দূরবীণ কিনে আলেয়াকে দেখছে যে কমল-কিশোর সে-ও কম নয়"

পিতামহ সহসা খুশী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি ঝলমল করিতে লাগিল।

"তোমার ভাল লেগেছে কমল-কিশোরকে?"

লেগেছে। শিখর সেনকেও লেগেছে। তবে ওকে পুলিসের

গুপ্তচর করেছেন কেন বুঝতে পারছি না। ভবিষ্যযুগের চার্ব্বাক আঁকবার কথা ছিল—"

"আমার মনে হল সন্দিগ্ধচিত্ত চার্ব্বাকরাই ভবিষ্যৎ যুগে পুলিসের গুপ্তচর হবে"

"ও তাই বুঝি—"

"দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি সেটা। কিন্তু সে যাই হউক, গল্পটা তোমার ভাল লাগছে কি না বল। আমার নিজের কেমন পানসে পানসে ঠেকছে। এটার চেয়ে চার্ব্বাকের গল্পটা যেন বেশী জমাট হয়েছে"

"কেন ওতে বনজঙ্গল, সিংহ এই সব আছে বলে'? কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই আপনি শিখর সেনের চারদিকেও বনজঙ্গল সিংহ আমদানী করেছেন। জঙ্গলটা অবশ্য সমাজের আর সিংহটাও মনুষ্যরূপী সিংহ—"

"বাঃ ঠিক ধরে' ফেলেছ তো—"

সহসা যুবক-রূপী পিতামহ যুবতী বাণীকে স্কন্ধে তুলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। নদীর তরঙ্গকুলও নাচিতে লাগিল। বাণী লক্ষ্য করিলেন অসংখ্য ময়ূর-ময়ূরী আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে। তাহাদের নয়নে মাণিক্য-দ্যুতি, গ্রীবাদেশে নীলার সৌন্দর্য্য, পক্ষদ্বয়ে মুক্তা-মালা এবং প্রসারিত পুচ্ছমণ্ডলে অসংখ্য পান্না প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এরূপ অদ্ভুত পক্ষী বাণী আর কখনও দেখেন নাই।

"ময়ূর তো রাত্রে নাচে না! এমন ময়ূরও তো দেখিনি কখনও"

একটি ময়ূরই উত্তর দিল—"আমরা রাতের ময়ূর, রাতেই নাচি"

"কোথায় থাক তোমরা"

"কোথায় থাকি জানি না ঠিক। হয়তো তোমার মনেই আছি"

"কবিতায় কথা কও না কি তোমরা"

ময়ূরের দল ইহার কোন উত্তর দিল না, মুচকি হাসিয়া নাচিতে লাগিল। বাণীও নৃত্যপরা হইলেন। চরাচর নৃত্যময় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে পিতামহ বলিলেন—"চল এবার কবির কাছে যাওয়া যাক। বেশ খানিকক্ষণ সময় কেটেছে"

আবার দুইটি পতঙ্গ কবির বাতায়ন পথে প্রবেশ করিয়া প্রদীপ্ত ইলেকট্রিক বাতির সুদক্ষ ডোমের উপর উপবেশন করিল। কবি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। ক্ষুদ্র পতঙ্গ দুইটির আগমন বা নির্গমন তিনি লক্ষ্য করেন নাই। পতঙ্গ দুইটি আসিয়া বসিবার পর পুনরায় তাঁহার মনে প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, পুনরায় তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

"শিখর সেনের সঙ্গে অবন্ধনার এরকম লুকোচুরি কতদিন চলেছিল তা বলা শক্ত। কারণ শিখর সেনের ডায়েরিতে অবন্ধনার কথা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ নেই। আছে সেই কালোবাজারীটার কথা যার খোঁজে এই বোর্ডিংএ এসে সে বাসা বেঁধেছিল। একদিনের ডায়েরিতে দেখছি এই বিশেষ বোর্ডিংটাতে কালোবাজারীটার আকর্ষণ কোথায় তা সে আবিষ্কার করেছে এবং আবিষ্কার করে' স্তম্ভিত হয়ে গেছে।"

শিখর লিখছে—"এমন একটা ঘটনা ঘটেছে আজ আমার জীবনে যা হয়তো আমার জীবনের গতিকেই পরিবর্ত্তিত করে' দেবে। অপ্রত্যাশিত ঘটনা জীবনে বহুবার ঘটেছে, কিন্তু আমার অন্তরতম সত্তা আর কখনও এমনভাবে বিচলিত হয় নি। যে লোকটার জন্যে এই বোর্ডিংএ এসে বাসা বেঁধেছি সে লোকটাকে এই বোর্ডিংএ

ঢুকতে এবং বেরুতে অনেকবার দেখেছি। কিন্তু কেন সে আসে এখানে তা নির্ণয় করতে পারি নি। এ বিষয়ে কাউকেও প্রশ্ন করতে ভরসা পাই নি, পাছে কেউ আমাকে পুলিশের লোক বলে' সন্দেহ করে। দোতালার একটা ঘরে গ...বাবু নামে একজন দালাল আছেন আমার সন্দেহ ছিল তার সঙ্গেই ...কোনরকম যোগাযোগ আছে লোকটার। কিন্তু স্বচক্ষে কোনও দিন তার ঘর থেকে তাকে বেরুতে দেখি নি, তার ঘরে ঢুকতেও দেখি নি। এইটে স্বচক্ষে দেখবার জন্যে অনেক সময় আমি সমস্ত দিন কোথাও যাই নি, কিন্তু সেদিন সে আসেই নি বোর্ডিএ। এইভাবেই চলছিল। আশা ছিল একদিন না একদিন তাকে হাতে-নাতে ধরবই। আজ সন্ধ্যের একটু আগেই সিঁড়ি দিয়ে নাবছি এমন সময় মুখোমুখি হয়ে গেল সেই লোকটারই সঙ্গে। সে প্রকাণ্ড একটা ফুলের তোড়া নিয়ে উপরে উঠছিল। আমি তাকে দেখিয়ে গট গট করে নেবে গেলাম বটে কিন্তু সে উঠে যেতেই তৎক্ষণাৎ ফিরলাম। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করলাম কোন ঘরে সে ঢুকছে। যা দেখলাম তাতে আমার হৃৎস্পন্দন থেমে গেল যেন। দেখলাম লোকটা অবন্ধনার ঘরে ঢুকল। ফুলের তোড়া নিয়ে অবন্ধনার ঘরে ঢোকার মানে? কি করব ভাবছি এমন সময় অবন্ধনা সেজেগুজে বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল।

"কোথা যাচ্ছ এমন অসময়ে"—জিজ্ঞাসা করতে হল।

"কলে' বেরুচ্ছি। আমাদের আবার সময়-অসময় আছে না কি—"

মুচকি হেসে সপ্রতিভ ভাবে নেমে গেল।

বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম দামী একটা মোটরকারও দাঁড়িয়ে আছে নীচে। অবন্ধনাকে নিয়ে লোকটা মোটরে চড়ল।

আমিও দ্রুতবেগে নেমে এলাম নীচে, সঙ্গে সঙ্গে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। ট্যাক্সিটাকে বললাম ওই মোটরটাকে অনুসরণ করতে।

...অবন্তনা সম্বন্ধে যে সত্য আবিষ্কার করেছি তা ভয়ঙ্কর। এত ভয়ঙ্কর যে তা লিখতেও ভয় করছে। অবন্তনা না হয়ে যদি অন্য কেউ হ'ত তাহলে আজই তাকে এ্যারেস্ট করতাম। যে সব পদস্থ গভর্ণমেণ্ট অফিসার অর্থের বশীভূত নয় কামের বশীভূত, ওই কালোবাজারীটা অবন্তনাকে কাজে লাগাচ্ছে তাদের ভোলাবার জন্যে। আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়েছে, অথচ আমি বেঁচে আছি—"

এইভাবে আরও কয়েক পাতা লিখেছে শিখর। অবান্তর বোধে সবটা আর উদ্ধৃত করলাম না। ঠিক এর পরের তারিখে কিন্তু আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেছে শিখর যা এ কাহিনীর পক্ষে মোটেই অবান্তর নয়। উদ্ধৃত করছি সেটা।

শিখর লিখছে—'ছেলেবেলায় আমি ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে বিছানা ছেড়ে উঠে যেতাম। উঠে বেড়িয়ে বেড়াতাম বাড়ির সামনের বাগানটায়। রাত্রে কুঁড়ি কি করে' ফুল হয় তা জানবার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল আমার। আশ্চর্য্য লাগত সন্ধ্যাবেলার ছোট্ট কুঁড়ি কয়েক ঘণ্টায় কি করে' পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে যায়! ঘুমের ঘোরে উঠে দেখতে যেতাম তাই। আমার মা অনেকদিন আমাকে ধরে এনে শুইয়ে দিয়েছেন বিছানায় অনেক সময় খাটের সঙ্গে হাত-পাও বেঁধে দিতেন। ডাক্তাররা বলেন ওটা নাকি একপ্রকার অসুখ। অনেক দিন এরকম আর হয় নি। বোর্ডিংয়ের চাকরটা কিন্তু কাল রাত্রে সিঁড়ি থেকে আমাকে ধরে' এনে ঘরে শুইয়ে দিয়ে গেল, আমি নাকি ঘুমের ঘোরে সিঁড়ি দিয়ে নেবে যাচ্ছিলাম। অন্তর-নিহিত প্রবল কৌতূহল ছেলেবেলায় আমাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেত। কাল কোন কৌতূহলের টানে উঠেছিলাম?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে কোথায় যাচ্ছিলাম? অবঞ্চনায় ঘরের দিকে না কি—!"

ডায়েরির এই অংশটা পড়ে মনে হচ্ছে আহা শিখরের মতো আমারও যদি ওই অসুখটা থাকত। স্বপ্নাচ্ছন্ন হ'য়ে সত্যিই যদি যেতে পারতাম আলেয়ার কাছে। আজ বিকেলে আলেয়া জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। কি ভাবছিল? মনে করতে ইচ্ছে করে যে আমার কথাই ভাবছিল, কিন্তু অন্তরের মধ্যে সত্যটা কি করে' জানি না প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ও আমার কথা ভাবছিল না…

প্রথম পতঙ্গ চুপি চুপি দ্বিতীয় পতঙ্গকে বলিল—"চল, চার্ব্বাক-সুরঙ্গমার খবরটা নেওয়া যাক এবার। এদের ঘ্যানোর ঘ্যানোর ভাল লাগ্‌ছে না আর—"

"চলুন—"

পুনরায় পতঙ্গ দুইটি বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

২১

অরণ্যের দুর্গম প্রদেশে চার্ব্বাক আশ্রয় লইয়াছিল। বিশাল বিশাল বনস্পতি-বেষ্টিত যে নির্জ্জন স্থানটি সে নির্ব্বাচন করিয়াছিল সেখানে প্রকাণ্ড একটি গুহা-মুখ ছিল। চার্ব্বাক স্থির করিয়াছিল—যদি কোনও সঙ্কট উপস্থিত হয় ওই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অথবা কোনও বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সে আত্মরক্ষা করিবে। সুরঙ্গমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সমস্ত রাত্রি সে একটি বৃক্ষের উপরই যাপন করিয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই নূতন আশ্রয়টি সে

আবিষ্কার করিয়াছে। কতদিন যে অরণ্যবাস করিতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, শূরঙ্গমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা নির্ণয় করিবারও উপায় নাই, সুতরাং গুহার ভিতরটা নিরাপদ কিনা তাহা দিবালোকেই স্থির করিয়া ফেলিবার জন্য সে চেষ্টিত হইল। কয়েকটি উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া গুহার ভিতর সেগুলি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে লাগিল কোন জন্তু বা সর্প বাহির হইয়া আসে কি না। সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি নিক্ষিপ্ত হইবার পরও যখন কোনও প্রাণীর সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না; চার্ব্বাক তখন চিন্তা করিতে লাগিল এইবার গুহার ভিতরে প্রবেশ করা সমীচীন হইবে কি না। ক্ষণকাল চিন্তার পর স্থির করিল, হইবে না। অগ্নি সংযোগ করিবার পরও যদি কোনও প্রাণী বাহির না হয় তাহা হইলেই ওই অন্ধকার অপরিচিত গুহায় প্রবেশ করা উচিত। কিন্তু অগ্নি কোথায় পাওয়া যাইবে? অরণ্যের মধ্যে শবর-পল্লী থাকা সম্ভব, সেখানে গেলে শুধু অগ্নি নয়, হয় তো আশ্রয়ও পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শবর-পল্লীতে যাওয়াও কি সমীচীন? কুমার সুন্দরানন্দের সহিত তাহাদের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়। তাহারা রাজভক্তির আতিশয্যবশত তাহাকে ধরাইয়াও দিতে পারে। সুতরাং শবর-পল্লীতে গমন করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। সহসা মনে হইল এই অরণ্যে সন্ধান করিলে অরণি নিশ্চয় পাওয়া যাইবে। কিছু ফলেরও সন্ধান করিতে হইবে, ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে চলিবে না। চার্ব্বাক উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে একটা নূতন প্রেরণা সঞ্চারিত হইল, সে ঠিক করিয়া ফেলিল এই গভীর অরণ্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে হইবে। আকাশ-চুম্বী বনস্পতি শ্রেণীর দিকে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সে হাসিয়া ফেলিল। মনে হইল গুরুগম্ভীর ধর্ম্মগ্রন্থগুলির আপাত-পবিত্রতার মধ্যে সে যেমন ভণ্ডামি ও

স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করিতে পারে নাই ; স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইলে এই গম্ভীরা বনভূমিও তেমনি শেষে হাস্যকর নগণ্য কিছুতে পরিণত হইয়া যাইবে না তো। কিন্তু পরমুহূর্তে তাহার মনে হইল, না হইবে না। প্রত্যক্ষ দর্শনই আমার দর্শন, যে দর্শন কখনই নগণ্য হইতে পারে না, তাহাই একমাত্র সত্য। চার্ব্বাক গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিল।

২২

যজ্ঞের জন্য আজ্য প্রস্তুত হইতেছিল। ত্রিবেদজ্ঞ মহর্ষি পর্ব্বত ব্রহ্মা-পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনিই স্বয়ং সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন কুমার সুন্দরানন্দ। মহর্ষি পর্ব্বত কুমারকে বলিলেন, "দেখুন, একটা বিষয়ে কিন্তু আমার কেমন যেন মন খুঁতখুঁত করছে। মনে হচ্ছে সুরঙ্গমাকে বলি দেওয়া চলবে না"

"কেন—"

"প্রথমত, কোন নারী-পশুকে বলি দেওয়ার বিধি কোথাও নেই। দ্বিতীয়ত, বলির পশুটি যতদূর সম্ভব হৃষ্টপুষ্ট হওয়া দরকার। নর্ত্তকী সুরঙ্গমা পেলব লতার মতো, তন্বী। ওর শরীরে কিছু নেই। তৃতীয়ত, বলির মাংস খেতে হয়। সুরঙ্গমার মাংস কি খেতে পারবেন ? সুতরাং যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য সুরঙ্গমাকে নির্ব্বাচন করাটা ঠিক হচ্ছে না। আর একটা দিকও ভেবে দেখবার আছে। সুরঙ্গমার মতো একজন রূপসী শিল্পীর এমনভাবে জীবনাবসান হবে, এটাও কি শোভন ? সুরঙ্গমার মতো নর্ত্তকী দুর্লভ। তাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে কেন চাইছেন !—"

"দুর্লভ বলেই চাইছি। আমি যতদূর বুঝেছি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তুকে ত্যাগ করলেই যজ্ঞের পূর্ণ ফল লাভ হয়। সুরঙ্গমাকে ভাল করে' পাব বলেই তাকে ত্যাগ করতে চাই। সে নিজেও তাতে রাজি আছে। সে যদি অসম্মত হত, তাহলে আমি এ যজ্ঞের আয়োজন করতাম না"

মহর্ষি পর্ব্বত ক্ষণকাল কুমার সুন্দরানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "ম্লেচ্ছ মিস্মির আপনাকে যা বুঝিয়েছে তাই আপনি বুঝেছেন। নর-বলির প্রথা এককালে এদেশেও প্রচলিত ছিল। শুনঃশেফের গল্প নিশ্চয়ই আপনার অবিদিত নেই। বলি-দেওয়ার কথা ছিল রোহিতকে, কিন্তু শুনঃশেফকে তার বদলে কিনে আনা হল। সেই শুনঃশেফকেও শেষকালে দেবতারা ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যে যা ইঙ্গিত আছে তাতো স্পষ্ট।"

কুমার সুন্দরানন্দ উত্তর দিলেন, "মহর্ষি আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনার অবাধ্য হওয়ারও কল্পনা আমি করতে পারি না। একটি বিষয়ে শুধু আমি আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। নর-বলির সঙ্কল্প নিয়েই আমি এই গভীর বনে যজ্ঞের আয়োজন করেছি। আমার এ সঙ্কল্প দেবতার অগোচর নেই। এখন যদি আমি প্রতিশ্রুত বলি অগ্নিমুখে সমর্পণ না করি, দেবতা কি অপ্রসন্ন হবেন না? আপনিই বিচার করে দেখুন। আপনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, সমস্ত দায়িত্ব আপনারই—আপনি আমাকে যা বলবেন, তাই করব"

মহর্ষি পর্ব্বত কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তাহলে নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করুন। সুরঙ্গমার বদলে আর কাউকে বলি দেওয়া হোক।"

"সুরঙ্গমা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিল। আর কেউ কি রাজি হবে?

"চেষ্টা করলে হয় তো হতে পারে। অর্থের বিনিময়ে নিষাদ-পল্লী বা শবর-পল্লী থেকে কোনও বালক পাওয়া অসম্ভব নয়—"

"কিন্তু সে বালক কি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতে রাজি হবে? কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক কিছু করবার প্রবৃত্তি নেই আমার মহর্ষি"

"সুরঙ্গমাও কি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে?"

"হয়েছে"

"আপনি তাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করুন কুমার। নারী-চরিত্র বড় বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়"

"বেশ, আমি আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করব"

২৩

অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কুমার সুন্দরানন্দ কিন্তু সুরঙ্গমার সাক্ষাৎ পাইলেন না। সুরঙ্গমার দাস-দাসীরা বলিল, "কাল রাত্রে তিনি আহারাদির পর বললেন, 'আমি কিছুক্ষণ একা একা বনে বনে ভ্রমণ করতে চাই, তোমরা সবাই শুয়ে পড়, আমার অপেক্ষায় থাকবার প্রয়োজন নেই।' এখনও পর্য্যন্ত তো তিনি ফেরেন নি"

কুমারের নয়ন যুগল হইতে ক্রোধ-বহ্নি বিচ্ছুরিত হইল, কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলিলেন না। দাস-দাসীদের ভর্ৎসনা করিবার উপায় ছিল না; তিনি নিজেই তাদের আদেশ দিয়াছিলেন সুরঙ্গমার কোন আচরণে যেন তাহারা বাধা না দেয়।

মিম্মিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। মিম্মির একটি অভিনব

ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। বিচিত্র-পক্ষ এক শুক-দম্পতীকে তিনি ফলাহার করাইতেছিলেন। সুন্দরানন্দ এরূপ অদ্ভুত শুক আর কখনও দেখেন নাই। তাদের পক্ষদ্বয়ে মরকত, বৈদূর্য্য, নীলা ও মুক্তার বর্ণ-দ্যুতি যে অপূর্ব্ব সমন্বয়ে রূপায়িত হইয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। তাহাদের চক্ষু দুইটি প্রদীপ্ত মাণিক্যের মতো জ্বলিতেছিল।

"এমন অদ্ভুত শুকপক্ষী আপুনি কোথা থেকে সংগ্রহ করলেন—"

"এরা নিজেই এসেছে। আজ সকালে উঠে দেখি আমার বাতায়নের ধারে পাশাপাশি ব'সে আছে দু'জনে। ধরতে গেলাম, ধরা দিলে না। কিন্তু পালিয়েও গেল না। সরে' সরে' বসছে। ফল দিয়ে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করছি, আমার জন্যে প্রচুর ফল আপনি কাল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, ওরা দু'জন প্রায় তা নিঃশেষ করেছে। বাকী আছে এই আঙুরগুলি—

মিম্মিরের কথা শেষ হইতে না হইতে একটি শুক ঘাড় নাড়িয়া সুমিষ্ট স্বরে কি যেন কহিল। পক্ষী-ভাষায় কি তাহার তাৎপর্য্য তাহা মিম্মির সম্যক বুঝিলেন না বটে, কিন্তু তাহার মর্ম্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি অবশিষ্ট আঙুরগুলি শুক-দম্পতীর দিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন। তাহারাও ভোজনে প্রবৃত্ত হইল।

মিম্মির কহিলেন, "সুরঙ্গমাকে ডেকে আনুন। এদের দেখলে তিনি খুশী হবেন।"

"তাকে খুঁজতেই তো এখানে এসেছি। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। সে কি এখানে এসেছিল?"

"আজ তো আসে নি। কাল রাত্রে এসেছিল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। এসেই চলে গেল"

"কোনদিকে গেল…"

"তা তো লক্ষ্য করি নি—"

"কোথায় গেল সে তাহলে। দেখি—"

শুকদম্পতীর দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুমার সুন্দরানন্দ বাহির হইয়া গেলেন। সুরঙ্গমার অন্তর্ধানে তিনি কেমন যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সহসা তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল, হয়তো প্রাণভয়ে সুরঙ্গমা পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করিয়াছে? মহর্ষি পর্ব্বতের কথাগুলি তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল—"নারী চরিত্র বড়ই বিচিত্র, বড়ই রহস্যপূর্ণ। তাদের মুখের কথা সব সময়ে তাদের মনের কথা নয়।…" কুমারের মুখ সহসা ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। যাহাকে তিনি বেশ্যাপল্লীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া রাজরাণীর মর্য্যাদা দান করিয়াছেন সে তাহাকে এভাবে প্রতারণা করিবে? মিম্মিরের নিকট হইতে বাহির হইয়া কুমার গেলেন কুলিশপাণির কাছে।

"কুলিশ সুরঙ্গমাকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাকে অনুসন্ধান করবার জন্য লোক নিযুক্ত কর। সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে' খোঁজ। তাকে না পাওয়া গেলে যজ্ঞই পণ্ড হয়ে যাবে—"

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া রাজাদেশ গ্রহণ করিলেন।

সুরঙ্গমা পলায়ন করে নাই। শাখা-পত্র-বহুল এক বিরাট মহীরুহে আরোহণ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সে আত্ম-বিশ্লেষণে নিরত ছিল। একটি কথাই বিশেষভাবে সে চিন্তা করিতেছিল। এই যজ্ঞে সে আত্মাহুতি দিতে সম্মত হইল কেন? মিম্মিরের কথায় সত্যই কি সে বিশ্বাস করিয়াছিল কুমার তাহাকে যজ্ঞে বলিদান দিয়া তাহারই ধ্যানে বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিবেন? তিনি সত্যই কি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাইবেন বলিয়াই এমনভাবে ত্যাগ

করিতেছেন ? মির্ম্মির তানেকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছেন কি না, পাইয়া নারী-লোভ-মুক্ত হইয়াছেন কিনা, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই সে মির্ম্মিরের সহিত রাত্রিবাস করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত অতিশয় ধূর্ত্ত, কৌশলে তাহাকে এড়াইয়া গেলেন। যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে মির্ম্মির তানেকে যজ্ঞে ত্যাগ করিয়াই সম্পূর্ণভাবে পাইয়াছেন কুমারও কি অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাহাকে পাইবেন ? কুমারের বলিষ্ঠ যৌবন, প্রবুদ্ধ কল্পনা, অগাধ ঐশ্বর্য্য, কি কেবল তাহার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবে ? সহসা তাহার নিরালার কথা মনে পড়িল। সুরঙ্গমা আসিবার পূর্ব্বে নিরালাই ছিল রাজনর্ত্তকী। সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছিল ! কুমার তখন সবে কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলেন, নিরালার অপরূপ নৃত্য-নৈপুণ্য অপূর্ব্ব কণ্ঠ-সঙ্গীত কুমারকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে কুমার তাহার নূতন নামকরণ করিয়াছিলেন, 'ছন্দ-কিন্নরী'। পুরাতন পরিচারিকা শারী তাহাকে বলিয়াছিল নিরালা তাহাকে ভালবাসিত বলিয়াই আত্মহত্যা করিয়াছিল। কুমার যেদিন বিবাহ করিতে চলিয়া গেলেন সেই দিনই সে মরিল। সুরঙ্গমার মনে হইল সে-ও যদি মরে কুমার কি তাহাকে মনে রাখিবেন ? ছন্দ-কিন্নরীকে কি তিনি মনে রাখিয়াছেন ! কই তাহার কথা একদিনও তো সে কুমারের মুখে শোনে নাই। কুমারের আচরণে তাঁহার পূর্ব্ব-প্রণয়ের কথা একবারও তো আভাসিত হয় নাই ; পুরুষ মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে সুরঙ্গমার কি আজও ভ্রান্তি আছে ? সে কি জানে না যে পুরুষ মাত্রেই শিশু প্রকৃতির নূতন ক্রীড়নক পাইলেই পুরাতনের কথা বিস্মৃত হয় ? তবে সে এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে কেন ! সত্যই কি যজ্ঞে তাহার আস্থা আছে ? সত্যই কি সে বিশ্বাস

করে সে যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার বিদেহী আত্মা অক্ষয় স্বর্গলাভ করিবে? যদি করেই, তাহাতেই বা কি! যে দেহটা লইয়া তাহার কারবার সেই দেহই যদি না থাকে স্বর্গের প্রয়োজন কি! চার্ব্বাকের কথা সহসা মনে হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মা-প্রসঙ্গে যখন আলোচনা হইয়াছিল তখন চার্ব্বাক যাহা বলিয়াছিল তাহাও মনে পড়িল। চার্ব্বাকের প্রফুল্ল প্রদীপ্ত নয়ন-যুগল তাহার স্মৃতিপটে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো ফাটিয়া উঠিল যেন। চার্ব্বাকের কথাগুলি আবার যেন সে শুনিতে পাইল—"তুমি যদি সাধারণ কোন নারী হ'তে তাহলে তোমার কথায় আমি বিস্মিত হতাম না, নদীস্রোতে তৃণখণ্ড ভাসছে দেখলে যেমন বিস্মিত হই না। কিন্তু শিলাখণ্ডকে দেখলে বিস্ময় হয়। তুমি যা বললে মনে হচ্ছে তা নারীসুলভ ছলনামাত্র। চতুরানন বিশিষ্ট কোনও অদ্ভুত ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা এটা তো অসম্ভবই, কিন্তু তার চেয়েও বেশী অসম্ভব মনে হচ্ছে তুমি সেটা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করছ এই ধারণাটা।···" সেদিন সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে বলিয়াছিল, "আপনি হয়তো চতুরাননকে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু আমি করি···" সত্যই কি সে করে? সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইল যে সেও ইহলোক ছাড়া আর কিছুই বিশ্বাস করে না, কখনও করে নাই। তবে সে চার্ব্বাকের কথায় প্রতিবাদ করিয়াছিল কেন! করিয়াছিল চার্ব্বাককে নিরস্ত করিয়া আরও উতলা করিবার জন্য। ইশারায় ইঙ্গিতে এই কথাই সে বলিতে চাহিয়াছিল—'তুমি ভাবিয়াছ তোমার বুদ্ধির দীপ্তিতে আমার চোখ ঝলসাইয়া দিবে? ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আমাকে যুক্তির জাল দিয়া ধরা যায় না। প্রেম-ডোর ছাড়া অন্য কোনও ডোরে আমাকে বাঁধা সম্ভব নয়। কুমারের প্রেমে পড়িয়াছি বলিয়াই তাহার কাছে আছি,

তাহার চতুরানন
তোমার প্রেমে যা স্বষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। নির্ম্মিরের
মানিয়া লইতাম। তাহা হইলে তোমার নাস্তিক্য-বাদকেও
জলের মতো। কাছে যুক্তি আস্ফালন বৃথা। আমি
করি।' সহসা পাত্রে থাকি সেই পাত্রের আকার ধারণ
মাথা হইতে প... জরে পড়িল যূপকাষ্ঠটা পোঁতা হইতেছে।
ওই যূপকাষ্ঠমূলে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ যেন বহিয়া গেল।
এই সর্ব্বনাশা যজ্ঞে ...হইয়া যাইবে? হায়, হায়, কেন সে
কারণটা হঠাৎ সে ...ন দিতে রাজি হইয়াছিল? কেন? নিগূঢ়
...তবাদ কল্পিতে পারিল। সে আশা করিয়াছিল কুমার
ঘটিতে দিগূঢ় বিশ্বাস ছিল, কুমার কিছুতেই এ নৃশংস ব্যাপার
আয়োজ...। কিন্তু কুমার তো কিছুই করিল না। যজ্ঞের
কামের... মহাসমারোহে চলিতেছে। ওই সিংহটা যেমন
নিজের ...ায় বন্দী হইয়াছে সে-ও তেমনি অহঙ্কারের প্ররোচনায়
কি কোন... নিজেই আহ্বান করিয়াছে। কিন্তু তাহার বিশ্বাসের
মনে হইল নাই? কুমার কি সত্যই তাহাকে বলিদান দিবেন?
লক্ষ্য করিবদের চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা বৈরাগ্য সে
আতঙ্কজ...ে যাহা দুর্ভেদ্য, যাহা দুর্ব্বোধ্য, যাহা রহস্যময়,
করিয়...। অন্যমনস্ক সুন্দরানন্দকে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে সে লক্ষ্য
তরী... যেন কোন সীমাহীন সাগরে তাহার মন ছিন্ন-বন্ধন
সেতো ভাসিয়া চলিয়াছে। পাশে বসিয়া আছে তাহার দেহটা,
মা...। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সুরঙ্গমা সকলকে পিছনে ফেলিয়া তাহার
...ড়ি দিয়াছে অজানার উদ্দেশ্যে। আর একটা কথাও তাহার
...পুরুষদের অহঙ্কারও কম নয়। নিজেদের কথার মর্য্যাদা
...াতে ...ন্য তাহারা অপরের সর্ব্বনাশ করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত
র...ে মনে পড়িল রামের কথা, হরিশ্চন্দ্রের কথা। রাম কি

করে সে হায়। হরিশ্চন্দ্র কি
সীতাকে কম ভালবাসিত? তবু বিসর্জ্জন তেই করিতে ইতস্তত
শৈব্যাকে কম ভালবাসিত? তবু তাহাকে দি গায়ের মাংস
করে নাই। পুরুষরা সব পারে। শিবি ন হইরুষদের অসাধ্য
ছিঁড়িয়া দিয়াছিল, দধীচি অস্থিদান করিয় তখন সিংহটা গর্জ্জন
কিছু নাই। সহসা চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত প্রকুল্ল অপ্রকাশ করিয়া
করিয়া উঠিল। পৌরুষের দম্ভ সিংহগর্জ্জনে । ফাঁ পৌরুষ নিজের
বলিল, ঠিকই বলিয়াছ। মৃত্যুর মুখে ও পা ন মায়া অভিভূত
মহিমা ঘোষণা করে। জাগ্রত পৌরু তাহার কাছে দুস্তর
করে না, কোন বন্ধনই বাঁধে না। কোনও বাধা জকে জানিয়াছে
নয়, কোনও বিপদ ভয়ঙ্কর নয়। যে পৌরুষ িন ফিরিয়া চায়
সে নির্ভীক, সে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে, পিছু? সহস
না। সুন্দরানন্দের কি এই পৌরুষ জাগ্রত হইয়াথ ধরিল
একটা কথা মনে হওয়াতে সুরঙ্গমার চিন্তাস্রোত ভিন্ন। হঠা
সুন্দরানন্দের এই পৌরুষকেই তো সে ভালবাসিয়া কেন
সেই পৌরুষের আর একটা রূপ দেখিয়া ভয় পাইতে আবা
কিন্তু ভয় তাহার করিতেছিল। প্রোথিত যূপকাষ্ঠটার দি, মহিষ
সে চাহিয়া দেখিল। নির্বিবকার, শুষ্ক প্রাণ-হীন কাষ্ঠ—মানুকাইয়
ছাগ-শিশু তাহার কাছে সব সমান। সহসা সুরঙ্গমা চমকাইয়
উঠিল। শাখা-পত্রের মধ্যে কথা কহিতেছে কে! উৎকর্ণ
শুনিতে লাগিল।

"বাণী, বৃহদারণ্যক বলে' একটা উপনিষদ আছে জান?"

"জানি। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষাংশই বৃহদারণ্যক কেন—"

"তাতে একটা মজার কথা আছে। কোন এক ঋষি ত
আমাকে ক্ষুধা বলে' কল্পনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলে
ক্ষুধা মানে মৃত্যু—এই মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ। অর্থা

বোধহয় এত ক্ষিধে পাচ্ছে আজ। ওই ম্লেচ্ছ পণ্ডিত মিস্মিরের ফলগুলো নিঃশেষ করেছি, তবু মনে হচ্ছে কিছুই হয় নি। মনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করে' ফেলি। সমস্ত নিঃশেষ হয়ে যাক, সৃষ্টি আরম্ভ হবে তারপর। চুপ করে' আছ যে—"

"তাই করুন—"

"চার্ব্বাক আর শিখর সেনের ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাক, তারপর যা হয় করা যাবে। করতেই হবে একটা কিছু। নূতন সৃষ্টির প্রেরণা জেগেছে মনে, মৃত্যুরূপী ক্ষুধা অশান্ত হয়ে উঠেছে পুরাতনকে গ্রাস করে ফেলবার জন্যে—"

"এবার স্বৈরচর সৃষ্টিতে মন দেবেন ?"

"কি করব জানি না। উপাদান আর ইচ্ছা দুইই আমার মনের ভিতর আছে। দুটোর সমন্বয়ে কি যে গড়ে' উঠবে তা আমিও জানি না। বৃহদারণ্যকে আছে—প্রথমে ছিলাম ক্ষুধা, তারপর হলাম জল, তারপর পৃথিবী, তারপর সূর্য্যনক্ষত্র, তারপর কাল। আমার প্রেরণা যে কি রূপ নেবে তা আমিও জানি না। এখন এই গল্প দুটো শেষ করা যাক। এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ও যে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে কিন্তু বাণী, কি খাই বল তো। পক্ষীরূপ তো বড় সাংঘাতিক রূপ, সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে কি খাই কি খাই—"

"বনে অনেক ফল আছে, চলুন খুঁজে দেখা যাক"

"তাই চল"

সুরঙ্গমা সবিস্ময়ে দেখিল বৃক্ষ শিখর হইতে দুইটি অপরূপ শুকপক্ষী উড়িয়া গেল। সবিস্ময়ে সে তাহাদের প্রস্থান-পথের দিকে চাহিয়া রহিল। মনে পড়িল অতি শৈশবে মাতামহীর নিকট সে এক রূপকথা শুনিয়াছিল, সে রূপকথায় এক পক্ষীদম্পতী মনুষ্য-ভাষায়

কথা কহিত। ইহারাই কি তাহারা? কি বলিল কিছু বোঝা গেল না তো! বৃহদারণ্যক কি? বাণীই বা কে। একটি কথা কিন্তু সে বুঝিয়াছিল, সেই কথাটাই তাহার কানে বাজিতে লাগিল—এই মেয়েটা ভয়ে মরছে। কিন্তু ওযে বেঁচে যাবে, বেঁচে গিয়েই যে মরবে সে জ্ঞান ওর নেই।" কোন মেয়েটার কথা বলিল উহারা। তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিল কি? সিংহটা আবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল সহসা। সুরঙ্গমা চাহিয়া দেখিল সিংহটা উর্দ্ধমুখে তাহাকেই দেখিতেছে। মনে হইল সে-ও যেন কিছু বলিতে চাহিতেছে। তাহার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র সে বসিয়া পড়িল এবং সামনের থাবায় মুখটা রাখিয়া উর্দ্ধ দৃষ্টিতে এমন একটা ভঙ্গী করিল যাহার অর্থ—অমন নাগালের বাহিরে বসিয়া আছ কেন। আর একটু নামিয়া এস না। সুরঙ্গমা মুখ ভ্যাংচাইয়া তাহার আমন্ত্রণের উত্তর দিল এবং ধীরে ধীরে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। খাঁচার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই সিংহটাও দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উন্মুখ আগ্রহে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, আর গর্জ্জন করিল না, কেবল তাহার কণ্ঠ-স্বর হইতে সম্ভবত তাহার অজ্ঞাতসারেই একটা গর-গর গর-গর শব্দ বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মাংস খাবার ইচ্ছে না কি? আমি কি ভেড়া হরিণের মতো সাধারণ পশু? কাল রাত্রে তো গান শুনেছ। আজ নাচ দেখবে? দেখ—" সুরঙ্গমা সিংহের সম্মুখে নাচিতে আরম্ভ করিল। তাহার কেশ আলুলায়িত হইল, বেশবাস বিস্রস্ত হইল, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া সে নাচিয়া চলিল। উন্মাদিনীর মতো নাচিতে লাগিল।

সহসা তাহার নাচ থামিয়া গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল শুধু সিংহ নয়, স্বয়ং কুমারও একটু দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নাচ দেখিতেছেন। কুমারকে দেখিবামাত্র তাহার মনে হইল এতক্ষণ সে যাহা ভাবিতে-

ছিল তাহা ভুল, কুমারের চোখের দৃষ্টি হইতে যাহা বিচ্ছুরিত হইতেছে তাহাতে ঔদাসীন্যের কোনও চিহ্ন নাই—তাহা অনুরাগপূর্ণ। কুমার আগাইয়া আসিলেন।

"সুরঙ্গমা কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? তোমাকে খুঁজতে লোক পাঠিয়েছি চারিদিকে"

"ভয় হয়েছিল না কি যে আমি পালিয়ে যাব? আমি ছাগল বা ভেড়ার মতো সাধারণ পশু নই কুমার, আমি যখন কথা দিয়েছি তখন আমি পালিয়েও যাব না, আপনার সুখের জন্যে যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও ইতস্তত করব না"

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার পুষ্পিত দেহ-লতার দিকে নির্নিমেষে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার নয়নযুগলে কৌতুকদীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

"কোথা ছিলে এতক্ষণ—"

"ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম চারিদিকে। মরবার আগে পৃথিবীটাকে ভাল করে দেখে নিচ্ছিলাম একবার।"

"সিংহটার সামনে নাচছিলে দেখলাম"

"ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল ও যেন আমাকে চাইছে। কিন্তু আমার দেহটা তো দেবতার উদ্দেশ্যে আগেই নিবেদন করেছি, তাই ওকে নাচই দেখাচ্ছিলাম শুধু। গানও শুনিয়েছি কাল রাত্রে—"

সুন্দরানন্দের চোখের দৃষ্টি আরও কৌতুকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"একটা হিংস্র পশুর প্রতি এ পক্ষপাত কেন বুঝতে পারছি না ঠিক—"

মুচকি হাসিয়া সুরঙ্গমা বলিল—"সম্ভবত ও নিছক পশু বলেই। চলুন, যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাক এবার। যজ্ঞ আরম্ভ হবে কবে—"

"কাল—"

"আজ কি আমাকে উপবাস করে' থাকতে হবে"

"আমি ঠিক জানি না। মহর্ষি পর্ব্বত কিন্তু তোমাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে চাইছেন না"

"কেন—"

"তিনি বলছেন নারী-পশু যজ্ঞে বলিদান দেওয়ার রীতি নেই। তিনি বলছেন নিষ্ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে—"

"নিষ্ক্রয় ব্যাপারটা কি"

"তোমার বদলে আর একটি মানুষ বলি দিতে। মহর্ষি বলছেন যথোচিত মূল্য দিলে মানুষ পাওয়া যাবে"

"আপনি এ ব্যবস্থায় রাজি হয়েছেন ?"

"এখনও হইনি। কাউকে টাকার জোরে বশীভূত করে' তারপর তাকে যজ্ঞে বলিদান দিতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। তুমি স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলে বলেই এ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম। তোমারি অনুরোধে করেছিলাম। মির্ম্মিরের কথার উত্তরে তুমিই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বলেছিলে—যজ্ঞের আয়োজন করুন আমিই তাতে আত্মাহুতি দেব। জানিনা এ কথা কেন বলেছিলে তুমি—"

"কেন বলেছিলাম তা-যদি না বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে বুঝিয়ে বলবার দরকারও নেই। ঠিক বোঝানও যাবে না। এইটুকু শুধু বলতে পারি আত্মাহুতি দিতে এখনও আমি রাজি আছি, আমার মত এতটুকু বদলায় নি। তবে মহর্ষি পর্ব্বত যদি আমাকে অমনোনীত করেন সে আলাদা কথা—"

"তুমি যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে চাইছ কেন"

"আপনাকে ভালবাসি বলে'। ওই ম্লেচ্ছ মির্ম্মির যে তার অনেকে বিসর্জ্জন দিতে পেরেছে বলে' আপনার উপর টেক্কা দিয়ে যাবে

এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাঁকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই আমিও তাঁর তানের চেয়ে কিছু কম নই। আর আপনিও তাঁর চেয়ে কোনও অংশে কম নন”

“কিন্তু আমি ভাবছি—”

কুমার সুন্দরানন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থামিয়া গেলেন।

“কি ভাবছেন—”

সুরঙ্গমা সোৎসুকে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

“ভাবছি মিস্মিরের ওপর টেক্কা দেবার জন্যে তোমাকে চিরকালের মতো হারানোটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে?”

“ম্লেচ্ছ মিস্মির কিন্তু তানেকে হারিয়েই চিরকালের মতো পেয়েছে আপনিও হয়তো পাবেন আমাকে সেই ভরসাতেই যজ্ঞের আয়োজন করেননি কি?”

“না। আমি যজ্ঞের আয়োজন করেছিলাম আমার দেশের মান বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু এখন ভাবছি ভুল হয়ে গেছে। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। কিছুক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি—”

সুরঙ্গমার কর্ণে সুধা বর্ষিত হইল, সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল। তাহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, চক্ষু দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সুন্দরানন্দ বলিতে লাগিলেন—“তাছাড়া, স্পর্দ্ধা করে’ কারও সঙ্গে পাল্লা দেওয়া ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য নয়। তার বৈশিষ্ট্য বিনয়ে, নীরব সাধনায়, নম্রতায়। তোমাকে যজ্ঞে যদি আহুতি দিতেই হয় তা তোমার এবং আমার প্রয়োজনের জন্যে দেব। তার সঙ্গে মিস্মিরের সম্পর্ক কি। তুমি ভেবে বল তোমার অভিপ্রায় কি। তুমি যা বলবে তাই হবে—”

সুরঙ্গমা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল—

"আমি যদি এখন আত্মাহুতি দিতে রাজি না হই, আপনি কি যজ্ঞ বন্ধ করে' দেবেন? এত আয়োজন করেছেন"

"যজ্ঞ বন্ধ করব না। মহর্ষি পর্ব্বত যা ব্যবস্থা করবেন তাই করব। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা, তাঁর আদেশই পালন করতে হবে। শুধু একটি অনুরোধ তাঁকে করব টাকা দিয়ে কিনে এনে তিনি জোর করে' কাউকে যেন বধ না করেন—"

"কিন্তু স্বেচ্ছায় কেউ কি প্রাণ দিতে রাজি হবে! কোনও উপায়ে তাকে বশীভূত করা ছাড়া উপায় নেই"

"তুমি তো স্বেচ্ছায় প্রাণ দিতে রাজি হয়েছিলে—"

"আমি তো অনেক আগেই আপনার বশীভূত হয়েছি। আপনার মঙ্গলের জন্য আপনার সম্মান রক্ষার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এখন আমি আত্মাহুতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছি"

"না আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না, চল, দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়—"

সিংহটা আর একবার গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

"ও বেচারীর আর একটু নাচ দেখবার ইচ্ছে আছে। আপনি ওই পাথরটার উপর বসুন না, ওকে আর একটু নাচ দেখাই"

সুন্দরানন্দ সহসা সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিলেন, তাহার পর প্রস্তরখণ্ডের উপর গিয়া বসিয়া বলিলেন, "নাচবার আগে মাথায় কিছু ফুল পরে' নাও। ওই যে লতায় থোকো থোকো ফুল ফুটে রয়েছে, দাঁড়াও পেড়ে দিই আমি—"

নিকটেই একটা বনলতায় অজস্র ফুল ফুটিয়াছিল, সুন্দরানন্দ উঠিয়া গিয়া কিছু ফুল পাড়িয়া আনিলেন এবং সুরঙ্গমাকে সাজাইতে লাগিলেন। ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়া সুরঙ্গমা নাচিতে লাগিল। মনে হইল কোনও অপ্সরী বুঝি নাচিতেছে।

রাত্রির ঘন অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহটা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব অন্ধকারকে শব্দ-খচিত করিয়া একটা অদৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল প্রচণ্ড গর্জ্জনে তাহা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত নিস্তব্ধ হইয়া গেল যেন। সেই নিস্তব্ধতাকে চঞ্চল করিয়া একটা পেচক ডাকিয়া উঠিল, পাখা ঝটপট করিয়া একদল বাদুড় উড়িয়া গেল। একটি বৃক্ষতলে চার্ব্বাক নিস্তব্ধ হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল। অরণ্যে আত্মরক্ষা ও আত্ম-গোপন করিবার জন্য তাহাকে সমস্ত দিন যে দুরূহ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহার ফলে তাহার চোখের পাতায় তন্দ্রা নামিয়াছিল। বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিল সে। সিংহের প্রচণ্ড-গর্জ্জনে তাহার তন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া ক্ষণকালের জন্য সে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পড়িল। সে কি আকাশ-লোকে বসিয়া আছে? চতুর্দ্দিকে এত নক্ষত্র কেন! শব্দটা কি বজ্রের? কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার এ ভ্রম ভাঙিয়া গেল। বুঝিতে পারিল জোনাকী-পরিবৃত হইয়া সে বসিয়া আছে, গর্জ্জনটা সিংহের, বজ্রের নয়। সুরঙ্গমা কখন আসিবে? আসিবে কি না? সিংহটা সহসা গর্জ্জন করিয়া উঠিল কেন? কাছাকাছি কেহ আসিয়াছে কি? গাছের তলা হইতে বাহির হইয়া অনুসন্ধান করা সমীচীন হইবে কি না, এই ধরণের চিন্তা তাহার মনে পর পর জাগিতে লাগিল। কিন্তু একটিও বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না, চার্ব্বাক গাছের তলায় ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া বসিয়া থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিল। ভাবিল সুরঙ্গমা যদি সত্যই আসে, কোন না কোন সঙ্কেত দ্বারা সে

নিশ্চয়ই আপনার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে। কিন্তু চার্ব্বাক বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিল না। পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঝোপের ভিতর হইতে কোঁক্ কোঁক্ শব্দ হইতে লাগিল। চার্ব্বাকের মনে হইল সাপে ব্যাং ধরিয়াছে। কিছুক্ষণ সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। বিষধর সর্পের এত নিকটে বসিয়া থাকা নিরাপদ বলিয়া মনে হইল না। গাছের নীচে অন্ধকার সূচীভেদ্য ছিল, বাহিরে আসিয়া চার্ব্বাক অনুভব করিল—আকাশের অগণিত নক্ষত্র অন্ধকারকে কিঞ্চিৎ স্বচ্ছ করিয়াছে। স্বল্পালোকিত অন্ধকারে সিংহের খাঁচাটা দেখা যাইতেছে। জমাট অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া চার্ব্বাকের ব্যক্তিত্বও যেন জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। বাহিরে আসিয়া সে একটু স্বস্তি বোধ করিল বটে, কিন্তু অতঃপর কি করা কর্ত্তব্য তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া অস্বস্তিও ভোগ করিতে লাগিল। এভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করিবে সে? অপেক্ষা করাও কঠিন। রাত্রি যত বাড়িতেছে, গভীর অরণ্য তত বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। তাছাড়া অসংখ্য মশা। কোথাও সুস্থির হইয়া বসিবার বা দাঁড়াইবার উপায় নাই। এত কষ্ট সত্ত্বেও কিন্তু চার্ব্বাক অবিচলিত ছিল। রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবার ইচ্ছা তাহার একবারও হয় নাই। বরং কষ্ট যতই বাড়িতেছিল ততই তাহার সমস্ত হৃদয় এক অদ্ভুত আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সুরঙ্গমার হৃদয় জয় করিবার আগ্রহ তো তাহার ছিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ছিল এই বেদ-পন্থী ভণ্ডদের যজ্ঞটা পণ্ড করিয়া দিবার। সুরঙ্গমাকে সে ভালবাসিয়াছিল বলিয়া আগ্রহটা হয়তো তীক্ষ্ণতর হইয়াছিল কিন্তু সুরঙ্গমা না হইয়া অন্য কোন নর বা নারী যদি যজ্ঞীয় পশু রূপে মনোনীত হইত তাহা হইলে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যও চার্ব্বাক অনুরূপ কষ্ট-স্বীকার করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। শুধু প্রেমের জন্য নহে, একটা বিশেষ আদর্শের

জন্ত কষ্ট সহ্য করতেছিল বলিয়া চার্ব্বাকের আনন্দও হইতেছিল। সিংহটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চার্ব্বাক পুনরায় ঘনতর অন্ধকারে আত্মগোপন করিবার জন্ত গাছের দিকে অগ্রসর হইতেছিল এমন সময় গাছের উপর হইতে সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

"মহর্ষি, আপনি এসেছেন না কি। আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনার জন্ত অপেক্ষা করছি"

"কোথায় তুমি"

"গাছের উপর"

"নেমে এস"

সিংহ পুনরায় গর্জ্জন করিল। বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সুরঙ্গমা জিজ্ঞাসা করিল, "কতক্ষণ এসেছেন আপনি"

"অনেকক্ষণ"

"আমিও অনেকক্ষণ এসেছি"

"সিংহটা কি তোমাকে দেখেই গর্জ্জন করছে"

"হ্যাঁ। ও, আমার নাচ দেখতে চায়। চলুন, এখান থেকে সরে' যাওয়া যাক"

"কোথায় যাওয়া যায় বলতো। এই জঙ্গলে তো সুস্থির হ'য়ে কোথাও বসবার দাঁড়াবার উপায় নেই"

"আপনার যদি সাহস থাকে তাহলে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি আপনাকে"

"আমার সাহসের অভাব নেই। তুমি সঙ্গে থাকলে আমি মৃত্যুর মুখেও এগিয়ে যেতে পারি"

"মৃত্যুর মুখেই যেতে হবে, যদি যান"

"কোথা যেতে হবে-বল"

"যজ্ঞের জন্ত অনেকখানি জায়গা পরিষ্কার করে অনেক ঘর তৈরী

করা হয়েছিল। সব ঘরগুলো কাজে লাগেনি। পশ্চিমদিকে কয়েকটা ঘর খালি পড়ে আছে। আপনার পক্ষে সেখানে যাওয়ার বিপদ আছে, যদি কেউ এসে আপনাকে হঠাৎ চিনে ফেলে তাহলে আপনাকে বন্দী করবে। আপনার অপরাধ প্রমাণ করা শক্ত হবে না, ধারামতী মহর্ষি পর্ব্বতের সঙ্গেই এসেছে এ কথাতো আগেই জানিয়েছি আপনাকে”

“তার চেয়ে চল না এখনই এ অরণ্য ত্যাগ করি। তুমি এখনই চল আমার সঙ্গে, রাত্রির অন্ধকারে কেউ দেখতে পাবে না—”

“মার্প করবেন মহর্ষি, তা আমি পারব না। আমি সামান্যা নর্ত্তকী হতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ আমি করব না। কুমারকে না জানিয়ে আপনার সঙ্গে আমি পালাতে পারব না। তবে আপনার বক্তব্য আমি শুনব—”

“কিন্তু তা শুনে লাভ কি—যদি তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি আঁকড়ে বসে' থাক। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এইটেই হল আমার বক্তব্যের মূল কথা—”

“আপনার বক্তব্য শুনে যদি মনে হয় যে আপনার সঙ্গে যাওয়াই উচিত তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। কিন্তু কুমারকে বলে' যাব। লুকিয়ে পালিয়ে যাব না”

“কিন্তু কুমার কি তোমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হবেন?”

“তিনি তো চিরকালের মতোই আমাকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছেন। এ যজ্ঞে তো আমাকেই বলিদান দেওয়া হবে। কুমার তো আপত্তি করেন নি। আমি যদি চলে' যেতে চাই, তাহলেও আপত্তি করবেন না।”

“তোমার ইচ্ছা অনুসারেই কি তোমাকে বলিদান দেওয়া হচ্ছে?”

“হ্যাঁ—”

"তোমার এরকম ইচ্ছে করার মানে—?"

"মানে একটা আছে বই কি। সব কথা শুনতে যদি চান তাহলে চলুন পশ্চিম দিকের একটা খালি ঘরে গিয়েই ঢোকা যাক। এখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ দেখতে পাবে না আমাদের"

"চল—"

অরণ্যের অন্ধকারে উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিল। সিংহটা পুনরায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

বিচিত্র-পক্ষ শুকপক্ষীদ্বয় সেই অরণ্য মধ্যে বিশাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখায় পাশাপাশি বসিয়াছিল।

"প্রথম শুকপক্ষী দ্বিতীয় শুকপক্ষীকে বলিল, "মানুষের ভাষায় এখন কথা কইব না। এ গাছে অনেক পাখী আছে, তারা ভয় পাবে। তুমি শুকের ভাষায় উত্তর দিও। আমার একটা কথা জানতে ইচ্ছা করছে খুব। সরলভাবে উত্তর দিও। তোমার কি আনন্দ হচ্ছে?"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"হচ্ছে। আপনার আনন্দ হলে আমার হবে না?"

"আমার আনন্দ হচ্ছে বুঝতে পারছ তুমি সেটা?"

"পারছি বই কি—"

"সত্যি খুব আনন্দ হচ্ছে আমার। এই আনন্দেই মশগুল হয়ে আছি চিরকাল, কত কোটি কল্পনা এল আর গেল, এ আনন্দের আর শেষ নাই। সৃষ্টির আনন্দ অদ্ভুত আনন্দ। জানি না পালন করে' বিষ্ণু এ আনন্দ পাচ্ছে কি না। পাচ্ছে নিশ্চয়। ধ্বংস করে' মহেশও কি আনন্দ পাচ্ছে?"

"ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর মহেশ্বর কি আলাদা?"

আলাদা নয়, কিন্তু আলাদা করে' ভাবতে ভাল লাগছে। যে-আমি সৃষ্টি করছি, সেই-আমি আবার অন্যরূপে নিজের সৃষ্টিকে ধ্বংস করছি, একথা ভাবতে ভাল লাগছে না। ওই চার্ব্বাক-সুরঙ্গমা শিখর-অবঞ্চনা কেউ থাকবে না জানি, কিন্তু আমি নিজেই ওদের ছবি এঁকে আবার নিজেই ছবি মুছে ফেলছি—ভাবতে কি রকম লাগছে। নিজেকে এতটা ছেলেমানুষ ভাবতে ইচ্ছে করছে না। ও কথা আমাকে তুমি মনে করিয়ে দিও না বাণী"

দ্বিতীয় শুক উত্তর দিল—"তা না দিতে পারি। কিন্তু আসলে আপনি একটি খামখেয়ালী শিশু"

"সত্যি ?"

কথাটা বলিয়া প্রথম শুক শুকপক্ষীদের ধরণে খুক্ খুক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

২৫

কবি তন্ময় হইয়া শিখরের গল্প লিখিতেছিলেন।

"সেদিন আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল। যে আলেয়াকে আমি স্বর্গের দেবী ভেবেছিলাম, যাকে কল্পনা-কাননের অপ্সরীরূপে চিত্রিত করেছিলাম মানসপটে, সেই আলেয়াই আমার সমস্ত স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে' দিলে সেদিন। একটা তাজমহল যেন হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল, রূপান্তরিত হয়ে গেল ইট-চূণ-স্মুরকির স্তূপে। ঘটনাটা ঘটল যখন, তখন আমি বিচলিত হইনি, এমন কি বিস্মিতও হইনি। আমার মনের মধ্যে যে নির্ব্বিকার দ্রষ্টা আছেন তিনিই বোধহয় দেখছিলেন তাকে তখন, নিতান্ত প্রকাশিত ঘটনারূপেই দেখছিলেন। মনের মধ্যে এই দ্রষ্টার অস্তিত্ব সব সময়ে টের পাই

না আমরা, জীবনে বৃহৎ বিপর্য্যয় যখন আসে তখনই আত্মপ্রকাশ করেন তিনি,' সত্তার যে অংশটা সুখদুঃখে বিচলিত হয় সেটাকে আড়াল করে' ফেলেন কিছুক্ষণের জন্য। সার্জ্জনরা বড় বড় অপারেশন করবার সময় ক্লোরোফর্ম্ম দেয় যেমন, অনেকটা তেমনি। ক্লোরোফর্ম্ম কিন্তু চৈতন্যকে বেশীক্ষণ আচ্ছন্ন করে' থাকে না, নির্ব্বিকারও বেশীক্ষণ আমরা থাকতে পারি না ; পরে আমি বিচলিতও হয়েছিলাম, বিস্মিতও হয়েছিলাম, আলেয়ার সান্নিধ্য লাভ করবার একটা পথ পেয়ে পুলকিতও কম হই নি। কিন্তু স্বর্গের দেবী মানবীতে রূপান্তরিত হওয়াতে এখন কেমন যেন ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি ; মনে হচ্ছে আমি নিজেই যেন কোন স্বর্গলোক থেকে বিচ্যুত হয়েছি, নাগালের বাইরে দূরবীণের ভিতর দিয়ে যে আলেয়াকে দেখতাম সে আলেয়া যেন চিরকালের মতো হারিয়ে গেল, আর তাকে পাব না।

শিখরের ডায়েরিতে শিখরের জীবনের যে মর্ম্মান্তিক পরিণতি দেখছি আমার জীবনেও তেমনি কিছু ঘটবে না কি ! আশা এবং আশঙ্কার দোলায় দুলছে মনটা। লোভ হচ্ছে, ভয়ও হচ্ছে। শিখর অবন্ধনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে যেমন কাছে পেয়ে গিয়েছিল, আলেয়াকে আমিও তেমনি পেয়েছি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে আলেয়া যে আমার কপাটে করাঘাত করে' আমার ঘরে এসে হাজির হবে একথা আমার সুদূরতম কল্পনার অতীত ছিল। কিন্তু হাজির হল যখন—তখন আমি বিস্মিত হই নি, আমার সপ্রতিভতা আলেয়াকে বিস্মিত করেছিল কি না কে জানে। কপাট খুলেই যখন দেখলাম আলেয়া দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সাজসজ্জা করে' তখন খুব সপ্রতিভভাবেই আমি বলেছিলাম—"ও, তুমি। তারপর, কি খবর—"

এমনভাবে বললাম যেন আমার ঘরে তার আগমন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার একটা। আলেয়া হাসিমুখে ঘরে এসে ঢুকল।

"আমার ভয় হচ্ছিল আপনি হয়তো আমোকে চিনতেই পারবেন না"

অত্যন্ত স্বাভাবিক সুরে মৃদু হেসে বললাম—"না, তোমাকে ভুলিনি। কোনও দরকারে এসেছ না কি? না, এমনি দেখা করতে। বস—"

আমার ইজিচেয়ারটায় বসল আলেয়া, যে ইজিচেয়ারে বসে' জানলার ফাঁক দিয়ে দূরবীণ-সহযোগে রোজ আমি তাকে দেখতাম, সেই ইজিচেয়ারটাতেই বসল সে। মনে হল অসম্ভব সম্ভব হল, দূর নিকটে এল, অসীমা ধরা দিতে বুঝি সীমার মধ্যে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভুলটা ভাঙল।

আলেয়া বললে—"আপনি যে এত কাছে আছেন তা জানতাম না। জানলে আগেই আসতাম আপনার কাছে। কাল হঠাৎ দেখতে পেলাম আপনি ফুটপাথ থেকে এই বাড়িটাতে ঢুকছেন। খবর নিয়ে জানলাম এই বোর্ডিংএ-ই আছেন আপনি অনেক দিন থেকে"

"দরকার আছে কোন—?"

"আছে বই কি। প্রথমেই একটা কথা জিগ্যেস করছি কিছু মনে করবেন না—আপনি কি লাইফ ইনশিওরেন্স করিয়েছেন?"

"না"

"তাহলে আমার কোম্পানিতে কিছু করুন। অন্তত দশ-হাজার—

এইবার আমি একটু অবাক হলাম।

"তোমার কোম্পানিতে, মানে?"

"আমি আজকাল ইনশিওরেন্সের দালালী করছি যে"

বলেই চক্ষু আনত করে' শাড়ীর একটা খুঁট পাকাতে লাগল, তারপর আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হাসি হাসলে একটি।

"নিরুপমবাবু কোথা ?"

"তিনি এলাহাবাদেই আছেন"

আলেয়ার মুখভাব কঠিন হয়ে গেল সহসা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নীচে একটা মোটরের হর্ণ শোনা গেল। আলেয়া তাড়াতাড়ি জানলার কাছে উঠে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে—"আসছি এখুনি। এক মিনিট—"তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, "ফর্ম্ম নিয়ে আসব ওবেলা ? শুধু নিজে ইনশিওর করলেই হবে না, আমাকে সাহায্যও করতে হবে একটু ! আপনার তো অনেক লোকের সঙ্গে চেনা-শোনা—"

কণ্ঠস্বরে আবদারের সুর বাজল একটু। চোখের দৃষ্টিতে চকমক করে' উঠল বিদ্যুৎ—যদিও মিনতির বিদ্যুৎ, নিঃশব্দে বজ্রপাতও হল যেন একটা।

"বললাম, "আচ্ছা—"

"চলি তাহলে—"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে গেলাম।

দেখলাম বোর্ডিংয়ের সামনে বেশ দামী বড় মোটর দাঁড়িয়ে আছে একখানা। স্টিয়ারিং ধরে' বসে' আছেন তাতে বলিষ্ঠ একটি ভদ্রলোক। মোটর চলে গেল, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ করে'। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল না। আশ্চর্য্য !

এ ঘটনার পর দূরবীণের প্রয়োজনটা আরও বেড়ে গেল। কাজ থেকে ফিরে এসে সমস্ত সন্ধ্যাটা আমি জানালার ফোকরে চোখ লাগিয়ে বসে' থাকতাম। আলেয়াকে দেখবার জন্যে নয় ; তার সঙ্গীটিকে দেখবার জন্যে। এই সময় শিখর সেনকেও লক্ষ্য করেছিলাম তার অজ্ঞাতসারে। লক্ষ্য করে' যদি চুপ করে' থাকতাম তাহলে যা ঘটেছিল তা ঘটত না বোধহয়। কিন্তু আমি চুপ করে'

থাকতে পারি নি। যা দেখেছিলাম তা শিখরকেই বলেছিলাম একদিন রহস্যভরে। সে রহস্যের এ পরিণাম যে হবে তা কে জানত।

শিখর সেনের ডায়েরি থেকে, এবার উদ্ধৃত করছি। ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে তাহলে।

"নিজের মনের দিকে চেয়ে নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। অবন্ধনার সম্বন্ধে যে সব ভয়ানক খবর সংগ্রহ করেছি, সে সবের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আর কারো সম্বন্ধে যদি এ সব খবর পেতাম তাহলে সে এতক্ষণ জেলের বাইরে থাকত না, নিশ্চয়ই থাকত না। অবন্ধনা কিন্তু আছে। পুলিস অফিসার হিসাবে নির্ম্মম হয়ে আমি এতদিন কর্ত্তব্য পালন করে' এসেছি, আইনের সীমাকে এতটুকু লঙ্ঘন করিনি, ভিক্টর হুগো'র অমর চরিত্র জ্যাভার্টাই এতদিন আমার আদর্শ ছিল, কিন্তু এখন আমি সে আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছি। অবন্ধনাকে আইন-সিংহের কবলে নিক্ষেপ করতে ইতস্তত করছি। গীতা পড়েছি। একবার নয় অনেকবার। শ্রীকৃষ্ণ বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, "নির্ব্বিকার অবিচলিত থেকে তুমি তোমার কর্ত্তব্য করে' যাও, তুমি ভাবছ আত্মীয়স্বজনকে বধ করব কি করে'? ওটা তোমার অহঙ্কার। তুমি কাউকে বাঁচাতেও পার না, মারতেও পার না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। এই দেখ, তোমার আত্মীয়-স্বজনরা আগে থাকতেই মরে' আছেন···।" এসব শ্লোক কণ্ঠস্থ আছে আমার। কিন্তু কার্য্যকালে কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। অবন্ধনা পাপীয়সী, অপরাধ প্রমাণিত হলে তার ফাঁসি হবে। আমার বিবেকের একটা অংশ বলছে তার ফাঁসি হওয়াই উচিত, কিন্তু আর একটা অংশ বলছে যে সমাজ তাকে পাপীয়সী করে তুলেছে সেই সমাজেরই ফাঁসি হওয়া উচিত, ওর কোন দোষ

নেই, সমাজের বিধি-ব্যবস্থার দোষেই ওই অম্লান কুসুমের গায়ে ধুলো-কাদা লেগেছে। ধুলো-কাদা পরিষ্কার করে' দিলেই আবার ও অম্লান হবে। তাই কর। এই দ্বিধাবিভক্ত বিবেক নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পড়েছি। কি করি? অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলাম তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করব, যদিও বিবেকের জ্যাভার্ট-ভক্ত অংশটি বারবার বলতে লাগল, অন্যায় করছ।

...বোর্ডিংয়ের বাৎসরিক সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। চূণকাম হয়ে গেছে, রং লাগানো হচ্ছে দরজা-জানালায়। এসব না করলেও নয়, অথচ কি বিরক্তিকর।

অবন্ধনার কাছে সেদিন সন্ধ্যার পর যখন গেলাম, দেখলাম সে বোর্ডিংয়ের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা কইছে।

"আমার ঘরে কাল হাত দেবেন বলছেন? বেশ, আমি জিনিস-পত্তর সরিয়ে রাখব। আর একটা কাজও কিন্তু করতে হবে—"

"কি বলুন—"

"দেখছেন না, ঘরে ঢোকবার দরজাটার সামনে কি হয়ে আছে! মেজেটা ফেটে সুরকি বেরিয়ে পড়েছে একেবারে। ওটা ঠিক করিয়ে দিন—"

"দেব। ভাল করে' সিমেণ্ট করিয়ে দেব"

ম্যানেজার আমার দিকে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে' চলে গেলেন। অবন্ধনার সম্বন্ধে ম্যানেজারের হৃদয়েও একটু 'কোমল কোণ', ইংরেজিতে যাকে বলে 'সফ্ট্ কর্ণার', আছে বলে সন্দেহ হল। ম্যানেজার চলে যাবার পর অবন্ধনার চেহারা বদলে গেল যেন। নূতন লোক হয়ে গেল সে। হেসে বললে, "তোমার উপর রাগ করেছি"

"কেন"

"কাল পরশু দু'দিন আসনি কেন?"

"কাজে ব্যস্ত ছিলাম—"

"রাত্রেও ফেরনি ?"

"ফিরেছিলাম অনেক রাত্রে। তখন আর তোমার ঘরে আসাটা উচিত মনে হল না। ঘুমিয়েও পড়েছিলে হয়তো—"

আমার দিকে একটা বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করে অবন্ধনা বললে—"তোমার উচিত-অনুচিত বোধটা এখনও বেশ টনটনে আছে দেখছি। আশ্চর্য্য মানুষ তুমি—"

সিগারেট কেস থেকে বার করে' একটি সিগারেট বেশ নিপুণভাবে ধরালে, তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, হেসে বললে—"আমাকে খুব ঘেন্না কর, নয় ?"

তার চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠল একটা। মনে হল সত্য উত্তরটা শোনবার জন্য সে কৌতূহলী, অথচ তার সঙ্গে স্পর্দ্ধার ভাবও রয়েছে একটা—"তুমি ঘেন্না করলে বয়েই গেল আমার"—এই গোছের একটা ভাব।

বললাম, "ঘেন্না করলে তোমার কাছে আসতাম না"

"আস ভদ্রতার খাতিরে। ছেলে-বেলার কথা মনে করে'। তাছাড়া আমি সত্যিই তো তোমার শ্রদ্ধা পাবার উপযুক্তও নই"

তারপর হঠাৎ হেসে বললে—"বুঝি গো বুঝি, সব বুঝতে পারি আমি। আমাকে যতটা বোকা তুমি মনে কর, ততটা বোকা আমি নই"

তার হাস্যদীপ্ত মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম একটু। মনের অবচেতনলোকে হয়তো ভাবছিলাম—ওই কালোবাজারীটা একে ইন্ধন করে' কত লোকের কত কামনার আগুনই না জানি জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে!

বললাম, "বোকা তুমি মোটেই নও, বরং একটু বেশী চালাক, আর সেই জন্যেই বোধ হয় মাত্রা ঠিক রাখতে পারছ না। অতি-বুদ্ধিটা বিপজ্জনক"

"মানে—"

তার মুখের হাসি নিবে গেল হঠাৎ।

খানিকক্ষণ আমাদের দু'জনের কারো মুখ দিয়েই কোন কথা বেরুল না। আমার মনে হল এইবার কথাটা পাড়াই ভাল। বললাম—"তোমার সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনছি"

"কি শুনছ—"

বললাম সব। শুনে আবার সে চুপ করে' রইল খানিকক্ষণ। ক্রমশ তার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল। চোখের দৃষ্টি থেকে বিচ্ছুরিত হতে লাগল আগুন। কিন্তু সে কোনও উত্তর দিলে না। সিগারেটটা ফেলে দিয়ে শেলফ্ থেকে বইগুলো নামিয়ে নামিয়ে তার বিছানার শিয়রের দিকে যে টেবিলটা ছিল তারই উপর সাজিয়ে সাজিয়ে রাখতে লাগল। বইগুলোর পিছন দিকে সায়ানাইডের যে শিশিটা লুকানো ছিল সেটাও বেরিয়ে পড়ল। আমার দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে' একটা বইয়ের আড়ালে রেখে দিলে সেটা। তারপর চাকরটা ঢুকল একগ্লাস জল হাতে করে'।

"কোথা রাখব মা এটা—ওখানে বই রাখলেন যে"

"এরই একপাশে রেখে দে"

চাকরটা জলের গ্লাস টেবিলে রেখে একটি বই দিয়ে জল ঢাকা দিয়ে চলে গেল। অবন্ধনা রোজ রাত্রে উঠে জল খায়। টেবিলের উপর প্রত্যহ একগ্লাস জল ঢাকা দেওয়া থাকে। আমি হাত-ঘড়িটা দেখলাম। প্রায় দশটা বাজে। অবন্ধনার দিকে চাইলাম, দেখলাম

সে একটা বই খুলে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করছে। বুঝলাম অন্যমনস্ক হবার জন্যেই সে তাড়াতাড়ি বইগুলো শেলফ্ থেকে নামিয়েছে। এগুলো না নামালেও চলত, নিজের নামাবারও দরকার ছিল না চাকর যখন রয়েছে।

বললাম—"আমার কথার কোন উত্তর দিলে না তো। তোমার সম্বন্ধে যা যা শুনেছি, তা কি সত্যি?"

বইয়ের পাতা ওলটালে খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললে—"সত্যি"

"সত্যি হলে তো ভয়ানক কথা! আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি। এ রকম করার মানে?"

"না করে' উপায় নেই"

"কিন্তু কি ভয়ঙ্কর পরিণতি এর তা জান?"

"জানি"

"সব জেনেও এরকম করা কি উচিত?"

অবঞ্চনার মুখে একটা হাসি ফুটল। অদ্ভুত হাসি।

"একটা বলকে ঢালুর মুখে গড়িয়ে দিয়ে তারপর সেটাকে থামতে বললে যে রকম শোনায়, তোমার উপদেশটাও সেই রকম শোনাচ্ছে!"

উপমাটা ভাল লাগল।

বললাম, "বল হয়তো থামতে পারে না, কিন্তু মানুষ ইচ্ছে করলে পারে। বলকে কেউ যদি থামিয়ে দেয় তাহলে বলও আর গড়াতে পারে না"

"আমাকে থামিয়ে দেবে এমন কেউ নেই, এক মৃত্যু ছাড়া"

বইটা মুড়ে রেখে এগিয়ে এল আমার দিকে। ইজি-চেয়ারে শুয়ে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

বললাম—"আমি আছি। আমি তোমাকে থামিয়ে দিতে পারি, থামিয়ে দিতে চাই"

"কি করে"

"বিয়ে করে"

"বলেছি তো, তা আর হয় না!"

দুজনেই চুপ করে রইলাম কয়েক মুহূর্ত।

তারপর সে হেসে বললে—"আমার বিষয়ে এত সব শোনবার পরও আমাকে বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় তোমার?"

"হয় বই কি। আমার সোনার হাত-ঘড়িটা হঠাৎ সেদিন নালীতে পড়ে গিয়েছিল, সেটা তুলে, ধুয়ে পরিষ্কার করে' আবার ব্যবহার করছি। এই দেখ, একটুও কাদা লেগে নেই আর"

"আমি হাত-ঘড়ি নই, মানুষ। আমাকে অত সহজে পরিষ্কার করা যাবে না"

"নিশ্চয় যাবে। হাত-ঘড়িকে জল দিয়ে পরিষ্কার করেছি, তোমাকে পরিষ্কার করব ভালবাসা দিয়ে"

"আমাকে এখনও ভালবাস তুমি? আশ্চর্য্য!"

"রাজি হও তুমি অবু। চল, কালই বিয়ের ব্যবস্থা করে' ফেলি—"

"না, সে হয় না"

"কেন হয় না"

স্মিতমুখে চেয়ে রইল সে আমার দিকে।

"আমি যতই খারাপ হই, আমি হিন্দুর মেয়ে উচ্ছিষ্ট জিনিস দিয়ে দেবতার ভোগ সাজাতে পারি না"

"কি যে পাগলের মতো বকছ তুমি। মানুষ দেবতাও হ'তে পারে না, উচ্ছিষ্টও হ'তে পারে না"

"পারে—"

"কি করে' বুঝলে সেটা"

"স্বচক্ষে দেখছি"

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পেয়ে দুজনেই ঘাড় ফেরালাম। দেখলাম ম্যানেজার এসেছেন। গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরে ঢুকলেন তিনি।

"মিস্ মুখার্জ্জি, কাল রাজমিস্ত্রি লাগাতে পারব না। কাল তাদের কি পরব আছে, আসতে রাজী হচ্ছে না। পরশু দিন আসবে। কাল চূণকামটা হয়ে যাক"

"বেশ"

ম্যানেজার চলে' গেলেন। আমিও উঠে পড়লাম, সুরটা কেমন যেন কেটে গেল।

"চলি তবে আজ। পাগলামি কোরো না, যা বলছি শোন সেটা; তোমার ভালর জন্যেই বলছি—"

"আমার ভাল করবার ক্ষমতা তোমারই ছিল, কিন্তু ঠিক সময়ে সে ক্ষমতা তুমি ব্যবহার কর নি। গোড়া কেটে গেছে, এখন আগায় জল ঢেলে কোন লাভ নেই। যাও শোওগে যাও, অনেক রাত হল। আমাকে এখুনি একটা 'কলে' বেরুতে হবে হয়তো।"

"কি 'কল'—"

"একটা লেবার কেস"

কিছু না বলে' দাঁড়িয়ে রইলাম ক্ষণকাল। তারপর বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে। বারান্দাতেই দেখা হল সেই কালোবাজারীটার সঙ্গে। হাতে ফুলের তোড়া, বগলে হুইস্কির বোতল। নিঃশব্দে নেমে গেলাম। একবার মনে হ'ল লোকটাকে আজই হাজতে পুরে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগৃহীত হয় নি, সুতরাং এ ইচ্ছাকে দমন করতে হল। হাজতে পুরেই বা লাভ কি? অবিলম্বে জামিনে খালাস পেয়ে সদম্ভে ঘুরে বেড়াবে আবার,

জজসাহেবেরা হয়তো রায় দেবেন লোকটা নির্দোষ। আমার ঘাড়েই উলটো চাপ পড়বে শেষে!

...একটু পরেই লক্ষ্য করলাম লোকটার সঙ্গে অবগুন্ঠনাও নেমে গেল, নেমে গিয়ে চড়ল সেই মোটরকারটায়। আমিও আবার তাদের অনুসরণ করলাম একটা ট্যাক্সিতে।

দেওয়ালের উপর যে দুইটি প্রজাপতি নিশ্চল হইয়া এতক্ষণ বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে চঞ্চলতা জাগিল। প্রথমে একটি প্রজাপতির পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। সে কম্পন ক্রমশ দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। মনে হইল কম্পনের ভাষায় সে যেন দ্বিতীয় প্রজাপতিটিকে কিছু বলিতেছে। কম্পনের ভাষায় দ্বিতীয় প্রজাপতিও উত্তর দিল, তাহারও পাখা দুইটি কাঁপিতে লাগিল। কম্পনের ভাষাকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করিলে নিম্নলিখিত রূপ দাঁড়ায়।

প্রথম প্রজাপতি বলিতেছিল, "পিতামহ, মনে হচ্ছে আপনার এই নবতম কাহিনী দুটিও আপনার প্রাচীনতম কাহিনীগুলিরই পুনরাবৃত্তি হবে। মহেশ্বরকে মুখে আপনি যতই গাল দিন, মনে মনে তাকে খুবই শ্রদ্ধা করেন মনে হচ্ছে"

দ্বিতীয় প্রজাপতি হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি করে' বুঝলে—"

"আপনার সব গল্পের নায়ক-নায়িকাদের তো তাঁর হাতেই সমর্পণ করেছেন"

"করছি তো। করবও চিরকাল। মহেশ্বর আর আমি আলাদা না কি। কতকগুলো কুঁদুলে বামুন ওই ধারণাটি সৃষ্টি করেছে তোমাদের মনে—"

"যাই বলুন, সব নায়ক-নায়িকাদের এমনভাবে মৃত্যুর মুখে তুলে দিতে ভাল লাগে না"

"কিন্তু ওইটেই তো খেলা। মৃত্যুতেই খেলার পরিণতি। পঞ্চভূতের কাছ থেকে মালমশলা ছিনিয়ে নিয়ে প্রত্যেকটি জীব দেহ-ধারণ করেছে, পঞ্চভূত সেই অপহৃত জিনিসগুলি পুনরধিকার করতে চাইছে—জীবরা তা ফিরে দিতে চাইছে না। যুদ্ধের খেলা জমেছে সুতরাং। পঞ্চভূত শেষ-পর্য্যন্ত জিতবেই, কারণ ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম, একটা জীব-দেহে চিরকাল আবদ্ধ থাকতে পারে না, ওরা নিজেদের এলাকায় ফিরে যাবেই। জীবেদের ইচ্ছে অন্য রকম। তারা ওদের দেহ-পিঞ্জরে চিরকাল আটকে রাখতে চায়। কিন্তু তা কি পারে কখনও ?".

"আপনার কৃতিত্ব তা হলে কোথায়—"

"এই একরঙা গল্পটাকে নানা রঙে রঞ্জিত করে' নানা রসে রসিয়ে ফুটিয়ে তোলা। রাবণের মৃত্যুবাণ তার নিজের হাতে দিয়েছিলাম, কিন্তু তার বুদ্ধিতে এমন একটি পাক লাগিয়ে দিলাম যে, সেই বাণটি সে একটি স্বল্পবুদ্ধি স্ত্রীলোকের হাতে তুলে দিলে। তারপর সীতা হরণ করে' বসল। ফলে হনুমান ছদ্মবেশে এল, মৃত্যুবাণটি মন্দোদরীর কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়ে সরে' পড়ল, রাবণের মৃত্যু হল। হিরণ্যকশিপুকে মহর্ষি কশ্যপের ছেলে করে' সৃষ্টি করলুম। তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে বর দিলুম যে সে জীবজন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হবে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দিনে বা রাত্রে তার মৃত্যু হবে না। তবু তাকে মরতে হল। তাকে মারবার জন্য স্তম্ভ ভেদ করে' বার করতে হল নর সিংহকে, সে তাকে জানুর উপরে রেখে দিবা রাত্রির সন্ধিক্ষণে নখ দিয়ে চিরে ফেললে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। মারতে হবেই। জীবন-মরণের দ্বন্দ্বে ছন্দ যোজনা করাই তো কবির কাজ। এই দ্বন্দ্বের অসংখ্য রূপ, অসংখ্য সম্ভাবনা, ছন্দও নানারকম"

"এসব কথা আমিই তো বলেছিলাম আপনাকে একদিন"

"বলেছিলে না কি? তা হবে। তোমার কথা আমি চুরি করছি, আবার আমার কথা তুমি প্রকাশ করছ। এই চলছে চিরকাল। চলবেও, সূর্য্যের আলো পড়বে কুঁড়ির ওপর, ফুল ফুটবে, পড়বে চাঁদের উপর, জ্যোৎস্না হাসবে, পড়বে মরুভূমির উপর মরীচিকা জাগবে। এই হচ্ছে—"

"চলুন, এই কবিতার ভাবে তন্ময় হয়ে ঘুরে আসি একটু—"

"চল—"

প্রজাপতি-যুগল বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইয়াই রূপান্তরিত হইল খদ্যোতে। তাহার পর পেচক-দম্পতীরূপে তাহারা অন্ধকারকে মুখরিত করিয়া চলিল। তাহার পর সহসা মহাশূন্যে উড়িয়া গেল। একটু পরে দেখা গেল দুইটি উল্কা অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

২৬

সুরঙ্গমা বলিল—"দেখুন, দেখুন, কি আশ্চর্য্য দু'টি উল্কা—"

চার্ব্বাক আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল। সত্যই উল্কা হইলে বিস্ময়কর। পাশাপাশি ছুটিয়া চলিয়াছে।

বলিল—"সম্ভবত উল্কা নয়, ফানুস"

"ফানুস? তা হতে পারে। কিন্তু এরকম ফানুসও দেখি নি কখনও। ঠিক পাশাপাশি উড়ে চলেছে, যেন দু'টি আলোর পাখী"

"চল, বাইরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। কেউ যদি হঠাৎ দেখে ফেলে, বিপদে পড়ে যেতে হবে।"

"চলুন। আপনার প্রাণের ভয় বড্ড বেশী দেখছি—"

"বেশী নয়, যতটুকু স্বাভাবিক, ততটুকু। তোমাদের উপনিষদের

ঋষিও বলেছেন ভয়ের তাড়নাতেই সমস্ত পৃথিবী চলছে। সূর্য্য তাপ দান করছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, ইন্দ্র নিজ কর্ত্তব্য করছে, এমন কি মৃত্যুও ভয়ে ধাবমান--"

"কার ভয়ে—"

ওঁরা যাঁকে ব্রহ্ম বলেছেন, যিনি উদ্যত বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর—"

"আপনার ব্রহ্মে বিশ্বাস নেই বুঝি"

চার্ব্বাক হাসিয়া বলিল--"তুমি যদি ব্রহ্মের প্রকাশ হও তাহলে বিশ্বাস আছে। কিন্তু অনাদি অনন্ত অখণ্ড অজ্ঞাত অমৃত অব্রণ, অকায় এই সব বিশেষণবিশিষ্ট যে আজগুবি ধাঁধার সৃষ্টি করে' ওঁরা বোকা লোকদের ভোলাচ্ছেন তাতে বিশ্বাস নেই"

সুরঙ্গমার চোখের কোণে চাপাহাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"চলুন তাহলে ঘরের ভিতরই ঢোকা যাক"

ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল এক কোণে কিছু শুষ্ক খড় গাদা করা রহিয়াছে। চার্ব্বাক ইহা দেখিয়া খুশী হইল।

"চল, ওর উপর উঠে দু'জনে পাশাপাশি বসা যাক—"

"আপনি বসুন"

"তুমি ?"

"আমি দুয়ারের কাছে বসছি। যদি কেউ এদিকে আসে, আপনাকে সাবধান করতে পারব"

"তুমি ভিতরে এসে কপাটে খিল বন্ধ করে' দাও"

"তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। ধরা পড়লে দু'জনেই মারা যাব"

"ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে কি"

"আছে বইকি। কুলিশপাণি আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন"

"বেশ, তবে তাই হোক। কিন্তু মনে হচ্ছে তোমাকে কাছে পেলে আমার বক্তব্যের যুক্তিটা আরও জোরালো হ'ত"

সুরঙ্গমার নয়নে আবার হাসির বিদ্যুৎ ঝলক তুলিল। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে বলিল—"যুক্তি যদি কিছু থাকে, কম জোরাল হলেও তা আমি মানব। বলুন, কি বলবেন—"

চার্ব্বাক খড়ের গাদার উপর উঠিয়া বসিল। তাহার পর বলিল—"আমার বক্তব্য তো আগেই বলেছি। তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই"

"কেন—"

"এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্য"

"মৃত্যুর হাত থেকে কেউ কি কাউকে বাঁচাতে পারে! মৃত্যুই তো আমাদের স্বাভাবিক পরিণাম।"

"কিন্তু অকাল মৃত্যু কি স্বাভাবিক ?"

"অকাল মৃত্যুও তো ঘটে। কত শিশু শৈশবেই মারা যায়, তা কি শোনেন নি"

"সে সব অকাল মৃত্যুও স্বাভাবিক। তা কারও ইচ্ছাকৃত নয়। তুমি যে মৃত্যু বরণ করতে যাচ্ছ তা' হত্যার নামান্তর"

"আত্মহত্যা বলতে পারেন, কিন্তু হত্যা নয়। কেউ জোর করে' আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে মারবার চেষ্টা করেনি। আমি স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিচ্ছি—"

"কেন"

"কুমার সুন্দরানন্দের মান বাঁচাবার জন্যে"

"তোমার মৃত্যু হলে তাঁর মান বাঁচবে কি করে' ?"

সুরঙ্গমা তখন মিম্মিরের কাহিনী বিবৃত করিল। করিয়া বলিল—"তানে যদি মিম্মিরের পারমার্থিক আনন্দের জন্য আত্মবলিদান দিতে পারে, তাহলে কুমারের জন্য আমিও পারি। তাছাড়া এও আমার মনে হল দেহটা যজ্ঞের আগুনে ছাই করে' দিয়ে তানে যদি মিম্মিরের

অন্তরে চিরস্থায়িনী হয়ে থাকে, আমিই বা কুমারের অন্তরে হব না কেন? আমিই কুমারকে তাই যজ্ঞের আয়োজন করতে উৎসাহিত করেছি। কুমার আমাকে জোর করে' বধ করেছেন—আপনার এ ধারণাটা ভুল"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণের জন্য তাহার যুক্তি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, ভাবিয়া পাইল না কি উপায়ে সে এই স্বেচ্ছাচারিণীর গতি-রোধ অথবা মতি-পরিবর্ত্তন করিবে। তাহার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত কল্পনা, সমস্ত শক্তি কিন্তু একাগ্র হইয়া উঠিল, যেমন করিয়া হোক ইহাকে বাঁচাইতে হইবে। শেষে শিশু যে সুরে আব্‌দার করে সেই সুরে সে সুরঙ্গমাকে বলিল—"আমার ধারণা হয়তো ভুল। কিন্তু আমি তোমাকে মরতে দিতে পারি না। তুমি আর থাকবে না, তোমাকে আর কখনও দেখতে পাব না—এ চিন্তাও আমার পক্ষে অসহ্য"

সুরঙ্গমা হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনার ব্যক্তিগত সুখের জন্যই তাহলে আমাকে বাঁচতে বলছেন, এর চেয়ে জোরালো যুক্তি আপনার আর কিছু নেই?"

"আমি চাই এর চেয়ে জোরালো যুক্তি পৃথিবীতে অন্য আছে কি? আমাকে আর আমার চাওয়াকে কেন্দ্র করেই তো সংসার—"

সুরঙ্গমা হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল ক্ষণকাল। তাহার পর বলিল—"মাপ করবেন মহর্ষি, যা বলছি তা হয়তো রূঢ় শোনাবে, কিন্তু তা না বলেও পারছি না। হয়তো চাওয়াটাই সংসারে বড় যুক্তি, কিন্তু চাইলেই কি পাওয়া যায়? দাম না দিলে কিছুই পাওয়া যায় না। আমি একজন সামান্যা নটী, আমাকেও কুমার অনেক দাম দিয়ে তবে পেয়েছেন। আপনি আমাকে চাইছেন, কি দাম দেবেন বলুন।"

ব্যাপারটা মূল্য-দস্তুরের স্তরে নামিয়া আসিবে চার্ব্বাক তাহা কল্পনা করে নাই। একটু বিব্রত হইয়া সে বলিল—"অর্থের দিক দিয়ে সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব না তা আমিও জানি, তুমিও জান। তাই কি আমাকে ব্যঙ্গ করছ? এটা কি তুমি জান না যে আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গানের মতো তুমিও অমূল্য? ধনীরা অর্থ ব্যয় করে' আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গান উপভোগ করেন, কিন্তু দরিদ্ররা কি তা বলে' বঞ্চিত হয়?"

সুরঙ্গমা পুনরায় হাসিমুখে উত্তর দিল—"আলো, বাতাস, ফুল, পাখীর গানের সঙ্গে আমার তুলনা হয় না। ওরা স্বাধীন, আমি পরাধীন, সীমাবদ্ধ। বাজারের পণ্য আমি, ক্রেতাই আমার ভাগ্য নির্ণয় করে। যে মহত্ত্বের আমি অধিকারী নই, তা আমার উপর আরোপ করে' আমাকে ভুল বুঝবেন না মহর্ষি"

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

তাহার পর সহসা প্রশ্ন করিল—"কত অর্থের বিনিময়ে তুমি আমার কাছে আত্মসমর্পণ করবে? দেখি চেষ্টা করে' সংগ্রহ করতে পারি কি না। অবন্তীনগরের রাজপুত্র আমার অনুরাগী, সে হয়তো আমার সাহায্য করবে"

"আমি অর্থ চাই না। কুমার আমাকে এত অর্থ, এত মণি মুক্তা অলঙ্কারাদি দিয়েছেন যে ও সবের সম্বন্ধে আমার আর মোহ নেই। আপনার যদি প্রয়োজন থাকে আমার কাছ থেকেই নিতে পারেন কিছু। আর একটা প্রশ্ন মনে জাগছে, যদি অভয় দেন বলি—'

"বল—"

"রাগ করবেন না তো"

"তোমার কোনও কথাতেই রাগ করব না। তোমার উপর রাগ করবার ক্ষমতা আমার নেই"

"আমার চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী, ঢের বেশী গুণবতী নারী অনেক আছে। যে অবন্তীনগরের আপনি নাম করলেন সেই অবন্তীনগরেই অপূর্ব্বা নামে আমার এক বান্ধবী আছে। সে-ও নটী। প্রচুর অর্থ পেলে সে আপনার কাছে এসে থাকবে। কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতের প্রণয়িনী হবার আকাঙ্ক্ষা তার অনেকদিন থেকে। আমি আপনাকে অর্থ দিচ্ছি, একটা চিঠিও লিখে দিচ্ছি। তার কাছেই যান আপনি।"

চার্ব্বাক স্থির কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি তোমাকেই চাই"

"আমার প্রতি এ পক্ষপাত কেন"

"আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমার বদলে অন্য কারও কথা চিন্তা করতে পারি না আমি"

ঠিক এই সময়ে দূরে কাহার যেন পদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সুরঙ্গমা নিম্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"আপনি ওই খড়ের গাদার মধ্যে ঢুকে পড়ুন। আমি উঠে গিয়ে দেখি কে আসছে"

সুরঙ্গমাকে বেশীদূর যাইতে হইল না। একটু দূর গিয়াই সে কুলিশপাণিকে দেখিতে পাইল। কুলিশপাণিও আগাইয়া আসিয়া অভিবাদন করিল।

"আপনি এখানে! অথচ আপনার সন্ধানে আমি সমস্ত বন তোলপাড় করে' বেড়াচ্ছি"

"কেন—"

"কুমারের আদেশে। তিনি আপনাকে খুঁজে না পেয়ে অধীর হয়ে উঠেছেন। কোথা গিয়েছিলেন আপনি?"

"কাছাকাছিই ছিলাম—কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার"

"দেখা হয়েছে?

"হ্যাঁ—"

"তাহলেই তো মুশকিল"

কুলিশপাণি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিল।

"কিসের মুশকিল—"

"আপনি অন্তর্দ্ধান করুন এইটেই আমার আন্তরিক ইচ্ছে ছিল। আপনাকে খুঁজছিলাম বটে কিন্তু এতক্ষণ আপনাকে না পেয়ে—একটুও দুঃখ হয়নি, বরং আনন্দই হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, ফাঁদের কবল থেকে হরিণী সত্যিই বুঝি পালাল—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কুলিশপাণি সহসা থামিয়া গেল, আড়চোখে একবার সুরঙ্গমার দিকে চাহিয়া, পুনরায় গুম্ফপ্রান্তে মনোনিবেশ করিল। সুরঙ্গমার নয়নের মোহিনী দৃষ্টি কুলিশপাণির এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া আরও মোহিনী হইয়া উঠিল।

"আমি দুর্ব্বলা নারী, আপনাদের কবল থেকে পালাবার শক্তি কি আমার আছে? তাই আত্মসমর্পণ করেছি—"

কুলিশপাণি নির্নিমেষ নয়নে সুরঙ্গমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আপনি দুর্ব্বলা নন। আপনি শক্তির উৎস। কুমার সুন্দরানন্দের বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে তাই তিনি এই নৃশংস যজ্ঞের আয়োজন করেছেন। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনাকে আমি রক্ষা করতে পারি—"

"কি করে'—?"

"এখনি চলুন আপনি আমার সঙ্গে। কাছেই গাছতলায় আমার ঘোড়া বাঁধা আছে। আপনাকে অবিলম্বে আমি স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারি। মহেশপুর গ্রামে আমার পরিচিত পরিবার আছে একটি, সেখানে আপাতত আপনি থাকতে পারেন। যাবেন? আসুন তাহলে"

সুরঙ্গমা আনতনয়নে স্মিতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

'ইতস্তত করছেন কেন? আমি আশ্বাস দিচ্ছি ভয়ের কোনও কারণ নেই"

"আমি আমার ভয়ের কথা ভাবছি না। আমি তো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতই হয়ে আছি। আমি ভাবছি আপনার কথা। আপনি কেন এতবড় দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন? আপনার স্বার্থ কি!"

কুলিশপাণি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া গাঢ় কণ্ঠে বলিল, "আমার স্বার্থ তুমি। 'আপনি' সম্বোধন করে' তোমাকে আমার সম্বন্ধে আর ভুল ধারণা করবার সুযোগ দেব না। তোমাকে আমি ভালবাসি সুরঙ্গমা। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেদিন থেকেই ভালবেসেছি। এতদিন একথা তোমাকে বলবার সাহস হয়নি, কারণ জানতাম তুমি কুমারের প্রিয়তমা। এখন সে ভুল ধারণা ভেঙেছে। এখন দেখছি সামান্য পশুর মতো কুমার তোমাকে বলিদান দিতেও ইতস্তত করছেন না। তোমাকে দূর থেকে দেখেও এতদিন যে আনন্দ পেয়েছি সে আনন্দও আর পাব না। তাই তুমি পালিয়েছ শুনে খুব খুশী হয়েছিলাম। কুমারের আদেশে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ঠিক করেছিলাম তোমার নাগাল পেলে কোনও নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব তোমাকে"

সুরঙ্গমার অধরে মৃদু হাসি কম্পিত হইতে লাগিল। নয়ন যুগলে যে কৌতুক-ছটা বিকীর্ণ হইল তাহা অপরূপ।

"আপনার অদম্য সাহস অসীম শক্তি যে আমার মতো সামান্যা একজন নর্তকীর জন্য উদ্যত হয়েছে এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি যাব না। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আপনার মতো মহানুভব বীরকে বিপন্ন করতে চাই না—"

"আমি বিপন্ন হব কেন। আমি কুমার সুন্দরানন্দ হয়তো নই, কিন্তু তোমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য আমার আছে। আমিও

ক্ষত্রিয়, আমিও রাজপুত্র। কুমারের অধীনে সেনানায়কত্ব করছি অভাবের তাড়নায় নয়, শিক্ষার জন্য। আমার পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, এবার বানপ্রস্থে যেতে চান। কিছুদিন পরে আমাকে গিয়ে রাজ্য-ভার নিতে হবে। তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তোমার মর্য্যাদার কোনও হানি হবে না। আমার দেহ মন সম্পত্তি সমস্তই তোমার সুখ-সম্পাদনে সর্ব্বদা উৎসুক থাকবে”

“কোন দেশে আপনার বাড়ি? আমি তো আপনার সম্বন্ধে কিছুই জানি না”

“আমি পৌণ্ড্র রাজকুমার। কুলিশপাণি আমার স্বয়ং-গৃহীত নাম। আমাদের দেশে চল, আমার পূর্ণ পরিচয় পাবে।”

“কুমারের সঙ্গে এ নিয়ে কলহের সম্ভাবনা কি নেই? আমাকে কেন্দ্র করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কলহ বাধুক এ আমি চাই না। আমি ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, যা হবার তাই হোক”

“কলহের কোনও সম্ভাবনাই নেই। আমি যে তোমাকে নিয়ে গেছি এ কথা কুমার জানবে কি করে? কুমার জানুক তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছ। তারপর কিছুদিন কেটে গেলে তোমার সম্বন্ধে কুমারের সম্ভবত ঔৎসুক্যই আর থাকবে না। তুমি যেমন এসে নিরালার স্থান অধিকার করেছ, আর কেউ এসে তেমনি তোমার স্থান অধিকার করবে।···কুমার হৃদয়হীন। দেখছ না, তোমাকে যজ্ঞের পশুরূপে ব্যবহার করছেন? আমি তোমাকে মাথায় করে' সসম্মানে রাখব। সুরঙ্গমা, তুমি চল আমার সঙ্গে।” সুরঙ্গমার নয়নের কৌতুক ছটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

“কথা বলছ না যে—”

“আমাকে ভাববার একটু সময় দিন”

“দেবার মতো সময় তো আর নেই—”

"আপনি এখন যান। আমি যদি আপনার সঙ্গে যাওয়া স্থির করি তাহলে শেষ রাত্রে আপনার শয়নকক্ষে যাব। শয়নকক্ষের দ্বারটি খুলে রাখবেন—"

কুলিশপাণির ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল।

"এখন আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি আছে—"

"আছে। কুমারকে আমি কথা দিয়ে এসেছি না বলে' কোথাও যাব না"

"যিনি যজ্ঞের নামে তোমাকে পশুর মতো বধ করতে চাইছেন—"

"ওটা ভুল ধারণা। তিনি আমাকে যজ্ঞে আহুতি দিতে চান না। সে অনেক কথা, পরে শুনবেন"

"পরে শোনবার ধৈর্য্য আমার নেই। আমি তোমাকে চাই সুরঙ্গমা। আমার আশা সুফল হবে কিনা তা আমি এখনই শুনতে চাই"

"আমার দেহটা পেলেই আপনি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে তা এখুনি পেতে পারেন, সামান্যা নর্ত্তকীর দেহটাকে অনেকেই নেড়ে চেড়ে দেখেছেন কিছুদিন, কুমারও একথা জেনেই আমাকে গ্রহণ করেছিলেন, এখনও যদি তিনি শোনেন যে তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সেনাপতি কুলিশপাণি আমার দেহটা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন তাহলে তিনি রাগ করবেন না। একটু কৌতুকবোধ করতে পারেন হয়তো। কিন্তু আপনি আমাকে যদি চান, যে আমি আমার দেহ থেকে স্বতন্ত্র, তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে"

কুলিশপাণি নীরবে কিছুক্ষণ গুম্ফ প্রান্ত পাকাইল।

তাহার পর বলিল—"অপেক্ষাই করব। কবে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে"

"আজই শেষ-রাত্রে"

"আমার শয়নকক্ষের দ্বার খুলে রাখব ?"

"রাখবেন"

কুলিশপাণি চলিয়া গেল।

সুরঙ্গমাও পুনরায় চার্ব্বাকের ঘরে প্রবেশ করিল।

সুরঙ্গমা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল চার্ব্বাক খড়ের গাদার উপর হইতে নামিয়া আসিয়াছে।

"নেমে পড়লেন কেন"

"তোমরা কি কথা বলছ তা শোনবার জন্যে। কুলিশপাণি এসেছিল, না ?"

"হ্যাঁ। ওর প্রস্তাব শুনলেন তো"

"শুনেছি"

"বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন। আপনার বক্তব্যটাও শুনব"

চার্ব্বাক নীরবে তবু দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখে কোনও কথা জোগাইল না।

"আমার বক্তব্য তো তোমাকে বলেছি। আমি তোমাকে চাই"

"আমাকে অনেকেই চেয়েছে, এখনও অনেকেই চায়। তাই আমি ঠিক করেছি—সর্ব্বোচ্চ মূল্য যে দেবে তার কাছেই যাব আমি—"

"কুলিশপাণি তোমাকে যে মূল্য দিতে চাইছে তা কি তোমার কাছে যথেষ্ট মনে হচ্ছে না ?"

"তার আগে একটা প্রশ্ন আপনাকে করি। আমি যদি কুলিশ-পাণির সঙ্গে চলে' যাই তাহলে কি আপনি খুশী হবেন ?"

"না"

"কেন, হওয়া তো উচিত। কুলিশপাণিও আমাকে বাঁচাতে চাইছেন। আমাকে রক্ষা করবার সামর্থ্য তাঁর আছে। আপনিও তো বললেন—আমাকে এই শোচনীয় মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার

জন্যেই আপনি এসেছেন এখানে। কিন্তু ওঁর মতো সামর্থ্য আপনার নেই। আমাকে বাঁচানোই যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কুলিশপাণির সঙ্গে যেতে দিতে আপত্তি কি ?”

সুরঙ্গমার নয়নে অধরে যে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল অন্ধকারে চার্ব্বাক তাহা দেখিতে পাইল না। কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরে যে হাসির তরঙ্গ লাগিয়াছিল, তাহাতে চার্ব্বাক বুঝিতে পারিল সুরঙ্গমা ব্যঙ্গ করিতেছে।

“আপত্তি কি তা কি বুঝতে পার নি এখনও ? আমি অসহায়, আমাকে ব্যঙ্গ কোরো না সুরঙ্গমা”

আপনি পণ্ডিত লোক, আপনাকে ব্যঙ্গ করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই মহর্ষি। আপনি নিজেকে অসহায় বলে’ বর্ণনা করছেন কেন। আপনার অসহায় অবস্থা কি আপনার উদ্দেশ্যের অনুকূল ?”

“বুঝতে পারছি না ঠিক—”

“আপনি কি অনুকম্পা চান ? অসহায় মানুষকে দেখে লোকের মনে অনুকম্পা জাগে, প্রেম জাগে না”

“প্রেমই আমাকে অসহায় করেছে সুরঙ্গমা”

“আমি যতটুকু বুঝি—প্রেম মানুষকে অসহায় করে না, শক্তিমান করে। প্রেমে পড়লে মানুষ সব কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, এমন কি জীবনকেও। আমি সুন্দরানন্দকে ভালবাসি বলেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আপনি অসহায় এ বোধ সত্যিই যদি আপনার মনে জেগে থাকে তাহলে আমার মনে হয় আপনি প্রেম নয়—অন্য কোন কিছুর প্রকোপে পড়েছেন”

“আমি তোমার প্রেমেই পড়েছি সুরঙ্গমা। কিন্তু বুঝতে পারছি না—কি করে’ সেটা প্রমাণ করব তোমার কাছে, তাই অসহায় বোধ করছি”

"মহর্ষি আপনার মতো পণ্ডিতের নিশ্চয়ই একথা জানা আছে যে একটিমাত্র কষ্টিপাথরেই প্রেমের যাচাই হ'তে পারে এবং তা সকলেরই আয়ত্তাধীন"

"কি সে কষ্টিপাথর"

"ত্যাগ"

"কিন্তু ত্যাগ করবার মতো আমার তো কিছুই নেই। সুন্দরানন্দ বা কুলিশপাণির ত্যাগ করবার মতো অর্থ আছে, কিন্তু আমি দরিদ্র"

"কিন্তু যে জিনিস সকলেরই আছে তা আপনারও আছে, তার তুলনায় অর্থ অকিঞ্চিৎকর"

"কি সে জিনিস"

"আপনার প্রাণ, আপনার জীবন"

"আমাকে প্রাণ-ত্যাগ করতে বলছ ? আমি মরে' গেলে তোমাকে পাব কি করে' ? মরে গেলে তো সব শেষ হয়ে গেল—"

"আমাদের এই ধারণা আছে বলেই তো প্রাণত্যাগ শ্রেষ্ঠ ত্যাগ"—

চার্ব্বাক কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিল।

তাহার পর গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"আমাকে ভুল বোঝো না সুরঙ্গমা। আমি প্রাণত্যাগ করতে ভীত নই, প্রাণের মায়া ত্যাগ করেই আমি তোমার সন্ধানে এসেছি। কিন্তু আমি ইহলোককেই বিশ্বাস করি, পরলোকে আমার আস্থা নেই। আমি ইহজীবনেই তোমাকে পেতে উৎসুক, প্রাণত্যাগ করেও তোমাকে ইহজীবনে পাবার সম্ভাবনা যদি থাকত, মানে—এ অসম্ভব যদি সম্ভব হ'ত, তাহলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করতাম। তোমাকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলেই প্রাণের মায়া ত্যাগ করে' এখানে এসেছি"

"কিন্তু আমাকে পেতে হলে এখানে এলেই শুধু হবে না, মূল্য দিতে হবে—"

"যে মূল্য আমার কাছে তুমি দাবী করছ, কুমার সুন্দরানন্দের কাছে তা কি দাবী করেছ কখনও ?"

"দাবী করবার দরকার হয় নি। আমার সুখের জন্য আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় অনেকবার নিজের জীবন বিপন্ন করেছেন তিনি। এই সেদিনই তিনি আমাকে জীবন্ত কস্তুরী-মৃগ স্বহস্তে ধরে' দেবেন বলে' গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন, সে অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি আছে জেনেও প্রবেশ করেছিলেন, যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে এ আশঙ্কা তাঁকে নিবৃত্ত করেনি—"

"আমারও তো যে কোনও মুহূর্ত্তে প্রাণান্ত ঘটতে পারে তবু আমি তোমার জন্যে এসেছি—"

"আপনি এসেছেন নিজের স্বার্থে। আমার সুখের জন্য নয়, নিজের সুখের আশায়—"

"তুমি যদি একান্তভাবে আমার হও তাহলে আমিও বারম্বার তোমার জন্য জীবন বিপন্ন করে কৃতার্থ হব। তুমি বিশ্বাস কর আমাকে, চল আমার সঙ্গে—পরীক্ষা করে' দেখ"

"ক্ষমা করবেন মহর্ষি, মূল্য না পেলে আমি যেতে পারব না।"

"কিন্তু যে মূল্য তুমি চাইছ, তা আমি দেবই বা কি করে ? আত্মহত্যা করব ?"

"আপনি আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ পেলেই আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হব—"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া রহিল।

সুরঙ্গমা বলিল—"প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হলেই সব সময় প্রাণ যায় না। যুদ্ধে সব সৈন্যই মরে না। আপনিও হয়তো বেঁচে যেতে পারেন। কিন্তু আপনি আমার জন্য মরতে প্রস্তুত আছেন এর নিঃসংশয় প্রমাণ চাই"

"আমার মুখের কথায় তোমার সংশয় যদি না ঘোচে কি করে' ঘুচবে, বল—"

"এই যজ্ঞে আপনি আত্মাহুতি দিতে রাজী আছেন? যদি রাজী থাকেন, আমি বেঁচে যেতে পারি! মহর্ষি পর্ব্বত না কি বলেছেন আমার বদলে অন্য কেউ যদি আত্মাহুতি দিতে সম্মত হয় আমাকে তিনি ছেড়ে দেবেন"

"কিন্তু তুমি তো বলছ স্বেচ্ছায় তুমি যজ্ঞের বলি হয়েছ"

"হয়েছি। কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত যদি আমাকে মনোনীত না করেন, তা হলে আমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। তিনিই এ যজ্ঞের ব্রহ্মা"

"মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে মনোনীত করবেন?"

"না-ও করতে পারেন। যদি না করেন আপনি বেঁচে যাবেন"

"যদি বেঁচে যাই তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসবে?"

"আসব"

"কুমার তোমাকে ছেড়ে দেবেন?"

"দেবেন। তিনি আমার কোন কাজেই বাধা দেন না কখনও"

"চার্ব্বাক কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিল। তাহার মনে হইল যজ্ঞীয় পশুর যে সব খুঁত থাকিলে তাহা যজ্ঞীয় পশু রূপে নির্ব্বাচিত হয় না, সে সব খুঁত তাহার শরীরে আছে। সুতরাং কুসংস্কারাচ্ছন্ন মহর্ষি পর্ব্বত যজ্ঞের বলি হিসাবে তাহাকে নির্ব্বাচন করিবে না। কিন্তু মুশকিল হইবে ধারামতীর ব্যাপারটার জন্যে।"

"তোমাকে বাঁচাবার জন্যে আমি আত্মবলি দিতে প্রস্তুত আছি! এ সব ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, কেবল তোমার জন্যে আমি এতে রাজী হচ্ছি। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রাখবে? কুমার সুন্দরানন্দের সঙ্গে আমি গোপনে দেখা করতে চাই একবার, ধারামতীর সম্পর্কে আমার নামে যে অভিযোগ আছে সে সম্বন্ধে তাঁর

সঙ্গে আমি আলোচনা করব একটু। আমার বিশ্বাস সব শুনলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন"

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া উত্তর দিল।

"কুমারকে আমি নিশ্চয়ই অনুরোধ করব। কুমারকে যা বলতে চান তা আমাকেও বলতে পারেন, আমি কুমারকে গিয়ে তা এখনই জানিয়েও দিতে পারি"

"আমি কুমারকে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে ধারামতী নিজে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করেছিল। কিছুদিন পরে অনিবার্য্যভাবে যা ঘটল তার জন্যে আমি তাকে বিবাহও করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাতে সে রাজি হয় নি। এর জন্য কুমার আমাকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলেন। তাঁর সে আদেশ আমি বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছি। আমি কেবল জানতে চাই আর কতকাল আমাকে অপরাধী বলে' গণ্য করা হবে? সারাজীবন কি রাজরোষ থেকে আমি অব্যাহতি পাব না?"

"মহর্ষি পর্ব্বত যদি যজ্ঞীয় বলি হিসাবে আপনাকে গ্রহণ করেন তাহলে কুমারের সঙ্গে এ সব আলোচনা কি নিরর্থক নয়?"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন একথাটা না জানলে মরেও আমার শান্তি হবে না"

"আপনার মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তো সব শেষ হয়ে যায়। তখন তো শান্তি-অশান্তি কিছুই থাকবার কথা নয়।"

চার্ব্বাক পুনরায় অনুভব করিল, সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের সুর লাগিয়াছে। একটু হাসিয়া বলিল—"আমার মত তাই বটে। মৃত্যুর পরে কি ঘটবে তা জানি না, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে ধারামতী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সত্যটা কুমারকে আমি জানিয়ে দিতে চাই। ক্ষমা করা না করা অবশ্য তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কথাটা তাঁকে বলতে পারলে আমি

তৃপ্তি পাব। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু যে পরলোকে বিশ্বাস করে না, তার কাছে ওই কিছুক্ষণেরই মূল্য অনেক"

"বেশ আমি যাচ্ছি তাহলে। আপনি এইখানেই অপেক্ষা করবেন কি?

"আর কোথায় যাব"

"কপাটটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিন তাহলে"

চার্ব্বাক ভিতর হইতে কপাটটা বন্ধ করিয়া দিল।

কুমার সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়াছিলেন। সুরঙ্গমা প্রবেশ করিতেই প্রশ্ন করিলেন—"তুমি আবার কোথায় গিয়েছিলে?"

সুরঙ্গমা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"অভিসারে। আমি আশা করি নি যে এত রাত্রে আপনি আসবেন"

কুমারের গম্ভীর মুখও হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"কে সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ জানতে পারি কি"

"আপনি যদি জানতে চান, নিশ্চয় জানাব। কিন্তু একটি অনুরোধ আছে—"

"বল, তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করবার সামর্থ্য আমার নেই"

"তাকে ক্ষমা করতে হবে"

"তুমি যাকে কৃপা করেছ আমি কি তার উপর রাগ করতে পারি! নিশ্চয়ই ক্ষমা করব। কে তিনি"

"মহর্ষি চার্ব্বাক"

"বল কি! তিনি এখানে এলেন কি করে?"

সুরঙ্গমা তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। সমস্ত শুনিয়া সুন্দরানন্দ অনেকক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার

পর বলিলেন—"মহর্ষি পর্ব্বতের কন্যা ধারামতীও তো এখানে এসেছেন। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখা কি উচিত নয়—চার্ব্বাক যা বলেছেন তা সত্য কি না"

"তাকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মহর্ষি চার্ব্বাক যা বলেছেন তা সত্য। মহর্ষি চার্ব্বাক সত্যিই ধারামতীকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, ধারামতীও মহর্ষি চার্ব্বাককে এখনও ভালবাসে"

"তাহলে বিবাহ না হওয়ার কারণ কি"

"কারণ আমি। ধারামতীকে মহর্ষি চার্ব্বাক অকপটে বলেছিলেন যে তাকে বিবাহ করতে চাইছেন কর্ত্তব্যবোধে, কিন্তু তিনি ভালবাসেন আমাকে"

"সত্যিই তিনি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ?"

"সত্যিই। আমাকে বাঁচাবার জন্য স্বেচ্ছায় তিনি যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দিতেও প্রস্তুত আছেন। অবশ্য, মহর্ষি পর্ব্বত যদি তাকে নির্ব্বাচন করেন"

"মহর্ষি পর্ব্বত বলি দেবার জন্য শত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে একটি সুলক্ষণ বন্য বালককে কিনে এনেছেন। সে বালক এবং তার পিতামাতা এতে স্বেচ্ছায় রাজী হয়েছে। তাদের সঙ্গে একটু আগে আমি নিজে কথাবার্ত্তা বলেছি। এই খবরটা তোমাকে দেবার জন্যেই এত রাত্রে এসেছি তোমার কাছে। ব্যাপারটা বেশ সরল হয়ে এসেছিল, মহর্ষি চার্ব্বাক আসাতে কিন্তু সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আবার। মহর্ষি চার্ব্বাক তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হতে পারেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তোমার মনের অবস্থাটা কি—তুমিও কি তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী ?"

সুরঙ্গমার চোখের দৃষ্টিতে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"আপনার কি মনে হয় ?"

নারী-চরিত্রের জটিলতা ভেদ করবার সামর্থ্য আমার নেই। "স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"—কবির এ কথা আমি মানি। তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম, তুমি আমাকে ছেড়ে চলে যাও, তোমার স্মৃতিটুকু নিয়েই ধন্য হয়ে থাকব। তোমাকে বোঝাবার চেষ্টাও করব না, তোমাকে বাধাও দেব না। প্রহেলিকাকে প্রহেলিকা বলে' স্বীকার করাই ভালো"

সুরঙ্গমা সহসা সুন্দরানন্দের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল—"না আপনি আমাকে বাধা দিন. আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। আমি প্রহেলিকা নই—সুরঙ্গমা, আপনারই সুরঙ্গমা—"

আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া সুন্দরানন্দ বলিলেন—"চার্ব্বাকের মুণ্ডপাত করবার ব্যবস্থা করি তাহলে—? তুমি যা চাও তাই হবে"

"আমি আমার কথা রাখতে চাই। উনি আমাকে বাঁচাবার জন্য যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছেন, আমি দেখতে চাই মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও ওঁর এ মনোভাব বদলায় কি না। সম্ভবত মহর্ষি পর্ব্বত ওঁকে মনোনীত করবেন না, কিন্তু আমি দেখতে চাই উনি ওঁর প্রতিশ্রুতি শেষ পর্য্যন্ত পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকেন কি না"

"ধর যদি থাকেন—"

"তাহলে আমি ওঁর সঙ্গে চলে যাব!"

"তার পর?"

"তার পর ফিরে আসব আবার। কিছুক্ষণ পরেই উনি বুঝতে পারবেন আমাকে সঙ্গিনীরূপে পাবার ক্ষমতা ওঁর নেই। সেই কিছুক্ষণ ছুটি দিতে হবে আমাকে"

"গোড়াতেই তো বলেছি, তুমি যা চাও তাই হবে। তোমার এ খেয়াল হ'ল কেন হঠাৎ"

সুরঙ্গমা মুচকি হাসিয়া বলিল—"শক্ত সমর্থ মানুষগুলোকে নিয়ে খেলা করতে বড় ভাল লাগে। মিশ্মির সিংহকে ফাঁদে ফেলে যে মজা দেখছেন, মানুষকে সেই রকম ফাঁদে ফেলে আমি ঠিক সেই রকম মজা দেখতে চাই। আপনি আমাকে মৃগ, পারাবত, শুক অনেক উপহার দিয়েছেন। কিন্তু শক্ত সমর্থ বিদ্বান প্রেমিক পুরুষ উপহার দেন নি কখনও। সেই উপহার আমি নিজেই জোগাড় করেছি আজ। আপনি অনুমতি দিন তাকে নিয়ে খেলা করি একটু"

সুন্দরানন্দ সুরঙ্গমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বহুবার চুম্বন করিলেন। তাহার পর বলিলেন—"অনুমতি দিলাম। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই"

যে উল্কা দুইটি পাশাপাশি দ্রুতবেগে আকাশ অতিক্রম করিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটি বলিল—"চার্ব্বাক এইবার সম্পূর্ণ বিগলিত হয়েছে। চল, এইবার দেখা যাক, ওর বিশ্বাস অটল আছে কি না—"

দ্বিতীয় উল্কা বলিল—"কি বিশ্বাস—"

"চতুরাননবিশিষ্ট কোনও দেবতা নেই—এই বিশ্বাস। বুদ্ধির প্রাখর্য্য আস্ফালন করে' ও সুরঙ্গমাকে ভোলাতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখছি সুরঙ্গমাই ওকে ভুলিয়েছে। যজ্ঞের হাড়কাঠে ও গলা পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিতে রাজি হয়েছে। এখন চল দেখা যাক —চতুরানন দেবতা সম্বন্ধে তার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসটার অবস্থা কি রকম—"

"কি করে' দেখবেন সেটা—"

"তুমি কৃপা করলেই হয়। তুমি সুরঙ্গমা সেজে চল ওর কাছে। আমি অদৃশ্যরূপে তোমার সঙ্গে থাকি"

কিন্তু আসল সুরঙ্গমা যদি এসে পড়ে ?"

"সে এখন আসবে না। সুন্দরানন্দের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে সে এখন সপ্তম স্বর্গে বাস করছে। তার পরে সেখান থেকে নেবে সে যাবে কুলিশপাণির ঘরে। কুলিশপাণি দরজা খুলে বসে আছে—"

"বেশ চলুন—"

উল্কা দুইটি বনভূমি লক্ষ্য করিয়া নামিতে লাগিল।

•

চার্ব্বাক অন্ধকারে একা বসিয়া মৃত্যু-চিন্তা করিতেছিল। ভাবিতেছিল, সুরঙ্গমাকে যদি জীবনের মূল্যেই কিনিতে হয়, তাহাকে পাইবার পরেই যদি জীবনাবসান ঘটে তাহা হইলে মৃত্যু-নামক যে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে তাহাকে অচিরাৎ উত্তীর্ণ হইতে হইবে তাহার স্বরূপ কি প্রকার হওয়া সম্ভব। ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ উপাদানের সমন্বয়ে আমাদের দেহ নির্ম্মিত—ইহা ছাড়া আর কিছু নাই, এতকাল ইহাই সে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। মৃত্যুর পর দৈহিক পঞ্চভূতের সমন্বয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকৃতির বিরাট পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে এই ধারণার স্বপক্ষেই সে এতকাল নানাযুক্তি আহরণ করিয়া আসিয়াছে, এই যুক্তিরই নির্দ্দেশে তাহাকে বিশ্বাস করিতে হইয়াছে জীবনকে নানাভাবে উপভোগ করাই জীবনের লক্ষ্য ও ধর্ম্ম। এই লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়াই পুরুষকার, এই ধর্ম্ম আচরণই স্বাভাবিকভাবে আনন্দলাভের উপায়। এই মর্ত্ত্যেই স্বর্গ নরক বর্ত্তমান। কামনার পরিতৃপ্তিই স্বর্গ। অপরিতৃপ্ত ক্ষুধা-কামনার যন্ত্রণাই নরক। যেমন করিয়াই হোক ক্ষুধা ও কামনাকে তৃপ্ত করিতে হইবে, ঋণ করিয়াও ঘৃত পান করা অবিধেয় নহে—এই নীতি অনুসরণ করিয়া এতকাল সে চলিয়াছে। এই পথে চলিতে চলিতেই

সে আজ জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়া আজ সহসা যেন বলিতেছে, আমরা বিভিন্ন নহি, আমরা পরস্পরের পরিপূরক, জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দলাভ করিবার জন্য মৃত্যুকেই বরণ করিতে হয়, সুরঙ্গমা মায়াবিনী রাক্ষসী নহে, সে তোমার প্রেয়সীও নহে, সে তোমার গুরু। তুমি এতকাল জীবনকেই একমাত্র সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলে, সুরঙ্গমা আজ তোমার এই মহাভ্রান্তি অপনোদন করিয়াছে, সে তোমাকে আজ অর্দ্ধ সত্য হইতে পূর্ণ সত্যে উত্তীর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ জীবন ত্যাগ করিয়াই লাভ করিতে হয়, মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, রূপান্তর। সুরঙ্গমা আনন্দ-স্বরূপ। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধিতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না, তাই সে তোমাকে মৃত্যুর অনির্দ্দিষ্ট বৃহত্বে লইয়া যাইতে চাহিয়াছে। তাহাকে বাধা দিও না।

চার্ব্বাক ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া ভাবিবার চেষ্টাও করিতে লাগিল। সুরঙ্গমার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে তাহার জীবনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা মনে পড়িল। অদ্ভুত সুরা-পান করিয়া সেই অদ্ভুত স্বপ্ন, গুণপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ, জালার ভিতর প্রবেশ করিয়া যজ্ঞস্থলে আগমন, অরণ্যে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান, বন্দী সিংহ, অসংখ্য মশক···একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়া যে জীবন সে যাপন করিয়াছে তাহাকে কোনমতেই সুস্থ জীবন বলা চলে না। তবে কি সে অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে? প্রেমকে অনেক কবি ব্যাধি আখ্যা দিয়াছেন। এই প্রেম-ব্যাধিই কি তাহার চিন্তাশক্তিকে হরণ করিয়া তাহার দুর্ব্বল কল্পনায় প্রলাপের মোহ সৃজন করিতেছে? সুরঙ্গমা বলিয়াছিল সে সুন্দরানন্দের কুল-দেবতা

ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। তাহার এই বিশ্বাসকে খণ্ডন করিবার জন্য যে যুক্তি-জাল সে বিস্তার করিয়াছিল সে জালে সুরঙ্গমা ধরা পড়ে নাই, সে নিজেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার নিদ্রিত চেতনা যে বিচিত্র স্বপ্নলোক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার প্রভাব সে যেন কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তাহার মনে হইতেছিল সে যেন জাগ্রতে স্বপ্ন দেখিতেছে, স্বপ্নে জাগরণ করিয়া রহিয়াছে। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব যে একেবারে অসম্ভব একথা বলিবার মতো মনের জোর তাহার যেন আর নাই। সুরঙ্গমার মতো রূপসী রসিকা প্রণয়ের প্রতিদানে তাহাকে যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া বলিদান দিতে চাহিতেছে—ইহার অপেক্ষা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অস্তিত্ব কি বেশী অসম্ভব? সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। যুক্তি, চিন্তা, স্বপ্ন, কল্পনা সব যেন জট পাকাইয়া একাকার হইয়া যাইতেছে। কেবল একটি কথাই মনের মধ্যে ধ্রুবতারার মতো অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে—যেমন করিয়া হোক, যে মূল্যেই হোক, সুরঙ্গমাকে পাইতেই হইবে।

চার্ব্বাক যে ঘরে বসিয়াছিল তাহার দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। সেই বন্ধদ্বারের বাহিরে নিঃশব্দ চরণে একটি পরম রূপবান যুবক ও পরম রূপবতী যুবতী আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বাহিরে তখন গভীর রাত্রি থমথম করিতেছে।

যুবক বলিলেন—"বাণী সূক্ষ্মদেহ ধারণ কর। আমি তোমার মধ্যে ঢুকি"

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উভয়েই স্বচ্ছ আলোক-শিখায় রূপান্তরিত হইলেন। একটি আলোক-শিখা আর একটি আলোক-শিখায় মিশিয়া গেল। মিলিত আলোক-শিখাটি পুনরায় মানবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। সুরঙ্গমার মূর্ত্তি।

দ্বারে করাঘাত শুনিয়া চার্ব্বাক উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কে—"

"কপাট খুলুন। আমি এসেছি"

"কে, সুরঙ্গমা?"

"কপাট খুললেই দেখতে পাবেন। দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি খুলুন"

চার্ব্বাকের মনে হইল সুরঙ্গমাই আসিয়াছে। কণ্ঠস্বর অনেকটা সেই রকমই মনে হইতেছে। তবু দ্বিধা হইল।

"সুন্দরানন্দ কি বললেন"

"তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু একটি সর্ত্ত আছে"

"কি সর্ত্ত"

"কপাট খুলুন, বলছি"

চার্ব্বাকের আর সন্দেহ রহিল না। সে কপাট খুলিয়া দিল। যে মানবী মূর্ত্তিটি প্রবেশ করিল সে যে সুরঙ্গমা নয় এ সংশয় তাহার মনে জাগিল না। জাগিলেও সংশয় নিরসনের উপায় ছিল না, কারণ ঘরের ভিতরে জ্যোৎস্নালোক প্রবেশ করে নাই। অন্য কোনও আলোও ছিল না।

"কি সর্ত্তে কুমার সুন্দরানন্দ আমাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত হয়েছেন?"

"আপনাকে অকুণ্ঠিত হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে হবে যে, তাঁর কুলদেবতা চতুরানন ব্রহ্মার অস্তিত্বে আপনি বিশ্বাস করেন"

চার্ব্বাক কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—"শুধু মুখে ওই কথা বললেই হবে?"

"শুধু মুখে বললেই হবে না। চতুরানন সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্বে আপনাকে বিশ্বাসও করতে হবে"

"কিন্তু আমি যদি মিছে কথা বলি তিনি তা টের পাবেন কি করে'? প্রাণভয়ে অনেকেই যে মিথ্যার আশ্রয় নেয় একথা নিশ্চয়ই তাঁর অবিদিত নেই"

"নিশ্চয়ই নেই। আপনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেই কিন্তু তিনি জানতে পারবেন। একজন ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে, তিনি এখানেই আছেন। তাঁর গণনা অভ্রান্ত। তিনি বলে দিতে পারবেন আপনি সত্য কথা বলছেন কিনা। তিনি যদি বলেন আপনি মিথ্যা কথা বলছেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভল্লের আঘাতে আপনার মস্তক বিদীর্ণ হবে। সুন্দরানন্দ এই আদেশ দিয়েছেন।"

চার্ব্বাক পুনরায় কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইয়া গেল। তাহার পর বলিল—"হঠাৎ কোন কিছুকে বিশ্বাস করবার শক্তি তো আমার নেই। যে দেবতাকে কখনও দেখিনি, যার অস্তিত্বের কল্পনা মনে হাস্যোদ্রেক ছাড়া আর কোনও ভাবের উদ্রেক করেনি, তাকে হঠাৎ সত্য বলে' মেনে নিই কি করে'? আমাকে মানিয়ে সুন্দরানন্দের লাভই বা কি হবে তা বুঝতে পারছি না"

"আপনি কি জ্যোতিষ গণনায় বিশ্বাস করেন?"

"না—"

"তাহলে তো ওই ম্লেচ্ছ জ্যোতিষীর গণনাকে আপনি নির্ভয়ে তুচ্ছ করতে পারেন। আপনি মুখেই তাহলে বলুন—আপনি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, আমি সেই খবর নিয়ে যাই, ফলাফল কি হয় দেখা যাক"

"আমি যদি বলি ব্রহ্মার অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না, তাহলে কি তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না?"

"না। তাঁর মতে যারা নাস্তিক তারা সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়াই উচিত"

চার্ব্বাক চুপ করিয়া রহিল।

"কি ঠিক করলেন"

"কিছু ঠিক করতে পারছি না"

"আপনি সত্যিই কি ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না? ভাল করে' ভেবে দেখুন, চেয়ে দেখুন মনের গহনে"

"যা চোখে দেখিনি, যুক্তি দিয়ে যার অস্তিত্বের কল্পনাও করতে পারি না, তাকে বিশ্বাস করি বলব কি করে"

"চোখে দেখলে আপনি বিশ্বাস করবেন?"

"করব। প্রত্যক্ষ দর্শনকেই বিশ্বাস করে' এসেছি চিরদিন"

"দেখুন তাহলে"

এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সেই অন্ধকার ঘর এক দিব্য আলোকে আলোকিত হইল। চার্ব্বাক সবিস্ময়ে দেখিল তাহার সম্মুখে যে ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সে সত্যই চতুরানন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দ্যুতিময়, উজ্জ্বল রক্তবর্ণের আভায় সমস্ত ঘর রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে। চার্ব্বাক ভয় পাইয়া গেল। নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

"সুরঙ্গমা, তুমি কোথা গেলে? ইনি সত্যই কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, না তুমি আমাকে কোন ভোজবাজী দেখাচ্ছ?"

সুরঙ্গমার কোনে সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা স্মিতমুখে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার অষ্টনয়নের হাস্যময় দৃষ্টি নীরবে যেন তাহাকে বলিতে লাগিল—অবিশ্বাস করিও না আমি আছি। মানব মাত্রেই অসহায়, প্রেম ও বিশ্বাসই তাহার একমাত্র আশ্রয়। সুরঙ্গমার প্রেম যদি লাভ করিতে চাও, বিশ্বাস কর। একমুখ বিষ্ণু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ মহেশ্বর কেহই অলীক নহে। তোমার অন্তরলোকে তাহারা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকিবে। তুমি কেবল বিশ্বাস কর।

চার্ব্বাক মন্ত্রমুগ্ধবৎ এই জীবন্ত বিগ্রহের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতামহের মধুর হাস্য, স্নিগ্ধ প্রশান্তি, দিব্য জ্যোতি তাহাকে ক্রমশ সম্মোহিত করিয়া ফেলিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া হাত জোড় করিয়া এই বিস্ময়কর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের সম্মুখে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বসিয়া পড়িল। পিতামহ অন্তর্হিত হইলেন।

চার্ব্বাক তথাপি বসিয়া রহিল।

কুলিশপাণি সুরঙ্গমার অপেক্ষায় দ্বার খুলিয়া বসিয়াছিল। তাহার ধৈর্য্য যখন সীমা অতিক্রম করিতেছে তখন দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ শোনা গেল। কুলিশপাণি সাগ্রহে উঠিয়া আগাইয়া আসিল, কিন্তু দ্বারপ্রান্তে সুরঙ্গমাকে দেখিতে পাইল না। পাইল কিরাতবেশী দীর্ঘকায় শালপ্রাংশু মহাভুজ এক ব্যক্তিকে, তাহার পর তাহার নজরে পড়িল ছায়ার অন্ধকারে একটি নারীমূর্ত্তিও রহিয়াছে।

"কে আপনারা"

পুরুষটি উত্তর দিলেন।

"আমরা নাগদম্পতী। আমার নাম চিত্রক, ইনি চিত্রিকা। আপনার নাম কি কুলিশপাণি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"

"আপনাকে একটি সংবাদ দিতে এসেছি। যদি অনুমতি করেন নিবেদন করি। আপনার হিতার্থেই এসেছি আমরা। আপনারা রাজা-রাজড়া লোক, তাই সংস্কৃতবহুল শব্দ ব্যবহার করছি। সহজ চলতি ভাষাতেই আমরা অভ্যস্ত"

"সহজ চলতি ভাষাতেই বলুন। কি সংবাদ—?"

"আপনি কি সুরঙ্গমাকে নিয়ে ভাগতে চান?"

প্রশ্ন শুনিয়া কুলিশপাণি স্তম্ভিত হইয়া গেল। আর একবার ভাল করিয়া সেই কিরাতবেশী বিরাট পুরুষের আপাদমস্তক ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল। ইহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না। সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু এই অপরিচিত লোকটি তাহার এই গোপন কথাটি জানিল কি করিয়া? সুরঙ্গমা ছাড়া অন্য কেহ তো একথা জানে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত এই লোকটির কাছে সত্য-স্বীকার করা সমীচীনও নহে। সুন্দরানন্দের কানে গেলে সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্থির করিল অকপটে উত্তর দেওয়া উচিত হইবে না। বলিল—"আপনার সংবাদটি অদ্ভুত। কোথা থেকে শুনলেন?"

"আপনারই মুখ থেকে"

"আমার মুখ থেকে! কি রকম?"

"কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপনি যখন গাছতলায় দাঁড়িয়ে সুরঙ্গমাকে বলছিলেন—কাছেই আমার ঘোড়া বাঁধা আছে চল তোমাকে নিয়ে পালাই—তখন চিত্রিকা আপনার খুব কাছেই ছিল। স্বকর্ণে সে আপনার কথাগুলি শুনেছে"

কুলিশপাণি চিত্রিকার দিকে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ সে ভাল করিয়া তাহাকে দেখে নাই; চিত্রিকাকে দেখিয়া খানিকক্ষণের জন্য বিস্ময়ে সে নির্ব্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে হইল মানবীতে এত রূপ সম্ভবে না। চিত্রিকা আনত নয়নে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কুলিশপাণির সন্দেহ হইল মেয়েটি যেন তাহার মনের কথা টের পাইয়াছে। তাই একটু জবাবদিহির সুরেই বলিল—"সত্যি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনাদের কখনও দেখেছি বলে, তো মনে হচ্ছে না"

পুরুষটিই পুনরায় উত্তর দিলেন।

"না, দেখেন নি। যে রূপে আমাদের দেখছেন নিজেদের সে

রূপ আমরাও কখনও দেখিনি। সেকথা যাক। যা বলছিলাম, চিত্রিকা স্বকর্ণে আপনার কথাগুলি শুনেছে। আপনি যখন সুরঙ্গমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন ও যদিও আপনার খুব কাছেই ছিল, তবু দেখেন নি, কারণ দেখা সম্ভব ছিল না। ও তখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় একটা গর্ত্তে ঢুকেছিল—”

কুলিশপাণির দেহে একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সে বিস্ফারিত নয়নে চিত্রিকার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সত্যই মনে হইতে লাগিল যে বসনে চিত্রিকার দেহ আবৃত রহিয়াছে তাহা যেন সর্প-চর্ম্মের মতোই চিক্কণ ও চিত্র-বিচিত্র।

পুরুষটি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“গোড়াতেই তো বলেছি আমরা নাগদম্পতী। মহাদেবের বরে আমরা যে কোনও রূপ ধারণ করতে সমর্থ। এই মনুষ্যবেশে আপনার কাছে এসেছি। আমরা আপনার হিতৈষী। আপনি অকপটে আমাদের সব কথা বলতে পারেন। আপনার যাতে অনিষ্ট হয় সেরকম কাজ কখনও আমরা করব না—”

কুলিশপাণি জানু পাতিয়া করজোড়ে বসিয়া পড়িল।

“মহাদেব আমার কুলদেবতা। আপনারা যখন তাঁর বরে বলীয়ান তখন আপনাদের অবিদিত কিছু নেই। আমার মনের কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এ অবস্থায় কি করব উপদেশ দিন”

পুরুষটি হাসিয়া বলিলেন—“সেই জন্যই তো এসেছি। চিত্রিকা যখন ইঁদুর ধরবার চেষ্টায় গর্ত্তে ঢুকেছিল, আমি তখন অন্যত্র একটা গেছো-ব্যাঙের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সেই সময় কানে এল সুরঙ্গমা চার্ব্বাকের সঙ্গে পালাবে পরামর্শ করছে”

“চার্ব্বাকের সঙ্গে ?”

“হ্যাঁ। যে চার্ব্বাক পর্ব্বতকন্যা ধারামতীর সর্ব্বনাশ করেছে সেই সুরঙ্গমাকে নিয়ে পালাবার তালে আছে !”

"চার্ব্বাক কোথায় ?"

"এই বনেই আছে কোথাও নিশ্চয়। এখন ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না"

"আপনি এ খবর শুনলেন কোথা"

"আমি যখন গাছের ডালে ডালে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন হঠাৎ আমার কানে এল সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে বলছে—আপনি যদি আমাকে আমার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দেন, আমি আপনার কাছেই যাব। চার্ব্বাক দেখলাম তাতেই রাজি। তার কিছুক্ষণ পরে চিত্রিকার সঙ্গে দেখা হল, চিত্রিকা বললে তুমিও নাকি সুরঙ্গমাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে সরে' পড়তে চাও। সুরঙ্গমাও নিমরাজি-গোছ হয়েছে। তখন আমাদের মনে হল চার্ব্বাকের খবরটা তোমাকে বলে যাওয়া উচিত। তুমি যখন শিব-ভক্ত, তখন তুমি আমাদের নিজেদের লোক। খবরটা তোমাকে জানিয়ে দিলাম, এখন তুমি যা ব্যবস্থা করবার কর"

কুলিশপাণি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে কটিনিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া বলিল—"চার্ব্বাক যদি এ বনে কোথাও থাকে তাহলে আগামীকল্য তাকে আর সূর্য্যোদয় দেখতে হবে না। আজ রাত্রিই তার জীবনের শেষ রাত্রি। নাগদম্পতি, আপনাদের ঋণ কখনও শোধ করতে পারব না জীবনে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়—"

কুলিশপাণি পুনরায় প্রণাম করিয়া বলিল—সত্যই আশীর্ব্বাদ করুন আমাকে। সুরঙ্গমাকে না পেলে জীবন আমার মরুভূমি হয়ে যাবে"

পুরুষটি স্মিতমুখে কুলিশপাণির দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন—"আমি আশীর্ব্বাদ করি না কাউকে"

"কেন"

"ফলে না"

কুলিশপাণি এ উত্তর প্রত্যাশা করে নাই। বলিল—"কি ফলে তাহলে"

"তা-ও জানি না"

"কিছু উপদেশ দিন অন্ততঃ। তাতেও আমার অনেক উপকার হবে। আপনারা শিবের বর পেয়েছেন। আপনারা ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন"

"এটা ভুল ধারণা। কেউ অসাধ্য সাধন করতে পারে না। আগে উপদেশ দিতাম, কিন্তু এখন তা-ও আর দিই না"

"কেন"

"দিলে কেউ শোনে না"

"আমি শুনব"

"শুনবে?"

"শুনব"

"তাহলে একটি উপদেশ দিচ্ছি শোন। হোঁৎকামি কোরো না। করলে শেষ পর্য্যন্ত লাভ হয় না কোনও—"

বাহিরে একটা পেচক কর্কশশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল।

পুরুষটি বলিল—"ডাক এসেছে। এবার আমরা চললাম!"

"কার ডাক"

কুলিশপাণি এ প্রশ্নের উত্তর পাইল না। কারণ নাগদম্পতী সহসা অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরঙ্গমার জন্য অপেক্ষা করিবে, না চার্ব্বাকের সন্ধানে অবিলম্বে বাহির হইয়া পড়িবে—তাহা স্থির করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় লাগিল। অবশেষে সুরঙ্গমার জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা

করাই তাহার সঙ্গত মনে হইল। একটি বেত্রাসন বাহির করিয়া বাহিরে বারান্দায় সে উপবেশন করিয়া কিরাতবেশী নাগদম্পতীর রহস্যময় আবির্ভাব ও তিরোভাবের কথাই চিন্তা করিতে লাগিল। দেব-দেবী মাহাত্ম্যে কুলিশপাণির অগাধ বিশ্বাস ছিল। মহাদেবের কৃপা হইলে সর্প যে ইচ্ছানুসারে যে কোনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারে ইহা তাহার নিকট মোটেই বিস্ময়জনক মনে হয় নাই। সে ভাবিতেছিল এই নাগদম্পতী এমনভাবে আবির্ভূত হইয়া যে উপদেশ তাচ্ছিল্য ভরে তাঁহাকে দিয়া গেলেন সে উপদেশের তাৎপর্য্য কি! চার্ব্বাককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিবার যে বাসনা তাহার মনে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা কি অন্যায়, না অসঙ্গত? ওই ধূর্ত্ত লোকটার ওই তো উচিত শাস্তি। আবার তাহার মনে হইল ব্রহ্মহত্যা করাটা উচিত হইবে কি! ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ। কিন্তু এই মহাপাপের স্বপক্ষে যুক্তিসংগ্রহ করিতেও তাহার বিলম্ব হইল না। প্রথমত তাহার মনে হইল ওই বিবেকহীন ব্যভিচারী লোকটা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না, ও চণ্ডালেরও অধম। দ্বিতীয়ত মনে হইল—সে তো হত্যা করিবে না, দণ্ডবিধান করিবে। সুন্দরানন্দের প্রধান সেনাপতি হিসাবে সে অধিকার তাহার আছে। দুষ্টের দমন তাহার কর্ত্তব্য। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াও সে কিন্তু মনে মনে খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। ওই সহসা-আবির্ভূত সহসা-অন্তর্হিত পুরুষ তাচ্ছিল্যভরে চলিত ভাষায় তাহাকে যে উপদেশ দিয়া গেল তাহার কি অর্থ হইতে পারে! চার্ব্বাককে হত্যা করিলে কি দেব-রোষে পতিত হইতে হইবে? কিন্তু···সহসা তাহার চিন্তাধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইল। একটি সঞ্চরমাণ বর্ত্তিকা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আর সন্দেহ রহিল না, কুলিশপাণি

বুঝিতে পারিল সুরঙ্গমাই আসিতেছে। সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরও একটু পরে শোনা গেল।

"আপনি জেগে আছেন নাকি"

"দেখতেই তো পাচ্ছ। শুধু জেগে নেই, অধীর আগ্রহে জেগে আছি। তারপর কি ঠিক করলে, বল। যাবে আমার সঙ্গে?

"যাওয়ার আর দরকার হবে না। মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করতে চাইছেন না। সুতরাং আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আপনাকে আর নিজেকে বিপন্ন করতে হবে না। আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। আপনি যে আমার মতো একজন সামান্যা নর্ত্তকীর জন্য এতটা করতে রাজি হয়েছিলেন, এর জন্য আমি সারাজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব আপনার কাছে।..."

সুরঙ্গমা বর্ত্তিকাটি বারান্দায় রাখিয়াছিল। বর্ত্তিকালোকে কুলিশপাণি সুরঙ্গমার পূর্ণ শ্রী দেখিতে পাইল। জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ অন্ধকারের পটভূমিকায় এই তন্বী রূপসীকে পুনরায় সে যে মহিমায় অলঙ্কৃত দেখিল তাহাতে তাহার বিবেক আবার নব-মোহে আচ্ছন্ন হইল, শুভাশুভ জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া গেল, তাহার সমস্ত চেতনায় একটি বাসনাই শিখার মতো উন্মুখ হইয়া উঠিল—সুরঙ্গমাকে চাই। কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখে কোনও কথা সরিল না। যখন সরিল তখন সে বলিল—"আমি তো তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা চাই নি সুরঙ্গমা। আমি তোমাকে চেয়েছিলাম"

সুরঙ্গমা হাসিয়া বলিল—"এর উত্তর তো আগেই দিয়েছি। আমার দেহটা হয়তো আপনাকে দিতে পারি—তা-ও সুন্দরানন্দের অনুমতি নিয়ে তা দিতে হবে, কারণ আমার এই দেহটা তাঁরই সম্পত্তি—কিন্তু আপনি যা চাইছেন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে দেওয়ার

ক্ষমতা আমার নিজেরও নেই। সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ দাতা এবং গ্রহীতার অনেকদিনের মেলা-মেশার ফলে হয়। আপনি বুদ্ধিমান লোক, আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার কথা”।

কুলিশপাণি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তাহার বিস্ফারিত নাসারন্ধ্র দিয়া কেবল উষ্ণশ্বাস বাহির হইতে লাগিল। সুরঙ্গমা তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল এখানে আর বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সে বর্ত্তিকাটি তুলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

“তুমি যা যুক্তিযুক্ত তাই সহজভাবে বলেছ। তোমার বক্তব্য বুঝতে আমার অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আমি যা অনুভব করছি তা বলতে পারছি না, তা যুক্তিযুক্তও নয়। আমার অব্যক্ত কথা তুমি বুঝতে পারবে কি না জানি না। আমি একটি কথা কেবল জানতে চাই, আশা করি সত্য উত্তর পাব”

“বলুন—”

চার্ব্বাক কি এখানে এসেছেন?”

“এসেছেন”

“কোথায় আছেন”

সুরঙ্গমা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল—“তা জানতে চাইছেন কেন”

“কর্ত্তব্যের জন্য। সুন্দরানন্দ আদেশ দিয়েছেন তাকে বন্দী করতে”

“বন্দী করবার দরকার হবে না আর। সুন্দরানন্দ সব কথা শোনার পর ক্ষমা করেছেন তাঁকে। আপনি সম্ভবত একটু পরেই কুমারের নূতন আদেশ পাবেন”

কুলিশপাণি যেন আকাশ হইতে পড়িল।

"চার্ব্বাককে কুমার ক্ষমা করেছেন? তুমি এ কথা শুনলে কোথা থেকে"

"কুমারেরই মুখ থেকে"

"চার্ব্বাকের কথা উঠল কি প্রসঙ্গে?"

"প্রসঙ্গটা আমিই তুলেছিলাম। চার্ব্বাক আমারই মাধ্যমে ক্ষমার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন"

"তোমার সঙ্গে চার্ব্বাকের দেখা হয়েছে তাহলে"

"হয়েছে বই কি"

"চার্ব্বাক কোথায় আছে"

সুরঙ্গমা পুনরায় মৌন হইয়া গেল। তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—"আমাকে ক্ষমা করবেন সেনাপতি। আমি মহর্ষি চার্ব্বাককে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে তাঁর অবস্থান গোপন রাখব"

"এ রকম অন্যায় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অর্থ?" কুলিশপাণির কণ্ঠস্বরে কঠোরতার আভাস পাইয়া সুরঙ্গমার মুখে চোখে হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

"পুরুষদের সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে চিরকাল প্রশ্রয় দিয়ে এসেছি। ওটা আমার দুর্ব্বলতা। অনেক বড় বড় রথী-মহারথীরা আমার এ দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করেছেন। আশা করি আপনিও করবেন"

"সুরঙ্গমার এই তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি শুনিয়া কুলিশপাণি মনে মনে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। বুঝিল সুরঙ্গমার এ দুর্ব্বলতা না থাকিলে তাহার অবস্থা কি হইত? যথাসম্ভব আত্মসম্বরণ করিয়া সে উত্তর দিল!"

"তোমার মতো রূপসীদের চিরকালই সাত খুন মাপ। এ নিয়ে আমি মাথাই ঘামাতাম না, কিন্তু একটু আগে যে সাংঘাতিক সংবাদটি আমি শুনেছি তাতে সত্যই একটু বিচলিত হয়েছি"

"কি সংবাদ"

"সংবাদটি বলবার আগে আমি একটি অনুরোধ করব। অকপটে বোলো সংবাদটি সত্য কি না"

"এ অনুরোধ করবার দরকার ছিল না সেনাপতি। রূঢ় সত্যের উপর আমার জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাই আমি মিথ্যাচরণ করতে পারি না। করলেও সে মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। বলুন, আপনি কি সংবাদ পেয়ে বিচলিত হয়েছেন ?"

"শুনলাম তুমি চার্ব্বাককে নাকি বলেছ 'আপনি যদি আমাকে আমার সর্ব্বোচ্চ মূল্য দেন তাহলে আমি আপনার কাছে যাব'। আর চার্ব্বাক তাতে না কি রাজিও হয়েছে"

সুরঙ্গমা একটু বিস্মিত হইল বটে, কিন্তু তাহার চোখে-মুখে সে বিস্ময় প্রতিভাত হইল না। সহজভাবে হাসিয়া সে বলিল—"যা শুনেছেন তা মিথ্যা নয়। কিন্তু এই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, সংবাদটি আপনি পেলেন কি করে"

"তোমরা যখন আলাপ করছিলে তখন যিনি তা আড়াল থেকে শুনেছিলেন তিনিই আমাকে বলে গেলেন"

সুরঙ্গমা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"ঠিকই বলে গেছেন তিনি"

"জানতে পারি কি—চার্ব্বাক তোমাকে কি মূল্য দিতে চান ?"

"আমাকে বাঁচাবার জন্য তিনি যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে দেবেন"

"সত্যি ?"

"বলেছেন দেবেন। শেষ পর্য্যন্ত দেবেন কি না জানি না"

কুলিশপাণি নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সহসা সুরঙ্গমার কণ্ঠস্বরে সে সম্বিত ফিরিয়া পাইল।

"ভোর হয়ে এল বোধহয়। এবার আমি যাই।"

"কোথা যাচ্ছ"

"নিজের ঘরে। ঘুমোব এখন"

সুরঙ্গমা চলিয়া গেল। তাহার প্রস্থানপথের দিকে কুলিশপাণি চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। বর্ত্তিকালোক যখন দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গেল তখন সে-ও ঘরের ভিতর ঢুকিল। তাহারও ঘুম পাইয়াছিল।

নাগ-দম্পতী পেচক-দম্পতীতে রূপান্তরিত হইয়া একটি সু-উচ্চ দেবদারু বৃক্ষের শাখায় তৃতীয় একটি পেচকের ভাষণ মনোযোগ সহকারে শুনিতেছিল।

তৃতীয় পেচক শুদ্ধ ভাষায় বলিতেছিল—"হে পিতামহ, তুমি আর বাণী নিজেদের আনন্দে মত্ত হইয়া সৃষ্টির পর সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছ। সে সৃষ্টি বিচিত্র ও বিশাল হইয়া উঠিয়াছে। তোমাদের এই সুমহতী সৃষ্টিকে বিধৃত করিবার জন্য আমিও নিজেকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছি। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসিতেছে এবং চলিয়া যাইতেছে, তোমাদের সৃষ্টিও রূপ হইতে রূপান্তরে বিবর্ত্তিত হইতেছে। মানব-কবিরা অনন্ত বিশেষণে ভূষিত করিয়া সে সৃষ্টিকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্যতার সীমা-রেখা পার করিয়া দিয়াছেন। তোমাদেরও খেয়াল নাই, তোমরা সৃষ্টির আনন্দে উন্মত্ত হইয়া আছ, কিন্তু আমার মনে হয় এইবার তোমরা ক্ষান্ত হও, আমি আর নিজেকে কত প্রসারিত করিব"

তৃতীয় পেচক নীরব হইল। নীরব হইবামাত্র একটা অদ্ভুত নীরবতায় চতুর্দ্দিক যেন নিমজ্জিত হইয়া গেল। মনে হইল নিবিড় অন্ধকারে সৃষ্টি সত্যই অবলুপ্ত হইয়া গেল বুঝি। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই বহুবিধ

আরণ্য শব্দ—ঝিল্লীধ্বনি, বৃক্ষমর্ম্মর, শ্বাপদের চীৎকার—সে নীরবতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। কোটি কণ্ঠে যেন প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল।

প্রথম পেচক বলিল—"মহাকাল, শুদ্ধ ভাষায় উচ্চারিত তোমার বক্তব্য শুনলাম, এইবার আমার বক্তব্য শোন। নূতন সৃষ্টি বহুকাল পূর্ব্বেই থেমে গেছে। কিন্তু সেই পুরাতন সৃষ্টির যে সব ফাঁকড়া বেরিয়েছে, আর শ্রীমতী বাণী তা যেমনভাবে ব্যক্ত করেছেন তাতে আমারই তাক লেগে যাচ্ছে। চার্ব্বাক যে শিখর সেন হয়ে যাবে, কালকূট যে কুলিশপাণি বা কমল-কিশোরে রূপান্তরিত হবে এতো কল্পনা করিনি আমি। কিন্তু স্বচক্ষে দেখছি—হচ্ছে, অবিশ্বাস করবারও উপায় নেই। তুমি আর একটু বাড়—"

তৃতীয় পেচক। আমি অসমর্থ—

প্রথম পেচক। চেষ্টা কর—ওই তো—

তৃতীয় পেচকের দেহায়তন ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহা বিশাল মেঘের আকার ধারণ করিয়া আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। মনে হইতে লাগিল প্রাবৃটের ঘনঘটায় সমস্ত আকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কৃষ্ণ জলধরকে বিদীর্ণ করিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎমালা মুহুর্মুহুঃ অন্ধকারকে শিহরিত করিয়া তুলিল। বজ্রগর্জ্জনে দশদিক্ চমকিত হইল।

প্রথম পেচক। [দ্বিতীয় পেচককে] ময়শার কাণ্ডটা দেখেছ! ও ভেবেছিল আমাকে হকচকিয়ে দেবে। কিন্তু ওর ধাপ্পায় ভোলবার ছেলে নই আমি। ওকে বলতে ইচ্ছে করছিল—আমার সৃষ্টিকে তুমি বিধৃত করনি—ধ্বংস করেছ, কল্পনায় বিষ্ণুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে সে কথা বলেওছিলাম একদিন—কিন্তু—

দ্বিতীয় পেচক। কিন্তু আপনার মুখেই শুনেছি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৃথক নন। একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ওঁরা—

প্রথম পেচক। ঠিকই শুনেছ প্রেয়সি।

দ্বিতীয় পেচক। তাহলে আবার ওদের গাল দিচ্ছেন কেন? ওতে তো নিজেকেই গাল দেওয়া হচ্ছে।

প্রথম পেচক। নিজেকে গাল দিতেও বেশ লাগে মাঝে মাঝে। ওকে যখন ভাল লাগে, যখন মনে হয় যে ও আমারই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ, তখন ওকে মহেশ্বর, পঞ্চানন বলে' সুখ পাই, আবার ওকে যখন শত্রু মনে করি তখন ওকে ময়শা, পেঁচো বলতেও মন্দ লাগে না। দুটো ব্যাপারেই বেশ রস আছে! রসই আসল। বাস্তবেও রস আছে, স্বপ্নেও রস আছে। যেখান থেকেই হোক রসাস্বাদন করাই হ'ল লক্ষ্য, তাতেই আনন্দ। ময়শাকে মনের আনন্দে বেশ গাল দিচ্ছিলাম হঠাৎ তুমি রস-ভঙ্গ করে' দিলে—এখন কি করা যায় বল তো—

দ্বিতীয় পেচক। [হাসিয়া] তা কি আর আমাকে বলে' দিতে হবে?

প্রথম পেচক। তোমার থ্যাবড়া মুখে বাঁকা ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসিটি মন্দ লাগছে না। এদিকে একটু সরে' বসলেই তো ভাল হয়।"

পেচকদম্পতী পরস্পরের চঞ্চুচুম্বনে রত হইল—কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আকাশে যে ভয়ঙ্কর ঘনঘটা চরাচরকে শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহা অন্তর্হিত হইল, জ্যোৎস্না-কিরণে কানন-কান্তার পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

প্রথম পেচক। [সহসা] একটা খবর জান?

দ্বিতীয় পেচক। কি?

প্রথম পেচক। কুলিশপাণিকে আমরা ভুলিয়াছি, কিন্তু চার্ব্বাককে পারি নি। ও চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখে হতভম্ব হয়েছিল,

কিন্তু তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নি। ওই দেখ, ঘর থেকে বেরিয়ে ও চলে যাচ্ছে—।. লোকটা খাঁটি লোক।

সেই পর্ণকুটীরে চতুরাননের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব চার্ব্বাককে ভীত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু নিদারুণ ভয়ের আঘাতেই তাহার মোহগ্রস্ত মন প্রকৃতিস্থও হইল। সে বুঝিতে পারিল কত নীচে সে নামিয়াছে। কি আশ্চর্য্য, একটা নর্ত্তকীর প্রেমে পড়িয়া সে যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে গলা বাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল! ওই নর্ত্তকী একটু আগে ভোজবাজীর সহায়তায় তাহাকে যে ব্রহ্মামূর্ত্তি দর্শন করাইল, আর একটু হইলে সে তাহাকে বিশ্বাস-স্থাপনও করিত। ছি, ছি, ছি—দার্শনিক চার্ব্বাকের এ কি শোচনীয় অধঃপতন! একটা ভোজবাজিকে সে সত্য বলিয়া মনে করিল! ভয় পাইয়া মূর্চ্ছা গেল! নীলোৎপলা তাহাকে অদ্ভুত একটা সুরাপান করাইয়া অদ্ভুত স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছিল। সুরঙ্গমা এ কি করিল! তাহার সমস্ত যুক্তিকে মনুষ্যত্বকে পদদলিত করিয়া তাহার শবদেহের উপর নৃত্য করিবে এই অস্বাভাবিক বাসনা তাহাকে পাইয়া বসিল কেন, আর সে-ই বাসনাকে প্রশ্রয় দিল কোন বুদ্ধিতে।

…অনেকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল সে। তাহার পর স্থির করিল—মোহ-পাশ ছিন্ন করিতে হইবে। রূপসী সুরঙ্গমাকে লাভ করিতে পারিলে তাহার পৌরুষ সার্থক হইত, কিন্তু মনুষ্যত্বের মূল্যে সে সার্থকতা লাভ করা অর্থহীন। সে সুরঙ্গমাকে জয় করিতে চাহিয়াছিল; কিছুতেই তাহা যখন সম্ভব হইল না, তখন পরাজয় স্বীকার করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কুটীর ত্যাগ করিল। স্থির করিল, যত শীঘ্র সম্ভব সে এই বনস্থলী ত্যাগ করিবে। অন্ধকারে অরণ্যপথে তাহার গতি দ্রুত হইল না, কিন্তু তথাপি ত্বরিত

চরণেই সে পথ অতিবাহন করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটিবার পর সে বুঝিতে পারিল যে তাহাকে অরণ্যেই রাত্রিবাস করিতে হইবে। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে এমনভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো নিরাপদ নহে। সম্মুখেই শাখাপত্রবহুল একটি বৃক্ষ ছিল। তাহাতেই সে আরোহণ করিল।

প্রথম পেচক। নাটক আর একটু পরে জমবে।

দ্বিতীয় পেচক। সুরঙ্গমা আসছে বুঝি?

প্রথম পেচক। ওই যে। শুধু আসছে না, ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছে ও আকুল হয়ে উঠেছে। ঘোরতর কিছু একটা ঘটবে।

দ্বিতীয় পেচক। ওদিকে শিখর আর অবন্ধনার ব্যাপারও ঘোরতর হয়ে উঠছে নিশ্চয়।

প্রথম পেচক। নিশ্চয়। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এই হচ্ছে— প্রথমে ফিকে, তারপর ঘোর, তারপর ঘোরতর। চল ওদের খবর নিয়ে আসা যাক, সুরঙ্গমা চার্ব্বাককে খুঁজে বার করুক ততক্ষণ—

পেচক-দম্পতী উড়িয়া গেল।

একটু পরেই দেখা গেল, সুরঙ্গমা বর্ত্তিকা হস্তে চার্ব্বাককে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার প্রদীপ্ত-নয়নে স্ফুরিত-অধরে দোদুল্যমান কৃষ্ণবেণীর নিবিড়তায় চিরন্তনী নারীর কৌতূহল মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সুরঙ্গমা বর্ত্তিকাহস্তে অরণ্যের ঘন অন্ধকারে চার্ব্বাককেই সন্ধান করিতেছিল। জালবদ্ধ শিকার জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিলে ব্যাধের যে মনোভাব হয় সুরঙ্গমার সেরূপ মনোভাব হয় নাই। চার্ব্বাক

চলিয়া যাক ইহাই সে মনে মনে কামনা করিতেছিল। যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠে ফেলিয়া এই জ্ঞানী পণ্ডিতের জীবন-নাশ করিবার বাসনাও তাহার ছিল না, সে কেবল পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল তাহার জন্য ব্রাহ্মণ প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত কি না। অর্থাৎ দার্শনিকের অনমনীয় বিবেকের সহিত কামনার দ্বন্দ্বে কামনাই জয়ী হয় কি না। তাহার পরীক্ষা সফল হইয়াছিল। যিনি যজ্ঞবিরোধী, যিনি পরলোকে বিশ্বাস করেন না, ইহলোকের সুখ-ভোগই যাঁহার একমাত্র কাম্য, তিনি একজন নটীর মোহে পড়িয়া যজ্ঞে জীবনাহুতি দিতেই সম্মত হইয়াছিলেন শেষে। তাঁহার অসহায় মুখচ্ছবিটা সুরঙ্গমার মানসপটে বারম্বার ফুটিয়া উঠিতেছিল। বিজয়িনীর আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ হইয়া সে এই মানব-পশুটাকে লইয়া একটু খেলা করিবে ভাবিয়াছিল, খেলা করিয়া তাহার পর ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু এ কি হইল! লোকটা সহসা অন্তর্দ্ধান করিল কেন? কোথায় গেল! কুলিশপাণির কবলে পড়িল না কি। চার্ব্বাকের যতটুকু পরিচয় সুরঙ্গমা পাইয়াছিল তাহাতে তিনি যে স্বেচ্ছায় চলিয়া যাইবেন একথা সুরঙ্গমা ভাবিতেই পারিতেছিল না। একবার প্রেমবিহ্বল হইয়া পড়িলে সহজে আত্মস্থ হওয়া যায় না—ইহাই সুরঙ্গমার অভিজ্ঞতা। তবে একথাও সত্য যে চার্ব্বাকের মতো কোনও মহর্ষি ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রেমে পড়ে নাই। তাহার মোহ-পাশ ছিন্ন করিয়া যে ব্যক্তি এত সহজে পলায়ন করিতে পারে সে নিঃসন্দেহে অসাধারণ ব্যক্তি। এ সম্ভাবনা সুরঙ্গমাকে আরও কৌতূহলী করিয়া তুলিয়াছিল। সত্যটা কি জানিবার জন্য তাই আকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে। একটু আত্মবিশ্লেষণ করিলে নিজেই সে বুঝিতে পারিত তাহার এ কৌতূহলের মূলে আছে তাহার অহঙ্কার। তাহাকে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইবে এমন পুরুষের অস্তিত্বই কল্পনা করা অসম্ভব তাহার পক্ষে। মহর্ষি চার্ব্বাকের

মধ্যে সে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে কি না তাহাই যাচাই করিবার জন্য তাহার আকুলতা, তাই সে বর্ত্তিকাহস্তে অন্ধকারে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়াও কিন্তু সে চার্ব্বাকের দেখা পাইল না। হতাশ চিত্তেই ফিরিতেছিল এমন সময় দেখিতে পাইল চার্ব্বাক একটি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতেছে। সুরঙ্গমা দাঁড়াইয়া পড়িল। বৃক্ষ হইতে নামিয়া চার্ব্বাক তাহারই দিকে দ্রুতপদে আগাইয়া আসিতে লাগিল।

"ও, সুরঙ্গমা তুমি! আমি ভাবিছিলাম বুঝি আর কেউ"

"আপনি কোথা গিয়েছিলেন। আমি আপনাকেই যে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

সুরঙ্গমা বর্ত্তিকাটি ভূমিতে স্থাপন করিল।

"আমি তোমার আশা ত্যাগ করে' চলে যাব ঠিক করেছি। ওই গাছের উপর উঠেছিলাম—অন্ধকারে পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে'। ঠিক করেছিলাম ভোরেই বন ছেড়ে চলে যাব। কিন্তু হঠাৎ আর একটা কথা মনে হল। মনে হল এমন ভাবে যদি পালিয়ে যাই তোমার ধারণা হবে আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে গেছি। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে এ ভ্রান্ত ধারণা হতে দিতে চাই না। তাই ঠিক করেছি কুমার সুন্দরানন্দের কাছে গিয়ে অকপটে সব কথা বলে' আত্মসমর্পণ করব। তা ছাড়া আমি সত্যাশ্রয়ী, চিরকাল সত্যকেই সন্ধান করবার চেষ্টা করছি, প্রাণভয়ে সত্যপথ থেকে ভ্রষ্ট হব না। আমাকে সুন্দরানন্দের কাছে নিয়ে চল"

"কুমার তো আপনাকে ক্ষমা করেছেন"

"আমি তাঁর কুল-দেবতা ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না একথা জানবার পরও ক্ষমা করেছেন?"

"আপনার ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করবেন কেন তিনি।"

"কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলে' গেলে যে ব্রহ্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস না করলে আমাকে তিনি ক্ষমা করবেন না। ভোজবাজির সহায়তায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে মূর্ত্তও করে' তুললে তুমি আমার মনে। ক্ষণিকের জন্য আমি বিহ্বলও হয়ে পড়লাম। কিন্তু সে ঘোর কেটে যেতে দেরি হয় নি আমার—"

"এ সব কি বলছেন আপনি! আমি তো আপনার কাছে আসি নি—"

"তুমি সুন্দরী, ছলনাই তোমার ভূষণ। আমি তোমার উপর রাগ করছি না। কিন্তু আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি তা অবিশ্বাস করবার ক্ষমতা আমার নেই!"

"আপনি ভুল করছেন মহর্ষি। সত্যিই আমি আপনার কাছে আসি নি। আমার অপেক্ষায় বসে' বসে' আপনি হয়তো তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন। [illegible] তন্দ্রার ঘোরে সম্ভবত স্বপ্ন দেখেছেন আপনি—"

"তুমি যখন বলছ তখন তাই ঠিক। আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু আমার যতদূর ধারণা আমি জেগেই ছিলাম। থাক, এখন ওসব আলোচনা করে' লাভই বা কি! কুমার সুন্দয়ানন্দের কাছে আমাকে নিয়ে চল, তিনি আমার সম্বন্ধে যা ঠিক করবেন তাই আমি মেনে নেব"

"আপনি আশা করি, যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে এখনও প্রস্তুত আছেন?"

"না। স্বেচ্ছায় আমি যূপকাষ্ঠে আর গলা বাড়িয়ে দেব না। তবে কুমার যদি জোর করে' আমাকে বধ করেন সে আলাদা কথা"

"কিন্তু একটু আগে তো আপনি প্রস্তুত ছিলেন"

"সেজন্য আমি লজ্জিত। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হয়েছিল"

চার্ব্বাক ও সুরঙ্গমা কিছুক্ষণের জন্য পরস্পরের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

চার্ব্বাক সহসা বলিল—"আমি কিন্তু তোমাকে ভালবাসি সুরঙ্গমা। এখনও চাই তোমাকে—"

"কিন্তু—"

সুরঙ্গমা আর কিছু বলিতে পারিল না। অঞ্চলপ্রান্ত তুলিয়া নয়ন দুইটি আবৃত করিল।

"কাঁদছ না কি—!"

সুরঙ্গমা মুখ হইতে অঞ্চলপ্রান্ত সরাইয়া দিল। চার্ব্বাক লক্ষ্য করিল সত্যই তাহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র।

"কাঁদছ কেন সুরঙ্গমা হঠাৎ"

"হঠাৎ নয়, চিরকালই কাঁদছি। কান্নার উপর হাসির যে মুখোশটা পরে' থাকি সেটা মাঝে মাঝে সরে যায়। এখন গিয়েছিল। ভেবেছিলাম আপনার মধ্যে প্রকৃত প্রেমিকের দর্শন পেয়েছি, কারণ আমাকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন আপনি, কিন্তু এখন দেখছি সব মিথ্যা, সব ভুল—"

চার্ব্বাক হাসিয়া উত্তর দিল, "ঠিকই ধরেছ, সব মিথ্যা, সব ভুল। আবার অন্য দিক থেকে যদি দেখ বুঝতে পারবে, সব সত্য সব ঠিক। সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করা খুবই কঠিন"

"বুঝতে পারছি না আপনার কথা। আমি মূর্খ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন"

"আমি তোমার জন্যে প্রাণ বিসর্জ্জন দেব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কারণ আমি জানতাম—মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে যজ্ঞীয় বলি রূপে মনোনীত করবেন না, আমার শরীরে অনেক খুঁত আছে। এখন

অকপটে স্বীকার করছি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করতে পারব, হয়তো তোমাকে নিয়ে চলে যেতেও পারব এ দুরাশা আমার হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ আশঙ্কাও মনে হয়েছিল মহর্ষি পর্ব্বত যজ্ঞীয় বলিরূপে আমাকে মনোনীত না করলেও তাঁর কন্যার প্রণয়ীরূপে আমার জীবনান্ত ঘটাতে পারেন। তাই তোমাকে সুন্দরানন্দের কাছে পাঠিয়েছিলাম জানতে যে তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা। আমার এ বিশ্বাসও ছিল তুমি অনুরোধ করলে নিশ্চয়ই তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু তুমি যখন ফিরে এসে বললে যে ব্রহ্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না, অদ্ভুত ভোজবাজি দেখিয়ে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেও তুমি যখন হাজির করলে আমার সামনে—"

সুরঙ্গমা আবার প্রতিবাদ করল।

"বিশ্বাস করুন মহর্ষি, আমি ওসব কিছুই করিনি। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চয় আপনি স্বপ্ন দেখেছেন ওটা। কুমার আপনাকে ক্ষমা করেছেন এই কথাটা বলবার জন্য আমি অনেকক্ষণ থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি"

"কুমার আমাকে ক্ষমা করেছেন ?"

"হ্যাঁ। আর একটি সুসংবাদও আছে—মহর্ষি পর্ব্বত আমাকে বলির পশুরূপে নির্ব্বাচন করেন নি। যজ্ঞের জন্য একটি কিরাত বালককে কিনে আনা হয়েছে—"

"ও—"

চার্ব্বাক কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর বলিল—"আমার তাহলে তো আর কুমারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, গোপনতারও প্রয়োজন নেই। কোথাও রাতটা কাটিয়ে সকালেই ফিরে যাব"

সুরঙ্গমার মুখটা পাংশুবর্ণ হইয়া গেল সহসা।

"আমাকে ফেলে চলে যাবেন ?"

"তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? যদি যাও আমি কৃতার্থ হব"

"রাজনর্ত্তকীকে এমন ভাবে হরণ করে' নিয়ে যাওয়া কি নিরাপদ ?"

"তোমার জন্য বিপদ বরণ করতেও আমি প্রস্তুত"

"চলুন তাহলে ভেবে দেখি"

"কোথা যাব"

"আমার সঙ্গে আসুন"

"কোথা নিয়ে যাচ্ছ আগে বল"

"আমার শয়নকক্ষে"

"সেখানে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই তো—"

"বিপদ বরণ করতে তো আপনি প্রস্তুত !"

"কুমার কোথা আছেন ?"

"তিনি নিজের ঘরে আছেন। আমার ঘরে তিনি যদি এসেও পড়েন আপনার আশঙ্কার কোনও কারণ নাই"

"চল—"

সুরঙ্গমা ভূমি হইতে বর্ত্তিকাটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইল। চার্ব্বাক তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল।

তখনও রাত্রি শেষ হয় নেই।

হঠাৎ সুরঙ্গমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সিংহটা গর্জ্জন করিতেছে। একটু থামিয়া পুনরায় গর্জ্জন করিল। গর্জ্জনের পর গর্জ্জন হইতে লাগিল। তাহার পর চতুর্দ্দিক নীরব হইয়া গেল। সুরঙ্গমা ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া বসিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল চার্ব্বাক

অঘোরে ঘুমাইতেছে। সন্তর্পণে সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর কিন্তু পুনরায় তাহাকে থামিয়া যাইতে হইল। সিংহের প্রচণ্ড গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক পুনরায় প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা গর্জ্জন হইল, মনে হইল যেন দুইটা সিংহ ডাকিতেছে। পর পর দুইটা ডাক দুই রকম। সুরঙ্গমার সব কথা মনে পড়িয়া গেল। মিম্মির সিংহিনীর ডাক ডাকিয়া ওই পুরুষ-সিংহকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন, সিংহিনীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়া ওই প্রবল প্রতাপে বলিষ্ঠ পশুরাজ বন্দী হইয়াছিল। মিম্মির কি পুনরায় তাহাকে উত্তেজিত করিতেছে? সুরঙ্গমা দ্রুতপদে মিম্মিরের গৃহের দিকে আগাইয়া গেল। দেখিল তাহার ঘরের দ্বার খোলা। ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল কেহ নাই। পুনরায় গর্জ্জন হইল। পর পর দুইবার—একটা আহ্বান আর একটা উত্তর। সুরঙ্গমা বাহির হইয়াছিল কুমারের সন্ধানে। যে নূতন ক্রীড়নকটি লইয়া খেলা করিতে তিনি তাহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন সেটি তাঁহাকে দেখাইবার জন্য সে মনে মনে ছটফট করিতেছিল। নিদ্রামগ্ন দুর্দ্ধর্ষ চার্ব্বাককে দূর হইতে দেখাইবার জন্য সে কুমারকে ডাকিতে বাহির হইয়াছিল। কিন্তু সিংহের গর্জ্জনে সে ক্ষণকাল অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিম্মির লোকটা পাগল না কি! মিম্মিরের শূন্যকক্ষে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুরঙ্গমা আবার বাহির হইয়া আসিল। বাহির হইয়া সুন্দরানন্দের গৃহের উদ্দেশেই আবার পদচালনা করিল সে। অন্ধকার ক্রমশ স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছিল। কাননের পক্ষীকুল সহসা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিল। তাহার পর আবার থামিয়া গেল।

…কুমার সুন্দরানন্দের গৃহের সম্মুখে একটি শিবিকা দেখিয়া সুরঙ্গমা বিস্মিত হইল। শিবিকায় কে আসিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সুরঙ্গমা আরও বিস্মিত হইল। দেখিল একটি বিগত-যৌবনা রমণী কুমারের সহিত আলাপ করিতেছে। তাহার নয়নে অশ্রু। সুরঙ্গমাকে দেখিয়া সে নীরব হইল এবং অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

কুমার হাসিয়া বলিলেন—"এই যে সুরঙ্গমাও এসে পড়েছ দেখছি। ভাল সময়েই এসেছ, বস"

সুরঙ্গমা একটি আসনে উপবেশন করিয়া নবাগতার দিকে কয়েকবার সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে কুমার তাহার পরিচয় দিলেন।

"এই ভদ্রমহিলা জানি না কি করে' খবর পেয়েছেন যে আমি যজ্ঞে জোর করে' একটি নারী বলিদান দিচ্ছি। উনি এ খবরও পেয়েছেন যদি অন্য কোনও নারী আমার এ যজ্ঞে স্বেচ্ছায় আত্ম-বিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত থাকে তাহলে প্রথম নারীটি অব্যাহতি পাবে। সেজন্য উনি নিজেকে যূপকাষ্ঠে সমর্পণ করতে এসেছেন এবং আমাকে অনুরোধ করছেন প্রথমা নারীটিকে মুক্তি দিতে"

সুরঙ্গমা নির্ব্বাক বিস্ময়ে মহিলাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কুমার সুরঙ্গমাকে দেখিয়া বলিলেন—"ইনিই সেই নারী যিনি যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে চাইছিলেন, কিন্তু মহর্ষি পর্ব্বত এঁকে মনোনীত করেন নি। কোনও নারীকেই তিনি নির্ব্বাচন করবেন না। অন্য ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আপনি পথশ্রান্ত হয়েছেন নিশ্চয়, একটু বিশ্রাম করুন। আপনার মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমার দ্বারা আপনার যদি কোনও উপকার হয় তা আমি নিশ্চয় করব"

এইবার মহিলাটি সুন্দরানন্দের মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি মহৎ নই, আমি অতি নগণ্য, সামান্য

রূপজীবী মাত্র। জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আপনার যজ্ঞের কথা শুনলাম। তখন মনে হল আমার এই তুচ্ছ জীবন যজ্ঞে সমর্পণ করলে যদি কোনও নিরীহ রমণীর প্রাণরক্ষা হয় তাহলে তাই করা উচিত। সেইজন্যই আমি এসেছি। আমার জীবনে সুখের লেশমাত্র নেই, অনেক সন্ধান করেও সুখের নাগাল আমি পাই নি, তাই আমি জীবন-বিসর্জ্জন করতে চাই, আমাকে মহৎ বলে মহত্ত্বের অপমান করবেন না। আমি মহৎ নই, হতভাগিনী"

কুমার একথায় বিচলিত হইলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কোথা থেকে আসছেন"

"হর্ষ-নীড় থেকে"

সুরঙ্গমা প্রশ্ন করিল, "আপনার নাম কি"

"নীলোৎপলা"

কুমার বলিলেন, "বেশ, আপনি যতদিন খুশী আমার কাছে থাকুন। আপনি যাতে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা আমি করব"

যে ভৃত্যটি বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল সুন্দরানন্দ তাহাকে আদেশ দিলেন নীলোৎপলার আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। প্রণাম করিয়া নীলোৎপলা ভৃত্যের সহিত চলিয়া গেল।

কুমার সুরঙ্গমার দিকে হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তোমাকে বাঁচাবার জন্য সবাই প্রাণ-বিসর্জ্জন করতে চায়। কেবল চার্ব্বাক নয়, নীলোৎপলাও। মহর্ষি কোথায় এখন?"

"আমার শয়নকক্ষে দেখবেন চলুন"

"সেখানে কি করছেন তিনি? প্রাণ-বিসর্জ্জন দেবার মহড়া দিচ্ছেন না কি"

"না, ঘুমুচ্ছেন। উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ঘুম হয় নি মহর্ষির"

"সত্যি কি তোমার জন্য প্রাণ-বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছেন উনি ?"

"হয়েছিলেন, এখন কিন্তু মত পরিবর্ত্তন করেছেন। বলছেন মোহগ্রস্ত হয়ে উনি নিজের বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করছিলেন বলে লজ্জিত"

"এখন মোহমুক্ত হয়েছেন বুঝি"

"না, মোহমুক্ত হবার বাসনাই ওঁর নেই। কিন্তু বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ উনি আর করবেন না। আমি সুলভ নই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে উনি বিষণ্ণ অন্তঃকরণে ফিরে যেতে চাইছিলেন, আমি জোর করে' ওঁকে ফিরিয়ে এনেছি"

"কেন"

"আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে। এতক্ষণে লোকটিকে ভাল লেগেছে—"

কুমার মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন, "কেন লেগেছে বুঝেছি"

"কেন বলুন তো"

সুরঙ্গমার নয়নে হাসি চিকমিক করিতে লাগিল।

"তুমি যে দুর্ল্লভ—এই সত্যটা ওঁর ব্যবহারে প্রকাশ পেয়েছে বলে"

"আমি দুর্ল্লভ একথা আপনিও বলবেন ?"

"সত্যি কথা বললে তাই বলতে হয়। আমি সত্যই তোমাকে লাভ করেছি কি না ঠিক জানি না এখনও"

সুরঙ্গমা উঠিয়া আসিয়া সুন্দরানন্দের কণ্ঠলগ্না হইল।

"জানেন, নিশ্চয় জানেন। বলুন জানেন—"

সুন্দরানন্দের অধরে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল। এই হাসিকে

সুরঙ্গমার বড় ভয়। এই হাসি নীরব ভাষায় যেন বলে—আমাকে চেন না? আমি পুরুষ। আমি স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছি, যে কোনও মুহূর্ত্তে চলে যেতে পারি।

"বলুন—"

"যা অনেকদিন থেকে জান, তা আবার নতুন করে' শুনতে চাইছ কেন। তার চেয়ে চল, তোমার নূতন প্রণয়ীটির সঙ্গে আলাপ করে' আসি"

"প্রণয়ী বলছেন, কেন। খেলনা বলুন। আপনিই তো দিয়েছেন"

"বেশ খেলনাই। চল আলাপ করি। একটু কিন্তু ভয় ভয় করছে"

"কেন"

"লোকটি শুনেছি অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিত লোকের কাছে কি বলতে কি বলে ফেলব—"

"আপনি কুমার সুন্দরানন্দ। আপনি যা বলবেন তাই সুন্দর, যা করবেন তাই আনন্দজনক"

সুরঙ্গমা আবেগভরে তাঁহাকে পুনরায় চুম্বন করিল। তাহার পর উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইয়া কুমার দেখিলেন বৃদ্ধ মন্ত্রী জিমভ্রক দ্রুতপদে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। গতিরোধ করিতে হইল। মন্ত্রী মহাশয় প্রায় ছুটিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কুমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে। সিংহটা খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে। মিম্মির কাছের একটা ঝোপে ছিলেন। সিংহের কবলে পড়েছেন তিনি। সিংহটা তাঁকে এতক্ষণ নিশ্চয়ই টুকরো টুকরো করে' ফেলেছে। আমাদের ভয় হচ্ছে আর কিছু না করে। অনেকে

এ খবর জানেই না'। বিশ্বনাথ নামে কর্ম্মচারীটি ছুটে এসে খবরটি দিলে আমাকে। অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার"

কুমার ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটি তীক্ষ্মমুখ ছোরা এবং ধনুর্ব্বাণ সংগ্রহ করিলেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সুরঙ্গমার হস্তে ধনুর্ব্বাণ দিয়া বলিলেন—"তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। সাহসও আছে। তুমিই চল আমার সঙ্গে। মন্ত্রীমহাশয় আপনি এখানে থাকুন"

"কোথা যাচ্ছেন আপনারা? হঠকারিতা করবেন না। মনে রাখবেন এ কস্তুরী মৃগ নয়, সিংহ—"

কুমারের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিল।

বলিলেন—"রাখব"

সিংহের খাঁচার নিকট গিয়া দেখা গেল খাঁচাটি সত্যই ভাঙিয়া গিয়াছে, একটা গাছের গুঁড়ি হেলিয়া পড়িয়াছে।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি বলিল—"একটু আগে উনি সিংহটাকে সেই রকম শব্দ করে উত্তেজিত করছিলেন, আমি নিজে শুনেছি"

নিকটে প্রকাণ্ড একটা গাছ ছিল।

সুন্দরানন্দ বলিলেন—"চল এইটেতে ওঠা যাক। দেরী কোরো না, তাড়াতাড়ি উঠে পড়"

গাছে উঠিয়াই বীভৎস দৃশ্যটি সুন্দরানন্দ দেখিতে পাইলেন। গাছের নীচেই একটি ঝোপের ধারে বসিয়া সিংহটি মিস্ত্রিকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইতেছিল।

সুরঙ্গমা চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, "আমি তীর ছুড়ব?"

"না, দরকার হলে পরে ছুড়ো—"

এই কথা বলিয়া কুমার বৃক্ষশিখর হইতে বিদ্যুৎবেগে লম্ফ দিয়া সিংহের উপর গিয়া পড়িলেন এবং প্রকাণ্ড ছোরাটি তাহার পৃষ্ঠদেশে আমূল বসাইয়া দিলেন। সিংহের গর্জ্জনের সহিত সুরঙ্গমার চীৎকারও

মিশিল, কারণ সুরঙ্গমাও সঙ্গে সঙ্গে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সুন্দরানন্দ লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন সিংহের পিঠের উপর, সুরঙ্গমা পড়িল তাহার ব্যায়ত মুখের সম্মুখে। সুন্দরানন্দ যদি ত্বরিত গতিতে লাফাইয়া উঠিয়া সুরঙ্গমাকে সরাইয়া না লইতেন সুরঙ্গমারও সেদিন মৃত্যু হইত। ছোরার আঘাতে সিংহের মেরুদণ্ড এবং হৃদয় ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে গর্জ্জন করিতেছিল বটে কিন্তু উঠিতে পারিতে-ছিল না। কুমার সুরঙ্গমাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইলেন, সুরঙ্গমার মৃণাল বাহু কুমারের বলিষ্ঠ গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া রহিল। সুরঙ্গমা কাঁপিতেছিল। কুমার তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। "কাঁদছ না কি—"

"না"

সুরঙ্গমা সুন্দরানন্দের বুকে মুখ লুকাইয়াছিল।

"কই দেখি—"

সুরঙ্গমা কুমারের মুখের দিকে চাহিল। দেখিলেন তাহার নয়ন-পল্লব আর্দ্র, কিন্তু মুখে হাসি। সিংহ পুনরায় একটা গর্জ্জন করিয়া নীরব হইল।

কুমার বলিলেন, "চল এইবার তোমার নূতন খেলাটা দেখে আসি। তারপর মিম্মিরের শেষকৃত্য করা যাবে"

২৭

প্রজাপতিযুগল কবির ঘরে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়াছিল। কবি তাহাদের দেখিতে পাইতেছিলেন না, কারণ তাহারা এবার টেবিল-বাতির শেডের উপর বসে নাই, কবির ঠিক মাথার উপর ছাতে বসিয়াছিল। মনে হইতেছিল পাশাপাশি যেন দুইটি বহুবর্ণরঞ্জিত চিত্র আঁকা আছে। কবি কিন্তু তাহা দেখিতে পাইতেছিলেন না, তিনি তন্ময় হইয়া লিখিতেছিলেন।

"যে আলেয়াকে কেন্দ্র করে' আমার স্বপ্নজীবনে ও বাস্তবজীবনে সত্য-মিথ্যার বিচিত্র লীলা মূর্ত্ত হয়েছে, দূরবীণের পরকলার ভিতর দিয়ে যার কাছে দৃষ্টির দূত পাঠিয়েছি দিনের প্রখর আলোকে, রাত্রির নিবিড় অন্ধকারেও—সেই আলেয়া দেখতে দেখতে সামান্য কেরোসিনের ডিবে হয়ে গেল আমার চোখের সামনে। শুধু তাই নয়, আমার ঘরের ভিতরে এসে দুর্গন্ধ এবং ধূমও বিকীরণ করতে লাগল সে যখন তখন। নিঃসংশয়ে বুঝলাম সে তার স্বামীকে ছেড়ে এসেছে, আত্মদান করেছে ওই নিত্য-নূতন-মোটর-বিহারী লোকটার কাছে, প্রেমের জন্য নয়, অর্থের জন্য। আলেয়ার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি ভাবি, কিন্তু দেখি কিছু সংশয় থেকেই যাচ্ছে। মনে হচ্ছে ওর মধ্যে এমন একটা কি আছে যা আমি এখনও ধরতে পারি নি—যা···অর্থাৎ ওর সম্বন্ধে মোহ গিয়েও যেন থেকে যাচ্ছে। আমি নিজে লাইফইনশিওরেন্সের দালাল, ওকে আমার কোম্পানীর এজেন্ট করে' নিয়েছি, যা কাজ পাই তার অর্দ্ধেক ওকেই দিই। প্রায় রোজই আসে ও আমার কাছে, ওর

জন্যে অপেক্ষাই করি রোজ, কিন্তু সুখ পাই না, নাগালের মধ্যে পেয়েও মনে হয় পাই নি, নীচে সেই বলিষ্ঠ ছোকরা স্টীয়রিং ধরে' বসে' থাকে, কখনও হিলম্যান, কখনও ফোর্ড, কখনও বা অস্টিন। মনে মনে ভাবি ছিছি আলেয়া কতখানি নেবে গেছে! কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারি না। আলেয়া সামনে এসে দাঁড়ালে মনে হয় যেন কৃতার্থ হয়ে গেছি। শেষে একদিন আমাকেও নাবতে হল। যা এতদিন আভাসে-ইঙ্গিতে ঠারে ঠোরে বলবার চেষ্টা করছিলাম তা স্পষ্ট করে' বলে' ফেললাম একদিন।

"আলেয়া তুমি একদিন ট্যাক্সি করে' একা এস। ট্যাক্সি ভাড়া আমি দিয়ে দেব। ও লোকটাকে সঙ্গে করে' এন না!"

আলেয়া মুখ টিপে একটু হেসে চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর বললে—"হঠাৎ এ অনুরোধ?"

তোমাকে আমি চাই। নীচে একজন পাহারাদার বসে' থাকলে তোমাকে পেয়েও যেন পাই না"

আলেয়া অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল যেন। ঘাড় ফিরিয়ে জানালার দিকে চাইলে একবার, চেয়ে রইল কয়েক মূহূর্ত্ত। তার মুখের মৃদু হাসিটা নিবে গেল।

"আসবে?"

আমার দিকে ফিরে আবার কয়েক মূহূর্ত্ত চেয়ে রইল সে আমার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মনে হল মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"কথা বলছ না কেন! আসবে? আজই রাত্রে এস, এগারটার পর অপেক্ষা করে থাকব"

"আপনার কাছ থেকে এ ব্যবহার প্রত্যাশা করি নি"

একটা রূঢ় সুর ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বরে।

"আমি বহুকাল ধরে' তোমাকে চাইছি। তোমার বিয়ের আগে থেকে। তোমার যখন বিয়ে হ'য়ে গেল তখন—"

আবেগভরে সমস্ত কথা বললাম, মনে হল বললাম, কিন্তু কি যে বললাম তা মনে নেই। সমস্ত শুনে নিস্তব্ধ হয়ে রইল আলেয়া।

"আসবে? এস, বুঝলে—"

"ভেবে দেখব"

উঠে দাঁড়াল সে।

"তোমার জন্য অপেক্ষা করব আজ রাত্রে"

কোন উত্তর না দিয়ে নেবে গেল। একটু পরে গাড়ি স্টার্ট করার শব্দ পেলাম, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড দামী মোটরখানা চলে যাচ্ছে।

সেদিন সত্যিই অপেক্ষা করছিলাম তার জন্যে। দূরবীণ হাতে নিয়ে বসেছিলাম জানলার কাছে। হঠাৎ কি মনে হল দূরবীণ দিয়ে অবঞ্চনার ঘরটাও দেখতে লাগলাম। অবঞ্চনার ঘর প্রায়ই দেখতাম রাত্রে বসে, যতক্ষণ না আলো নিবে যেত। অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, বিশেষত শিখর সেন আসার পর থেকে। বারান্দার আলোটা জ্বলছিল সেদিন কেন জানি না। রাজমিস্ত্রি এসে অবঞ্চনার দরজার সামনে কি যেন করছিল দিনের বেলা। কাঁচা সিমেন্টে পাছে কেউ পা দিয়ে দেয় তাই বোধহয় আলোটা জ্বেলে রেখেছে...অবঞ্চনার ঘরের কপাট খোলা...ঘরে আলো জ্বলছে না। তারপরই তাকে দেখতে পেলাম যে অবঞ্চনাকে খুন করেছে...চুপি চুপি নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। তখন ভাবতেই পারি নি যে ও অবঞ্চনাকে খুন করবার জন্যে ঘরে ঢুকছে। অবঞ্চনা যে মারা গেছে তা-ও আমি জেনেছিলাম অনেক পরে, কারণ একটু পরেই আমাকে কোলকাতা ছেড়ে চলে'

যেতে হয়েছিল।···টং করে' ঘড়িতে একটা বাজল। মনে হ'ল আলেয়া আর আসবে না, শোওয়ার জোগাড় করছি এমন সময় একখানা মোটর এসে দাঁড়াল আমার বাসার সামনে। একটু পরেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। উৎকর্ণ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, বুকের ভিতরটা কাঁপতে লাগল। আলেয়াই এসে ঘরে ঢুকল। দেখলাম সে-ও কাঁপছে!

"আমাকে বাঁচান আপনি—"

আমার পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি তুলে সোফায় বসালাম।

"কেন, কি হয়েছে—"

"উনি এসেছেন"

"উনি মানে?"

"আমার স্বামী। এলাহাবাদ থেকে সোজা চলে এসেছেন মোটরে—"

"কে নিরুপমবাবু?"

"হ্যাঁ—"

"তারপর? বিক্রমবাবু কোথা"

"তিনি নিজের ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। আমি আস্তে আস্তে উঠে বেরিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে আসব বলে। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে কাপড় বদলাচ্ছিলাম এমন সময়ে কে যেন হুড়মুড় করে' বিক্রমবাবুর ঘরে ঢুকল। কপাটের ফাঁক দিয়ে দেখলাম উনি। আমি আর দাঁড়ালাম না, সোজা আপনার কাছে চলে' এসেছি। আপনি বাঁচান আমাকে—"

"নিশ্চয় বাঁচাব, ভয় কি"

"আমাকে কোলকাতার বাইরে নিয়ে চলুন। এখানে থাকা

আর নিরাপদ নয়। উনি হয় তো খোঁজ পেয়ে এখানেও চলে' আসবেন"

"এলেই বা। এটা কি মগের মুলুক। অত ভয় পাচ্ছ কেন"

"ওঁর হাতে একটা বন্দুক দেখলুম। না, না, কমলবাবু, বড্ড ভয় করছে আমার। চলুন, পালাই এখান থেকে। এখুনি চলুন"

"এখুনি? কোথায় যাব। কোলকাতার বাইরে গিয়ে থাকব কোথায়? হোটেলে থাকাটা কি ভাল দেখাবে?"

"বিক্রমবাবুর মধুপুরে বাড়ি আছে একটা। সেখানকার মালী চেনে আমাকে, একবার গিয়েছিলাম। সেইখানে যাই চলুন"

"আমি সঙ্গে থাকলে কেউ আবার কিছু বলবে না তো"

"কে কি বলবে। চলুন, এই ট্যাক্সিতেই বেরিয়ে পড়ি"

একটু ইতস্তত করছিলাম তবু।

আলেয়া হঠাৎ আমার হাত দুটো ধরে অনুনয় করতে লাগল, "চলুন, চলুন, আর দেরি করবেন না"

যেতে হল। অবন্ধনার খবর রাখবার অবসরই পেলাম না।

ফিরলাম এক মাসেরও পরে। আলেয়াকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফিরলাম। আলেয়া একটা ইজারার ভিতর লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছিল। এসে শুনলাম অবন্ধনাও মারা গেছে। হঠাৎ যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল সব। রাত্রি প্রভাত হ'ল, না দিবস রাত্রিতে উত্তীর্ণ হ'ল, স্বপ্ন বাস্তব হ'ল, না বাস্তব স্বপ্নে হারিয়ে গেল—তা জানি না। সব বদলে গেল কিন্তু। মনও। দূরবীণটা বিক্রি করে' দিলাম। নূতন একটা দূরবীণ পেলাম নিজের অন্তরে। সে দূরবীণ দিয়ে দেখতে লাগলাম আলেয়াকে নয় সুনন্দাকে। হঠাৎ একদিন খবর পেলাম অবন্ধনার রহস্যময় মৃত্যুর কারণটা পুলিশ এখনও নাকি

আবিষ্কার করতে পারে নি। অনুসন্ধানের ভার পড়েছে না কি শিখর সেনের উপর। প্রথমটা বিস্মিত হলাম, তারপর মনে একটু কৌতুক জাগল। শিখর সেন? মনের অবস্থা যদি পূর্ব্বের মতো থাকত তাহলে হয় তো চেষ্টা করে' শিখর সেনের সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু মনের সে অবস্থা ছিল না, শিখর সেনের সঙ্গে পথেও যদি দেখা হ'ত তাহলেও হয় তো বলতাম, কিন্তু যোগাযোগ হ'ল না। তখন শিখর সেনের মানসিক অবস্থা কি ছিল তা জানতে পারছি তার ডায়েরী থেকে। শিখর সেন লিখছে—"সমস্ত দিন দ্বন্দ্ব করেছি নিজের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব করে' ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। মনের মধ্যে যে নির্ম্মম বিচারক বসে' আছেন তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়তে চান না। তাঁর সিদ্ধান্ত অবন্ধনার মৃত্যু হওয়া উচিত। ওই পাপীয়সীকে মৃত্যুদণ্ড না দিলে অনেকের মৃত্যুর কারণ হবে ও। ব্যক্তিগত মায়ামমতার স্থান নেই কোন বিচারে। তিনি যেন সমস্তক্ষণ আমার কানে কানে বলছেন—শিখর সেন, বিচলিত হ'য়ো না। সমাজের রক্ষক তুমি, যারা অসহায়, যারা অন্যায়ভাবে পীড়িত, তারা তোমার উপর বিশ্বাস করে' আছে, তুমি বিশ্বাসঘাতক হবে? এর জন্যেই কি মাইনে খাচ্ছ তুমি? এই নির্ম্মম বিচারকের সঙ্গে তর্ক করছিল আমারই মনের আর একটা অংশ। ঠিক তর্ক করছিল না, দর্শনের উচ্চ শিখরে বসে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছিল। সে বলছিল, তুমিও কত দোষে দুষ্ট মানুষ, বিচার করবার কি অধিকার আছে তোমার? মানুষ কেন পাপের পথে পা বাড়ায় তা কি তুমি জান না? সে জ্ঞান তোমার যদি হয়ে থাকে তাহলে কি তুমি শাস্তি দিতে পার? তুমি ভালবাসতে পার, ক্ষমা করতে পার—শাস্তি দিতে পার না। অবন্ধনা নিজেই হয় তো নিজেকে শাস্তি দেবে একদিন। সায়ানাইডের শিশিটা কি দেখনি সেদিন? নির্ম্মম বিচারক বললেন, ওসব কিছু দেখবার দরকার নেই

আমার। আমার কর্ত্তব্য আইন অমান্যকারীকে আদালতে হাজির করে' দেওয়া। নিতান্তই তা যদি না পারি এমন ব্যবস্থা করা যাতে ও আর বে-আইনী কাজ না করতে পারে। ব্যক্তিগত মায়ামমতার স্থান নেই এতে। ব্যক্তিগত ঘৃণা ভালবাসার প্রকোপে যে মানুষ কর্ত্তব্য থেকে বিচলিত হয় সে মানুষ নয়, অমানুষ। নির্ব্বিকার কর্ত্তব্য-পরায়ণ মানুষই মানবতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।...সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি...চোখের সামনে সেই সায়ানাইডের শিশিটাও মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে বারবার, আর মাথার শিয়রে টেবিলের উপর রাখা সেই জলের গ্লাসটা। সমস্ত দিন পরে পরিশ্রান্ত হয়ে যখন ফিরছিলাম তখন ভাবতে ভাবতে আসছিলাম অবন্ধনাকে আবার একবার বোঝাব ভাল করে'। কিন্তু সে সুযোগ পেলাম না। নীচে দেখলাম সেই গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, ড্রাইভার হর্ণ দিচ্ছে, অবন্ধনা নেবে এল, আমার দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।...বোর্ডিংয়ের জানলা কপাটে রং দিচ্ছে, সিঁড়ির রেলিঙেও রং দিয়েছে...উঠতে গিয়ে হাতে রং লেগে গেল। অবন্ধনার মুচকি হাসিটা মনে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল, সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়, রাতে কিছু খেলামও না, খাবার প্রবৃত্তিও হল না। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। সকালে চাকরটা দেখলাম জাগাচ্ছে আমাকে। সাধারণত কেউ আমাকে জাগায় না, একটু অস্বাভাবিক মনে হল। বিরক্তও হলাম।

"কিরে, ডাকছিস কেন—"

"ওপরে যে নার্স মাইজি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন"

"মারা গেছেন? বলিস কি—"

উঠে বসলাম তড়াক করে। চাকরটা বললে—"ওঁর ঘরের কপাট তো খোলাই থাকে, আমি রোজ ভোরে গিয়ে ওঁকে চা করে' দিয়ে

আসি। আজও চা করে' ওঁকে ডাকলাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। কয়েকবার ডাকাডাকির পরও যখন সাড়া পেলাম না, কি করব ভাবছি, একটা দমকা হাওয়ায় ওঁর মুখের পাতলা চাদরটা উড়ে গেল, মুখ দেখে ভয় হল, তাড়াতাড়ি ম্যানেজারবাবুকে খবর দিলাম। তিনি তাড়াতাড়ি গেলেন, গিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—"মারা গেছেন। আপনাকে খবর দিতে বললেন। ম্যানেজারবাবু হাউ হাউ করে' কাঁদছেন বসে'। চলুন আপনি—"

গিয়ে দেখলাম অবু সত্যিই মারা গেছে। কি রকম যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মনে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ সঞ্চারিত হল। নির্ম্মম বিচারক বললেন—আপদ গেছে। কিন্তু আমার আর এক 'আমি' হায় হায় করতে লাগল! অবু, আমার অবু, আর তাকে দেখতে পাব না? আর সে কথা কইবে না?

আমার আচ্ছন্ন ভাবটা যখন কেটে গেল তখন দুটি জিনিস লক্ষ্য করলাম। অবন্ধনার মাথার কাছে যে জলের গ্লাসটা আছে সেটার ঢাকা খোলা, তাতে আধ-গেলাস মাত্র জল রয়েছে, গ্লাসের গায়ে সবুজ রঙের দাগ—যে সবুজ রং বোর্ডিংয়ের চতুর্দ্দিকে লাগানো হচ্ছে সেই রং। পাশেই সায়ানাইডের শিশিটা খোলা, তাতেও রং। ভাল করে' লক্ষ্য করে দেখলাম, গ্লাসের গায়ে আঙুলের ছাপও উঠেছে। দ্বিতীয় যে জিনিসটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল—সেটি হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট পায়ের দাগ। অবন্ধনার ঘরের চৌকাঠের সামনে খানিকটা জায়গায় কাল বিকেলে সিমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল। সেই সিমেণ্টের উপর পায়ের স্পষ্ট দাগ রয়েছে।

অবন্ধনার মৃত্যুর সম্বন্ধে তদন্ত করবার ভার আমিই পেয়েছি। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে নিঃসন্দেহে জানা যাচ্ছে সায়ানাইড

খেয়েই ওর মৃত্যু হয়েছে। ও কি নিজে ইচ্ছে করে সায়ানাইড খেয়েছে? তাহলে সে কথাটা কি ও লিখে যেত না? কাচের গ্লাসের গায়ে কার আঙুলের ছাপ রয়েছে? অবন্ধনার ডান হাতে সামান্য একটু রং ছিল বটে, কিন্তু ওর আঙুলের ছাপের সঙ্গে গ্লাসে যে ছাপ পাওয়া যাচ্ছে তার কিছুমাত্র মিল নেই। তাছাড়া ওই পায়ের দাগটাই বা কার? বোর্ডিংয়ের অনেকেরই আঙুলের ছাপ আর পায়ের ছাপ নিয়ে পাঠিয়েছি বিশেষজ্ঞের কাছে, যারা যারা অবন্ধনার ঘরে আসত সকলেরই—ম্যানেজারের, চাকরটার, আরও তিনজনের, সেই কালোবাজারীটাকে অ্যারেষ্ট করেছি, তারও আঙুলের ছাপ পায়ের ছাপ নেওয়া হয়েছে……

রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞ লিখছেন—যে পায়ের ছাপ সিমেন্টের উপর পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে একজনেরও পায়ের ছাপ মেলে নি। আঙুলের ছাপও নয়।

আশ্চর্য্য, কার ছাপ তাহলে ওগুলো! একটা লোক না একাধিক লোক ছিল? রহস্যের সমাধান কিন্তু করতেই হবে। অবন্ধনা আত্মহত্যা করে নি। ওর খাবার জলের সঙ্গে কেউ সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছে। কে সে? কেনই বা দিলে? ঘর থেকে একটি জিনিস তো চুরি যায় নি। প্রণয়-ঘটিত ঈর্ষা? প্রতিহিংসা? হতে পারে। অবন্ধনা যে সমাজে ঘুরে বেড়াত সে সমাজ ভদ্র সমাজ নয়। লোকটাকে কিন্তু আমি খুঁজে বার করবই।…"

শিখর সেন যে আমারই সহায়তায় শেষকালে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবে তা আমার কল্পনাতীত ছিল। ডায়েরীর যে অংশটুকু উপরে উদ্ধৃত করেছি ঠিক তার পরেই আমার সঙ্গে শিখরের দেখা হয়ে গেল রাস্তায়।

"তার পর, কি খবর, অনেকদিন দেখা হয় নি তোর সঙ্গে—"

শিখর দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ তার চোখের দিকে তাকাই নি, তাকিয়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। অমন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি আমি আর কখনও দেখি নি। আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েই রইল সে, অনেকক্ষণ কোন কথাই বলল না।

"কি করছিস আজকাল—"

আমি? কি আবার করব!" একটু হেসে উত্তর দিলে সে—"চাকরি করছি। না, আজকাল চাকরির চেয়ে বেশী কিছু করছি। অবন্ধনা মারা গেছে শুনেছিস তো? সেই যে নার্স একটি তেতালার ঘরে থাকত—সে কে জানিস? অবু—"

"জানি, সব শুনেছি। যে রাত্রে সে মারা যায় সেই রাত্রেই আমি কোলকাতার বাইরে চলে যাই। তার মৃত্যুর একটু আগেই বোধহয় তুই ওর ঘরে ঢুকেছিলি, না?"

"আমি? না, সেদিন ওর ঘরে আমি যাই নি তো। এসেই শুয়ে পড়েছিলাম"

"কিন্তু সেদিন রাত এগারোটার পর আমি আমার ঘরের জানালায় দূরবীণটা নিয়ে বসেছিলাম। দেখলাম তুই অবন্ধনার ঘরে ঢুকছিস। স্পষ্ট দেখলাম"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল শিখর সেনের মুখটা। তারপর সামলে নিয়ে বললে—"ভুল দেখেছিস। আমি সেদিন তেতালায় উঠিই নি—"

তারপর হেসে বললে, "পাগল না কি! রাত্রি এগারোটার পর ওর ঘরে ঢুকতে যাব কেন!"

বলেই ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, মনে হল যেন নূতন একটা আলোকপাত হল ওর মনে। তারপর হন হন করে' চলে গেল। আমার দিকে ফিরেও চাইলে না আর।

এর দিন সাতেক পরে দেখা হল উমেশ-মামার সঙ্গে। উমেশ-মামাও পুলিসে চাকরি করতেন। তিনি যা বললেন—তা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। সেদিন যখন শিখর হন হন করে' চলে' গেল তখন আমি মনে করলাম আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেছে বেচারা, আর হয়তো জীবনে আমার সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু উমেশ-মামা বললেন, ও না কি নিজে গিয়ে ধরা দিয়েছে। নিজের পায়ের ছাপ আর আঙুলের ছাপ বিশেষজ্ঞের কাছে নিজেই পাঠিয়ে ছিল, সিমেণ্টের ওপর আর গ্লাসের ওপর যে ছাপ পাওয়া গিয়েছিল, তার সঙ্গে না কি হুবহু মিলে গেছে।' নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

"শিখর আছে কোথায় এখন?"

"হাজতে, পুলিশের হেপাজতে। ও নিজেই ইচ্ছে করে' না কি জেলে গিয়ে ঢুকেছে। বলেছে আমার মানসিক অবস্থা এমন যে, যে কোনও মুহূর্তে আমি আবার খুন করতে পারি। আমাকে জেলের বাইরে রাখা নিরাপদ নয়"

আমার নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বোধ হ'তে লাগল। একটা কথা কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না। ও নিজেই যদি অবঞ্চনার জলের গ্লাসে বিষ মিশিয়ে থাকে তাহলে ও অন্য লোকের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ নিয়ে বেড়াচ্ছিল কেন? লোকের চোখে ধুলো দেবার জন্যে? নিজের নিতান্ত ব্যক্তিগত ডাইরীতে এ সব লেখার কি দরকার ছিল তাহলে? লোকের চোখে ধুলো দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হ'ত তাহলে কি সে নিজেই নিজের পায়ের ছাপ আঙুলের ছাপ পরীক্ষা করাতো? আমার যা মনে হচ্ছিল তা উমেশ-মামাকে বললাম।

উমেশ-মামা বললেন—"ও বলছে, 'আমি যা করেছি তা ঘুমের

ঘোরে করেছি। সজ্ঞানে করি নি।' ঘুমের ঘোরে বিছানা ছেড়ে ও আগেও না কি উঠে যেত। ওটা একটা অসুখ, সম্‌নাম্‌বুলিজ্‌ম্‌, না কি একটা বিদঘুটে নাম ও অসুখের"

আমি নির্ব্বাক হ'য়ে রইলাম।

মাস দুই পরে খবর পেলাম শিখরের ফাঁসী হয়ে গেছে। শিখর নিজের স্বপক্ষে কোনও উকিল নিযুক্ত করে নি। সে কেবল বলেছিল—"অবন্ধনার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী। ওর অসংখ্য দুষ্কৃতির জন্য আমি ওর মৃত্যুকামনা করেছিলাম। সজ্ঞানে ওকে মারবার সাহস বা ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই ঘুমের ঘোরে আমি ওকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি।"...

চুপ করে' বসে' বসে' ভাবছিলাম। শিখরের কথা নয়, আলেয়ার কথা। আলেয়ার মৃত্যুর জন্যও কি আমি দায়ী নই? বাগান-বাড়ির পিছনে সেই প্রকাণ্ড ইদারাটা কি আমিই তাকে দেখিয়ে দিই নি? আমি কি তাকে বলিনি—'অপমানে জর্জ্জরিতা হয়ে সীতা পাতাল-প্রবেশ করেছিলেন। আধুনিক যুগের সীতাদের যদি পাতাল-প্রবেশ করতে হয় তাহলে ইদারায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, জননী বসুন্ধরা তাকে নেবার জন্যে পাতাল থেকে সিংহাসন পাঠাবেন না" বলেছিলাম 'অবশ্য রসিকতা করে'। স্বপ্নেও ভাবি নি সে রসিকতা এমন মর্ম্মান্তিক সত্য হয়ে উঠবে।...কল্পনা করছিলাম দূর আকাশে এরোপ্লেন উড়ছে, বিক্রমবাবু পাইলট্‌, আলেয়া যাত্রিণী, আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে...

হঠাৎ দুয়ারের কড়া নড়ল। উঠে কপাট খুলে' দিলাম। দেখলাম একজন পুলিশ অফিসার দাঁড়িয়ে আছেন।

"আপনার নাম কি কমল-কিশোরবাবু?"

"হ্যাঁ, কেন"

"আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে এসেছি। এই দেখুন ওয়ারেণ্ট মধুপুরে আপনি কি আলেয়া দেবীর সঙ্গে ছিলেন?"

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

আমার পা দুটো থর থর করে' কাঁপতে লাগল কেবল।

গল্প লেখা শেষ করিয়া কবি বাতায়নের দিকে চাহি করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কেমন যেন দুঃখ হইতেছি যে চরিত্রগুলি এতক্ষণ তাঁহার কল্পনাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়া তাহারা কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। নিজেই তিনি সব করিয়া দিলেন। হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, দুইটি অপূর্ব্ব প্রজাপ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই তা বাতায়ন পথে বাহির হইয়া গেল।

সমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। মহর্ষি পর্ব্বতের তত্ত্বাবধানে ক্ষুদ্রতম ত্রুটি ঘটিবারও অবকাশ ছিল না। অধ্বর্য্যু, হোতা, নি অগ্নীৎ, প্রতিপ্রস্থাতা এবং মৈত্রী-বরুণ এই ছয়জন ঋত্বিক বলেনিবেশ সহকারে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আহবণীয় ভূস্থমি পূর্ব্বদিকে যথারীতি পাশুক বেদি এবং পাশুক বেদির উপর মারব বেদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধ্বর্য্যু উত্তর বেদির নাভিতে আর্য আহবণীয় অগ্নি স্থাপনের আয়োজন করিতেছিলেন। পুরাতন বৈ হইতে অগ্নি আনিয়া উত্তর বেদির নাভিতে রক্ষিত হইয়া-কল, দুইজন মন্ত্রপাঠ করিয়া অরণি ঘর্ষণে ব্যাপৃত ছিলেন। পশু বন্ধনের জন্য অষ্ট-কোণ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত যূপ ইতিপূর্ব্বেই প্রোথিত হইয়াছিল, যূপের মস্তকে চষাল নামক মুকুটটি শোভা পাইতেছিল, যূপকাষ্ঠকে ঘৃতলিপ্ত করিয়া যূপাঞ্জন-কর্ম্মও সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। যে বালকটিকে যজ্ঞের পশুরূপে মহর্ষি পর্ব্বত মনোনীত করিয়াছিলেন তাহাকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। সে কখনও নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিল, কখনও বা সরবে ক্রন্দন করিতেছিল, কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃকপাত পর্য্যন্ত করিতেছিলেন না। সুন্দরানন্দের ধর্ম্মপত্নী সর্ব্বশুক্লা দেবী যজ্ঞফলের অংশভাগিনী হইবার নিমিত্ত আসিয়াছিলেন, তিনি না আসিলে যজ্ঞ অসম্পূর্ণ হইত। সুন্দরানন্দ ও সর্ব্বশুক্লা যথাস্থানে বসিয়া ঋত্বিকগণের আদেশ পালন করিতেছিলেন। যজ্ঞের কর্ম্ম যথাবিধি চলিতেছিল। বালকের রোদন, মন্ত্রসমূহের গম্ভীর ধ্বনি, উদার সামগান যজ্ঞমণ্ডপে এক অদ্ভুত বাঙ্ময় জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিল। ঘৃতাহুতির ধূমে যজ্ঞাগ্নির শিখায়, বিবিধ

পচারসম্ভারে, ঋত্বিকগণের গম্ভীর মুখমণ্ডলে যেন যুগপৎ অ্যা
াশঙ্কা সূচিত হইতেছিল। একটা অসম্ভব কিছু এখনই বুঝি সং
হইবে।

সর্ব্বশুক্লা দেবী প্রথমে শুনিয়াছিলেন এই যজ্ঞে নর্ত্তকী সুরঙ্গমাকে
না কি আহুতি দেওয়া হইবে। সংবাদটি তাঁহাকে প্রীত করিয়াছিল।
কিন্তু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া শ্রৌণীগ্রামে তাঁহার শিবিকা যখন
প্রবেশ করিল তখন কুলিশপাণির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।
কুলিশপাণি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে তিনি
শুনিলেন মহর্ষি পর্ব্বত সুরঙ্গমাকে যজ্ঞের পশুরূপে মনোনীত করেন
নাই। এক অসহায় শবর-বালককে সেজন্য না কি কিনিয়া আনা
হইয়াছে। কুলিশপাণির সহিত এ বিষয় তাঁহার কিছু আলোচনাও
হইয়াছিল। এ সংবাদে তাঁহার মনের ভিতরে কি হইতেছিল তাহা
জানিবার উপায় ছিল না, তাঁহার মুখভাবেও কোন পরিবর্ত্তন কেহ
লক্ষ্য করেন নাই। রাজকুলবধূর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বামীর পার্শ্বে
যজ্ঞস্থলে তিনি শান্তমুখে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সীমান্তের সিন্দূররাগ,
তাঁহার ক্ষৌম বসনের দ্যুতি, তাঁহার অনবদ্য গম্ভীর সৌন্দর্য্য যজ্ঞস্থলের
শোভা বৃদ্ধি করিতেছিল।

একাদশ দেবতার উদ্দেশ্যে একাদশটি প্রযাজ দিতে হয়। প্রথম
দশটি প্রযাজে আহুতির উপকরণ আজ্য অর্থাৎ ঘৃত। একাদশ প্রযাজে
আহুতির উপকরণ নিহত পশুর বপা অর্থাৎ উদরের অভ্যন্তরস্থিত
চর্ব্বি। দশম দেবতা বনস্পতির উদ্দেশ্যে হোতা যখন আপ্রী পাঠ
করিতেছিলেন তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই বাহিরে পশুবধের আয়োজন
চলিতেছিল। শমিতা (পশুঘাতক) মশাল হস্তে সেই বালককে
প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। এমন সময় অতিশয় দ্রুতবেগে, প্রায়

তে ছুটিতে, কুলিশপাণি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এ
নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রশ্ন করিলেন—"কুমার কোথায়—?"

"যজ্ঞস্থলে আছেন। বনস্পতির আহুতি দেওয়া হচ্ছে। এইব
হোতা আমাকে এসে পশুবধে নিয়োগ করবেন। কুমারও স
থাকবেন। একটু অপেক্ষা করুন। আপনাকে বড় উত্তেজিত ম
হচ্ছে, ব্যাপার কি—"

"অতিশয় শোকাবহ। কুমারের সঙ্গে এখনই দেখা ক
দরকার"

তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে অধ্বর্য্যু, অগ্নীৎ, মহর্ষি পর্ব্ব
এবং কুমার যজ্ঞস্থল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কুলিশপাণি অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কুমার, একটি দুঃসংবা
বহন করে' এনেছি—"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল।

"দুঃসংবাদ? কি দুঃসংবাদ—"

"নর্ত্তকী সুরঙ্গমা মারা গেছে"

"সুরঙ্গমা মারা গেছে? কি করে'?"

কুলিশপাণি বলিলেন—"আপনারা যজ্ঞে ব্যস্ত ছিলেন, আমি বনে
উত্তর-পূর্ব্ব কোণে কিছু সৈন্য নিয়ে প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম। খব
পেয়েছিলাম শবর-পল্লী থেকে কিছু শবর-যুবক এসে এই যজ্ঞে বাধ
সৃষ্টি করবে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা ঝোপের অন্তরালে বি
যেন নড়ছে। আশঙ্কা হল হয়তো কেউ লুকিয়ে আছে। কাছে
একটা গাছ ছিল। লক্ষ্য করবার সুবিধা হবে বলে সেই গাছে
উঠলাম। উঠে দেখলাম—যা দেখলাম তা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হচ্ছি।
বিশেষত এ সময়ে—"

কুলিশপাণি ইতস্তত করিতে লাগিলেন।

কুমার বলিলেন—"নষ্ট করবার মতো সময় হাতে নেই। যা
বলতে চাও অবিলম্বে বলে' ফেল"

"দেখলাম সুরঙ্গমা চার্ব্বাকের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে,
আর চার্ব্বাক মাঝে মাঝে তাকে চুম্বন করছে। চার্ব্বাককে জীবিত বা
মৃত ধরে' আনবার আদেশ আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। এই দৃশ্য
দেখে রাগে আমার শরীরের রক্ত টগবগ করে' ফুটে উঠল। আমার
সঙ্গে খুব তীক্ষ্ণ একটা ছোরা ছিল। চার্ব্বাককে লক্ষ্য করে' সেটা
নিক্ষেপ করলাম। কিন্তু সেটা লাগল গিয়ে সুরঙ্গমার বুকে। সুরঙ্গমা
আর্ত্তনাদ করে' উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি গাছ থেকে লাফিয়ে
পড়লাম। লাফিয়ে পড়বামাত্র চার্ব্বাক ব্যাঘ্র-বিক্রমে এসে আমাকে
আক্রমণ করলে। সুতরাং তাকেও হত্যা করতে হল।"

মহর্ষি পর্ব্বত বলিলেন—"বৎস, তুমি দীর্ঘজীবী হও" সর্ব্বশুক্লাও
তাঁর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার অধরে ও নয়নে
ক্ষণিকের জন্য একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কুলিশপাণি আগাইয়া
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কেবল সুন্দরানন্দের মুখ
দিয়া কোন কথা বাহির হইল না, তিনি প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া
ছিলেন।

২৯

এক নির্জ্জন উষর প্রান্তর প্রখর সূর্য্যালোকে দ্যুতিমান হইয়া উঠি
ছিল। মনে হইতেছিল যেন এক ক্ষুধার্ত্ত দীপ্তি চতুর্দ্দিকে মূর্ত্ত হই
উঠিয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই, কোমলতা নাই, স্নিগ্ধতা না
দুঃসহ উজ্জ্বলতা ছাড়া আর কিছুই যেন নাই। আকাশে বাত
সেই নির্ম্মম স্বর্ণ-দীপ্তির সমুজ্জ্বল প্রদাহ যেন নিঃশব্দ জ্বালা র
জ্বলিতেছিল।

ধীরে ধীরে আকাশ হইতে যুগল দেবতা অবতীর্ণ হইলে
একজন রূপবান পুরুষ, আর একজন রূপবতী নারী। মনে
মণি আর কাঞ্চন যেন মানবদেহ ধারণ করিয়াছে।
কেহই কোন কথা বলিলেন না। কিন্তু একটি আশ্চর্য
ঘটিল। তাঁহাদের চরণস্পর্শে সেই উষর প্রান্তর ধীরে ধীরে
হইয়া উঠিল।

পুরুষটি তখন বলিলেন—"বাণী, উষর প্রান্তরের মৃত্যু হল,
শ্যামলতা, জন্ম নিল নূতন লোক। এই উষরতার তৃষিত মর্মক
বসে, তুমি একদিন যে আবির্ভাব কামনা করেছি তাই হয়
হ'ল। হ'ল কি?"

বাণীর নয়নের দৃষ্টি হাস্য-দীপ্ত হইয়া উঠিল। মণি হইতে
আলোক বিচ্ছুরিত হইল।

"হ'ল না"

"জানি হ'ল না। কোন দিন হবেও না বোধহয়। তাই
শ্যামল প্রান্তরকে মরতে হবে আবার, জন্ম নিতে হবে আবার নূ
লোকে"

"যাদের নিয়ে আমরা এতক্ষণ ছিলাম তাদের কি হল"

"ওরাও নব-জন্মলাভ করতে চলেছে নূতন লোকে, নূতন পথে। ই দেখ—"

"আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না"

সূর্য্যটাকে নিবিয়ে দিই তাহলে খানিকক্ষণের জন্য"

পিতামহ একমুষ্টি ধূলি তুলিয়া লইয়া সূর্য্যের দিকে নিক্ষেপ রিলেন। চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া গেল।

পিতামহ আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে াগিলেন—"ওই দেখ, ওরা সব চলেছে ছায়াপথ ধরে। ওই সেঙ্গ উজ্জ্বল একক নক্ষত্রটি চার্ব্বাক, আর তাকে ঘিরে আছে যে তারিকা-পুঞ্জ তা হচ্ছে ওর স্বপ্ন, ওর কৌতূহল, ওর নাস্তিকতা, র অবচেতন মানসের কামনারাশি বাঁদিকে যে নক্ষত্রগুচ্ছটি খতে পাচ্ছ, ওরা কে জান? মেঘমালতী, বর্ণমালিনী, সুরঙ্গমা, রামতী, নীলোৎপলা, তানে, অবঞ্চনা আর আলেয়া। ওরা রস্পর কেউ কাউকে চেনে না, একজনের কাছ থেকে আর একজনের রত্ব বহুকোটি যোজন, কিন্তু ওদের লক্ষ্য এক, তাই ওরা একগুচ্ছে রা পড়েছে। ওই দেখ সপ্তর্ষির নীচে কদ্রু বিনতা আর গরুড়কে। দ্রুর সর্প সন্তানরাও নব-রূপ ধরেছে ওই দেখ। ওদের ডান দিকে কটু নীচেই শুরু হয়েছে নূতন আকাশ-গঙ্গা, তার তরঙ্গে ভেসে ছে সুন্দরানন্দ, কুলিশপাণি, কালকূট, কমল-কিশোর, শিখর সেন বিক্রম। আর একটু দূরে ওই দেখ নিরুপম, মহাশকুন্ত আর পতি। ওরা গঙ্গার স্রোতে ভাসেনি, ভাসতে পারেনি, তীরে য়ে দেখছে শুধু। আর একটু দূরে ওই ছোট নক্ষত্রটিকে চিনতে ছ? শিখরের মামা কয়াধুনাথ তার পাশে দপ দপ করে ছ আগামী যুগের কবি। সব আছে, কেউ হারায় নি, কেউ

ফুরায় না। ওদের নূতন জীবন-নাটকের নূতন দৃশ্য আবার রচনা করতে হবে আমাদের। চল—”

সহসা তাঁহারা দুইটি অপরূপ বিহঙ্গমে রূপান্তরিত হইয়া মহাকাশের দিকে পক্ষ-বিস্তার করিলেন। তাঁহাদের মিলিত কণ্ঠে আনন্দিত কাকলী ধ্বনিত হইল। সে কাকলী যেন বলিতে লাগিল—

শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই, শেষ নেই।...

সমাপ্ত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।